KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

| | |
|---|---|
| Record No. KLMLGK 2005 | Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-১৩ |
| Collection KLMLGK | Publisher : মীর রহমান |
| Title চতুরঙ্গ | Size 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m. |
| Vol. & Number ৬২/১ | Year of Publication : December 2002 |
| | Condition : Brittle Good ✓ |
| Editor আবদুর রউফ | Remarks : |

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

# চতুরঙ্গ

বর্ষ ৬২ সংখ্যা ১ ১৪০৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০

ড. সৌমেন সেন তাঁর 'মধ্যবিত্ত লোকসংস্কৃতি' নিবন্ধে 'লোক'-এর নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে লোকসংস্কৃতি নির্মাণে মধ্যবিত্ত এলিটদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি চিহ্নিত করেছেন।

এস ওয়াজেদ আলীর সমগ্র রচনাবলি অবলম্বনে তাঁর ধ্যানধারণার পর্যালোচনা করেছেন ড. বিজিত কুমার দত্ত।

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের ধারাবাহিক সন্দর্ভে 'প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবন' নিয়ে এবারের মুখ্য আলোচ্য বৃহৎ নদী বাঁধ নির্মাণের সর্বনাশা কুফল এবং সে সম্পর্কে পাশ্চাত্য দেশগুলির চৈতন্যোদয়।

'আত্মঅভিজ্ঞতার বিবর্তন' প্রবন্ধে আধুনিক মালায়লম কবিতায় বিস্তৃত বিশ্লেষণধর্মী বিবরণ উপস্থাপনা করেছেন প্রসিদ্ধ মালায়ালম কবি কে. সচ্চিদানন্দন। ইংরেজিতে লেখা মূল প্রবন্ধটির অনুবাদ করেছেন কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়।

সাম্প্রতিক গ্রুপ থিয়েটার জগতের অন্দরমহলের কিছু অকথিত কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছেন প্রবীণ নাট্যবিদ ড. বিষ্ণু বসু।

স্বর্ণকুমারী দেবীর ছোটগল্প নিয়ে আলোচনা।

মৃণাল সেনের 'আমার ভুবন' এবং বহুরূপী ও গান্ধারের সাম্প্রতিক নাট্য নিয়ে পর্যালোচনা।

# লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র

## প্রকাশিত

পুস্তক ও ক্যাসেট তালিকা

| | | |
|---|---|---|
| লোকায়ন চর্চার ভূমিকা | অরুণকুমার রায়, | ৩০ টাকা |
| লোকসংস্কৃতির নন্দনতত্ত্ব | পবিত্র সরকার, | ২৫ টাকা |
| সাঁওতাল কাহিনী বনবীর গাথা | লোকনাথ দত্ত (অরুণ চৌধুরী সম্পাদিত) | ৫০ টাকা |
| লোককথা | দিব্যজ্যোতি মজুমদার | ৪০ টাকা |
| ছৌ | ইন্দ্রাণী দত্ত সৎপথী | ৪০ টাকা |
| ডোমনি | সুবোধ চৌধুরী | ৬০ টাকা |
| লোকসংস্কৃতি গ্রন্থ ও নিবন্ধপঞ্জি | পল্লব সেনগুপ্ত সম্পাদিত | ১০০ টাকা |
| লোকশিল্প বনাম উচ্চমার্গীয় শিল্প | ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় | ৬০ টাকা |
| গ্রাম নামের উৎপত্তি : বাঁকুড়া | রামশংকর চৌধুরী | ২৫ টাকা |
| ভাওয়াইয়া | সুখবিলাস বর্মা | ১২৫ টাকা |
| বস্তুবাদী বাউল | শক্তিনাথ ঝা | ২০০ টাকা |
| গ্রামীণ গীতি সংগ্রহ | দিনেন্দ্র চৌধুরী | ২০০ টাকা |
| ঝুমুর | নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় | ৭০ টাকা |
| টুসু | শান্তি সিংহ | ১৫০ টাকা |
| 'লোকশ্রুতি' প্রবন্ধ সংকলন | মিহির ভট্টাচার্য সম্পাদিত | ২০০ টাকা |
| 'সুধী প্রধান' স্মারক গ্রন্থ | মালিনী ভট্টাচার্য সম্পাদিত | ২০০ টাকা |
| লোকশ্রুতি - ১২, ১৩, ১৪ | প্রতিটির দাম | ২৫ টাকা |
| লোকশ্রুতি ১৫ | | ৪০ টাকা |
| Santhal Architecture | | Rs. 200/- |

** ক্যাসেট - ঝুমুর গান ১ ও ২, লালনের গান ১ ও ২,
মরমী গান, ভাওয়াইয়া ** প্রতিটির মূল্য : ৩৫ টাকা

স্মারক নং ৪৯২৩/২০০২/তথ্য ও সংস্কৃতি



কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯



বর্ষ ৬২ সংখ্যা ১
১৪০৯

**প্রবন্ধ**

মধ্যবিত্ত লোকসংস্কৃতি ❖ সৌমেন সেন ৫

এস ওয়াজেদ আলীর প্রাসঙ্গিকতা ❖ বিজিতকুমার দত্ত ১৪

**কবিতা** ❖ ২০-২৭

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ❖ আনন্দ ঘোষহাজরা
পরিমল চক্রবর্তী ❖ অজিত বাইরী ❖ দেবাঞ্জন চক্রবর্তী ❖ রঞ্জনা দত্ত
জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ❖ মেঘ মুখোপাধ্যায়

**ধারাবাহিক**

প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবন ❖ শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ২৮

**গল্প**

অমৃতার পুত্র ❖ স্বপ্না গুহ ৩৭

**প্রতিবেশী সাহিত্য**

আত্মঅভিজ্ঞানের বিবর্তন : আজকের মালয়ালাম কবিতা : কে সচ্চিদানন্দন ৪২

**সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি**

থিয়েটারের এখন, তখন ❖ বিষ্ণু বসু ৫২

স্বর্ণকুমারী দেবীর ছোটগল্পে সমকালীন সমাজভাবনা ❖ নাজিমুল হক ৬০

**গ্রন্থসমালোচনা** ❖ ৬৫-৮৩

অমিতাভ রায় ❖ শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় ❖ অতনুশাসন মুখোপাধ্যায়
বেণু গুহঠাকুরতা ❖ সুস্নাত দাশ ❖ হাবিব রহমান ❖ গৌরী সেন
হেদায়েতুল্লাহ ❖ বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ❖ অরূপরঞ্জন প্রধান

**চলচ্চিত্র - নাট্য সমালোচনা**

মৃণাল সেনের আমার ভুবন ❖ অধ্যয় কুমার ৮৪

একালের "আর্থোটিক পালা" ❖ তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৮

চারদুয়ার ❖ মেঘ মুখোপাধ্যায় ৯০

**স্মরণে** ❖ ৯৩

অন্নদাশংকর রায় ❖ ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়



মূল্য: ১৫ টাকা
ডাকে: ১৮ টাকা
শিল্প পরিকল্পনা: রণেন আয়ন দত্ত

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক ইম্প্রেশন হাউস, ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা - ৯ থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা — ১৩ থেকে প্রকাশিত
অক্ষর বিন্যাসে — নয়া উদ্যোগ, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা — ৬

দূরভাষ : ২৩৭-৩৭৭০
সম্পাদক : আবদুর রাউফ

# শত্রু যখন সাম্প্রদায়িকতা প্রতিবাদ না করাই তখন অপরাধ

**পশ্চিমবঙ্গ সরকার**

আই.সি.এ. ৪৯২৩/২০০২/তথ্য ও সংস্কৃতি


প্রবন্ধ

# মধ্যবিত্ত লোকসংস্কৃতি

## সৌমেন সেন

প্রবন্ধের শিরোনামটি পড়ে কেউ আঁতকে উঠতে পারেন। মনে হতে পারে এ-তো সোনার পাথরবাটির মতো শোনাচ্ছে— মধ্যবিত্ত ও লোকসংস্কৃতি দুই-ই আমাদের চেনা— একের সঙ্গে অন্যটি মেলে কি? লোকসংস্কৃতি বলতে আমরা যা বুঝি, তার সৃষ্টি ও প্রসারে তো মধ্যবিত্তের কোনও ভূমিকা থাকার কথা নয়। তা হলে? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্যই এই প্রবন্ধ। আর, গোড়াতেই বলে রাখা ভাল যে একটি উত্তর, সদর্থকই, আছে বই কি।

সেই উত্তরে পৌঁছবার আগে দু'টি বিষয় জানা দরকার। এক, উনিশ ও বিশ শতকের চর্চার অভিজ্ঞতার পর, একুশ শতকে পৌঁছে, লোকসংস্কৃতির যে সংজ্ঞা আমরা পাই, তার স্বরূপটি কী। দুই, আবির্ভাব কাল থেকে আজ অবধি মধ্যবিত্তের অবস্থান ও লক্ষণটি কী।

আর এই বিষয় দুটি স্পষ্ট করার জন্য আমি যে যুক্তিগুলি আনব, মহাজনদের যুক্তি, আমার পাঠ ও অভিজ্ঞতা-নির্ভর যুক্তি, তা সবার গ্রহণযোগ্য না-ও হতে পারে। সমাজ-বিজ্ঞানে এমনটা তো হামেশাই হয়। হোক। আলোচনা তো থেমে থাকে না। এই কথাগুলি বলার অর্থ কিন্তু এই নয় যে আমার যুক্তি ও সমর্থন সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই। বরং উল্টোটাই, না হলে আর এই রচনা ফাঁদা কেন। তবু এই বিনয়-বচন, কারণ শিরোনাম থেকে শুরু করে এই আলোচনার যুক্তি ও সিদ্ধান্ত আমাদের অনেকের অনেক অভ্যস্ত ধারণায় আঘাত করতে পারে।

লোকসংস্কৃতির যে-সংজ্ঞাটি নির্দিষ্ট হয় উনিশ শতকের মধ্যাহ্নে (১৮৪৬), যার অর্থ জনসাধারণের (Folk বা People এর) প্রজ্ঞা (wisdom বা lore)' এবং যা মূলত একটি তালিকা[১], শতাধিক বছরেও তার গ্রহণযোগ্যতা খুব কমেনি। একশো বছর পর একটি কোষগ্রন্থে[২] পাওয়া যায় প্রায় তিরিশটি সংজ্ঞা যা বস্তুত ১৮৪৬-এর সংজ্ঞাটির ব্যাখ্যা বা সম্প্রসারণ। তখন পর্যন্ত লোক-এর অর্থ জনসাধারণ (People) যাঁরা মূলত গ্রামীণ কৃষিজীবী ও কৃষিনির্ভর মানুষজন আর তাঁদের সৃষ্টি কিছু সাংস্কৃতিক উপাদানের সমষ্টি লোকসংস্কৃতি। যে সংস্কৃতি তাঁদের প্রজ্ঞা। আদিম অবস্থা থেকে সভ্যতা পর্যন্ত সমাজবিবর্তনের যে স্তরগুলি তখন চিহ্নিত, সেই উল্লম্ব প্রক্রিয়ার মাঝামাঝি কোথাও এই 'লোক'-এর অবস্থান। সভ্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিপরীতে তাঁরা অশিক্ষিত সম্প্রদায়, যাঁরা তাঁদের শ্রুতি-স্মৃতি আচারে বহন করছেন যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, তাই-ই লোকসংস্কৃতি। এবং শহুরে সভ্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহারে তার কিছু রেশ থেকে গেলেও তাঁদের সংস্কৃতি আলাদা ও 'পরিশীলিত'। সমাজ বিবর্তনের উল্লম্ব প্রক্রিয়ার সবচেয়ে নীচের স্তরে যাঁরা তাঁরা অসভ্য, তাঁদের সংস্কৃতি প্রান্তিক। তাঁরা লোকসংস্কৃতির 'লোক' নন, যেমন নন শহুরে শিক্ষিত সভ্য সম্প্রদায়।

'লোক' সম্পর্কে এমন একটি ধারণা গড়ে নেওয়ার পর অন্য একটি ধারণা তৈরি হল যে লোকসংস্কৃতি মৌখিক, স্মৃতি ও শ্রুতিবাহিত; ঐতিহ্য তার প্রাণশক্তি এবং তা বংশপরম্পরায় প্রবাহিত। অর্থাৎ পুঁথিগত শিক্ষার অভাব বা অক্ষরজ্ঞানহীনতার সঙ্গে তার সম্পর্ক। অতীতে যে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক রাজসভা বা দরবার, পরবর্তীকালে মধ্যবিত্ত বৈঠকখানা, যে সাহিত্য পুঁথিগত বা মুদ্রণনির্ভর, তা লোকসংস্কৃতির আঙিনার বাইরে বা যথার্থ বলতে গেলে, 'সংস্কৃত' সংস্কৃতির চৌহদ্দির বাইরে লোকায়ত আঙিনায় যে গোষ্ঠীবদ্ধ সংস্কৃতি তা-ই লোকসংস্কৃতি।

এই ধারণাতেই আমরা সাধারণত অভ্যস্ত এবং আমরা, যাঁরা এই ধারণা গড়ে তুলেছি, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিভিন্ন ধাপে স্থিত। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে এবার একটু চিনে নেওয়া যাক। মধ্যবিত্ত বলতে যে একটি শ্রেণীভুক্ত কিছু মানুষকে আমরা শনাক্ত করি, সে ধারণাটি কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি। মনে রাখা ভাল, মধ্যবিত্ত ইংরেজ মিড্‌ল ক্লাস-এর তর্জমা। মধ্যবিত্ত সম্পর্কে ধারণা আর তার পরিচয় কালক্রমে গড়ে উঠেছে ইউরোপে। যেমন সামাজিক ক্লাস বা শ্রেণী বলতে আজ যা বুঝি তার বয়সও খুব বেশি কিছু নয়। অক্সফোর্ডের অভিধানে দেখছি শব্দটি এই অর্থে ও তার তিনটি বিভাজন, উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন, প্রথম চিহ্নিত হয় ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে। তখন ইউরোপীয় সমাজে তাদের অবস্থান বাস্তব। তাই বাধ্য হয়েই আমাদের তাকাতে হয় ইউরোপের ইতিহাস ভূগোলে — ঘটনা পরম্পরায় সেই গোকুলেই বেড়ে উঠেছিল আদি মধ্যশ্রেণী। যখন সেখানে ফিউডাল অর্থব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে, বাণিজ্য ও শিল্প ক্রমশ বাড়ছে, বেড়ে যাচ্ছে শহর অঞ্চল, তখনই

একটি শ্রেণী গড়ে উঠল যাদের দাবি আরও আর্থিক, আইনি ও সামাজিক অধিকার। এরাই আদি মধ্যশ্রেণী যাদের অবস্থান তখন সামন্ত-ভূস্বামী ও বিত্তহীন চাষি মজুরের মাঝখানে। পুঁজিবাদী সমাজের আদিপর্বে ভূস্বামীকুল, কৃষক ও ভূমিদাসদের মধ্যবর্তী এই শ্রেণীর নির্দিষ্ট আর্থনীতিক ভূমিকা ও স্বার্থ ছিল। তখন ইউরোপে এদের পরিচয় ছিল Mittelstand বা Intermediate Estate। পরে ধীরে ধীরে যখন middle class বা মধ্যশ্রেণীর ধারণা জন্মাল তখন একদিকে প্রাক্তন ভূস্বামীরা হৃতসম্পদ ও হৃতমান আর অন্যদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শেকড় শক্ত হয়ে উঠল— ফলে সমাজকাঠামো আরও জটিল হয়ে উঠছে। অর্থস্বার্থগোষ্ঠীগুলির মধ্যে জন্মাল নানা সংঘাত, প্রতিঘাত। এই সংঘাত-প্রতিঘাতের টানাপোড়েনে আদিমধ্যবিত্তের দখলে এসে গেল পুঁজি ও প্রতিপত্তি আর সেই বলয়ে তৈরি হল একটি সহায়ক স্তর, যা ক্রমে রূপ নিল একটি শ্রেণীর, যাকে আজ আমরা চিনি মধ্যবিত্ত নামে। আসলে মধ্যবিত্তের ধারণাটা সব সময়েই একটু গুরুচণ্ডালি, ওঠানামার পালা চলছেই। মধ্যবিত্ত বিকাশের ধারাটি যদি মনে রাখা যায় তা হলে জানা যাবে যে একসময় যাঁরা মধ্যবিত্ত ছিলেন তাঁরাই এখন বুর্জোয়া আর এখনকার মধ্যবিত্ত পাতিবুর্জোয়া যারা ধনতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সহায়ক নানা বৃত্তিজীবী। আর তার একটি বড় অংশ অবশ্যই বুদ্ধিজীবী, নানা বৃত্তির। এঁদের মধ্যে আবার সব সময়েই তৈলাক্ত লাঠি ও বাঁদরের অঙ্কের খেলা চলছে। কেরানি বাপের পুত্র নিম্নমধ্যবিত্তের কাঁথা-বালিশে শুয়ে হঠাৎ যখন সাউথব্লকের সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী হয়ে যান তখন তিনি নিজেকে যে তখু উচ্চবিত্তই মনে করেন তা নয়, বুর্জোয়া কালচারটাকেই নিজস্ব বলে ভাবতে শুরু করেন। কিন্তু তাতে কি তাঁর শ্রেণীউত্তরণ ঘটে? তিনি মধ্যই থাকেন। এঁরা ইদানীং এলিট বলেও চিহ্নিত। আবার তাঁরই কোনও ভ্রাতা ব্যারাকপুর বেল্টে শিফট ডিউটি করলেও নিজেকে কখনওই শ্রমিক ভাবতে পারেন না। বিত্ত ও বৃত্তির হিসাবে তিনি প্রোলেতারিয়তে হলেও মানসিকতায় মধ্যবিত্ত। অর্থাৎ ওঠা ও নামা কোনওটাই সহজ হচ্ছে না। আবার সদর-মফস্বল, নগর-শহর, শহর-গ্রাম, ইত্যাদি অবস্থানভূমিও এই শ্রেণীর আর একটি নিয়ন্ত্রণ-রেখা।[৪]

মাও-জে-দং এক সময় (১৯৬২) চিনের শ্রেণীবিন্যাস ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাতে তিনি তখনকার চিনা সমাজে পাঁচটি শ্রেণীর অস্তিত্ব খুঁজে পান : ভূস্বামী ও মুৎসুদ্দি, মধ্যবুর্জোয়া, পাতিবুর্জোয়া, আধা-প্রোলেতারিয়েত ও প্রোলেতারিয়েত। দুটি প্রান্তিক শ্রেণী, ভূস্বামী ও মুৎসুদ্দি আর প্রোলেতারিয়েতের মাঝখানে তিনটি, মধ্যবুর্জোয়া, পাতিবুর্জোয়া ও আধা-প্রোলেতারিয়েত। মধ্যবুর্জোয়া শ্রেণীতে ছিল ধনী চাষি, পাইকারি ব্যবসায়ী, ছোট কারখানা মালিক, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক ইত্যাদি। পাতিবুর্জোয়া হল সম্পন্নচাষি, সাধারণ বুদ্ধিজীবী, কারুশিল্পী, স্কুল শিক্ষক, কেরানি, নিম্নআদালতের উকিল, ছোট ব্যবসায়ী। আর আধা-প্রোলেতারিয়েত শ্রেণীতে থাকছে অল্প জমির মালিক, সাধারণ চাষি, সাধারণ কারুশিল্পী, দোকান কর্মচারী ও হকার-ফেরিওলা ইত্যাদি।[৫] বাঙালি বা ভারতীয় মধ্যবিত্তকে চিনে নিতে আমরা মাও-এর মডেল অনেকটাই ব্যবহার করতে পারি। আমাদের উচ্চ ও নিম্নমধ্যবিত্তের ধারণা এমন হিসাবের সঙ্গে মেলে। এমনকী যাদের শ্রমিক বললে ভাল হয় তাঁরাও নিম্নমধ্যবিত্তের দলে ভিড়ে আছেন। ফলে মধ্যবিত্ত, বিশেষত বাঙালি মধ্যবিত্ত বলতে আমাদের সামনে হরেক মানুষ সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে যান, আমাদেরই প্রতিরূপ সব। তাঁদের বা নিজেদের চিনতে গেলে অনেক হিসাব নিকাশ করতে হয়, কখনও বিত্তের মাপে, কখনও বৃত্তির, কখনও বা বিচরণক্ষেত্রের ঠিকানায় আর অবশ্যই চেতনা, মানসিকতা আর বুদ্ধিমার্গের টানাপোড়েনে। উচ্চ ও নিম্নমধ্যবিত্ত যেমন এক ধরনের হিসাব, বিত্তের নিরিখে, তেমনই হিসাব থাকে পেশার আর নাগরিক, শহুরে, মফস্বলি ও গ্রামীণ মধ্যবিত্তের কথা ভাবতে হয় বিচরণ ক্ষেত্রের প্রভাব-প্রসারে।

মধ্যবিত্তের একটি অংশকে ইদানীং বলা হয় এলিট। এলিটদেরও আবার একেকটি রূপ— বিত্তের হিসাবে, প্রতিপত্তির হিসাবে, পেশার নিরিখে ও বুদ্ধি ও শিক্ষার মাপে। এদের একটি বড় অংশ বুদ্ধিজীবী। আমাদের এই আলোচনার প্রয়োজনে এই বুদ্ধিজীবীদের একটু চিনে নিতে হয় কারণ সংস্কৃতি-নির্মাণে এদের ভূমিকাই প্রধান। এবং মধ্যবিত্ত লোকসংস্কৃতি যা — তা মূলত এদেরই তৈরি। তথাকথিত 'এলিট' ও 'লোক'-এর দ্বন্দ্বের কথা মনে রেখেই বলছি। সমাজ-ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বুদ্ধিজীবী এলিটদের দুটি স্তরে চিহ্নিত করা হয় — প্রাক-আধুনিক ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক। বাংলায় অন্তত ঐতিহ্যবাহী (ট্র্যাডিশনাল) এলিটের বড় অংশ পুরোহিত শ্রেণী ও টোলের পণ্ডিতেরা, মুসলমান সমাজে মৌলবি ও মাদ্রাসা পরিচালকরা। এবং তাঁরা যে তাঁদের সময়ে সমাজের চেহারাচরিত্র অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করতেন তার খবর পাওয়া যায় ১৮৩০ সালে রচিত বাংলার শিক্ষা পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি রিপোর্টে।[৬] পুরোহিতদের স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসাবে দেখা যাবে কি না আর তাঁদের বুদ্ধিজীবী বলা যাবে কি না তা নিয়ে কারও সংশয় থাকতে পারে। ইউরোপীয় প্রেক্ষিতে অন্তত আনতোনিও গ্রামশি এঁদের স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসাবে দেখতে চান আর বলেন যে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিনিধি-স্থানীয় হল পুরোহিত শ্রেণী। তিনি আরও বলেন যে প্রথাগত বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশই কৃষকবংশোদ্ভূত।[৭] ভারতীয় প্রেক্ষিতেও গ্রামশির এই বিচার স্বীকার করলে উপকার হয়। অনেক ভারতীয় জনজাতিসমাজে, পৃথিবীর অন্যত্র যেমন, একই ব্যক্তি ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন



এবং নানা কারণেই তাঁদের বুদ্ধিজীবী (অন্তত প্রথাগত) বলতে বাধা নেই। একটি সমাজের আত্মপরিচয়, জীবন ও বিশ্বদর্শন (world view) মূলত এরাই নির্ধারণ করেন। নিয়ন্ত্রণও।[৮] দেড়শো বছর আগে বাংলার সামাজিক পরিস্থিতিও যে এমনটা ছিল তার খবর আমরা পেয়েছি উইলিয়াম অ্যাডামের রিপোর্টে (১৮৩০) ও কিনয় ঘোষের আলোচনায়। বাংলার ট্র্যাডিশনাল এলিট, তাঁদের বিচারে, একাধারে বুদ্ধিজীবী ও পুরোহিত।[৯] আধুনিক এলিটদের প্রাধান্য ততদূর এগোয় না, বুদ্ধিজীবী ও পুরোহিতদের ভূমিকা এখন আলাদা, কিন্তু, ভারতীয় সমাজে, সংস্কৃতি নির্মাণ ও প্রচারে, উভয়েরই প্রভাব থেকে যায়।

## দুই

ইংরেজিতে যাকে বলা হয় স্টিরিওটাইপ বাংলায় তা হতে পারে 'মাপেকাটা' বা 'ছাঁচে ঢালা'। সামাজিক গোষ্ঠীগুলি সাধারণ ছাঁচে ঢালা, গোষ্ঠীচরিত্র, চৈতন্য, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রথা ও ব্যবহারবিধির মাপে। এবং এই সবের সমন্বয়েই গোষ্ঠী-সংস্কৃতি যার অন্য নাম একটি গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও আত্মপরিচয়, যার ভিত্তি একটি বহমান পরম্পরা বা ট্র্যাডিশন। গোষ্ঠীসভ্যদের আচরণ, সংস্কার, বিশ্বাস, ভাবনা সাধারণত এই ট্র্যাডিশনের ছাঁচে ঢালা। যদিও, ট্র্যাডিশনের গ্রহণ-বর্জন, নির্মাণ-পুনর্নির্মাণও ঘটছে প্রতিনিয়ত।

একটি গোষ্ঠীর গড়ে ওঠা, সামাজিক, ভাষিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক, ধার্মিক ইত্যাদি চাপে, যেমন একটা ছাঁচের জন্ম দেয়, তেমনই তাদের ও তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কেও একটি ধারণার ছাঁচ তৈরি হয়। এই ছাঁচ বা ছাঁচগুলি আমরা তৈরি করি বিশ্লেষণের স্বার্থে। এবং ক্রমশ আমরা এই ছাঁচে এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়ি যে তার প্রয়োগ ঘটে নির্বিচারে, সময় ও সমাজের পরিবর্তনগুলি লক্ষ্য না করেই। সমাজ ও সংস্কৃতির যে বর্গীকরণে আমরা অভ্যস্ত তা-ও এমনই একটি ছাঁচ।

এই ছাঁচেই আমরা লোক বা folk লোক-সংস্কৃতি বা folklore কে চিনে আসছি। লোক বলতে আমরা বুঝেছি গ্রামীণ ও প্রধানত কৃষিনির্ভর জনসমষ্টি, যাঁদের সংস্কৃতির নাম লোকসংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি শিষ্ট সংস্কৃতি থেকে আলাদা। সংস্কৃতির এই এবং এমনই আরও বর্গীকরণের ব্যাখ্যা নানা সময় ও নানা ভাবে হয়ে থাকলেও, মূল কথাটি এই যে লোকসংস্কৃতি মূলত গ্রামীণ, ঐতিহ্যমণ্ডিত, কিঞ্চিৎ অশিষ্ট (তথাকথিত গ্রাম্য) কারণ তেমন পরিশীলিত নয়, তার নির্মাণ ও উপভোগ মূলত যৌথ এবং তার বহমানতা পরম্পরাগত ও বিশেষ পরিবর্তনশীল নয়। লোক ও লোকসংস্কৃতির যে সংজ্ঞা আমরা আগে আলোচনা করেছি তা এই ছাঁচেরই।

কিন্তু যদি বাস্তব পরিস্থিতি ও পরিবর্তনের মুখোমুখি হওয়া যায় তা হলে দেখা যায় সব ছাঁচই ঢিলেঢালা। লোক ও লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা ও ধারণা তাই বদলে গেছে।[১০] 'লোক' আর আগের 'স্টিরিওটাইপ' নেই, লোকসংস্কৃতিও না। লোক বলতে এখন বুঝি কোনও একটি গোষ্ঠী, যাকে খুঁজে পাওয়া যাবে নানা শ্রেণীতে, নানা পেশায়, ধর্মীয় ও জনজাতি বলয়ে। এই গোষ্ঠী গ্রামীণও হতে পারেন, নাগরিকও। তাঁদের বন্ধনসূত্র একটিই — নিজস্ব পরম্পরা, যা আছে তাঁদের গ্রহণে এবং প্রতিমুহূর্তের নির্মাণে। এবং এই যে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সংস্কৃতি, যাকে এখন লোকসংস্কৃতি বলা হচ্ছে, তার নির্মাণ সর্বদাই যে যৌথ হবে, তা না-ও হতে পারে; কোনও ব্যক্তির সৃষ্টি ক্রমে গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় যৌথ হয়ে ওঠে, যেমন কোনও লিখিত, মুদ্রিত উৎসও থাকতে পারে এই সংস্কৃতির— তা যে সর্বদা মৌখিক হতে হবে, সে ছাঁচ আর মানা হচ্ছে না। যেমন মানা যাচ্ছে না ঐতিহ্যের অতীত নির্ভরতা, তা একটি পরিবর্তনশীল প্রবাহ।

মধ্যবিত্তকেও তেমনই কোনও একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে মাপা যায় না। তার উদ্ভব ও বিকাশ একমাত্রিক নয়, নানা সময়ে, নানা দেশে, কোনও দেশের নানা অঞ্চলে তার নানা চেহারা। এবং এই মধ্যবিত্ত বলয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর অস্তিত্ব থাকে, একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির আওতায় নানা গোষ্ঠী-সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, তার নিয়ন্ত্রক হতে পারে ভাষা-জাতি-ধর্ম-পেশা ইত্যাদি। ফারাক থাকে গ্রামীণ ও নাগরিক গোষ্ঠী-সংস্কৃতির মধ্যে যা আবার মিশে যায়, মিলে যায় কোথাও কোনও এক সাধারণ সংস্কৃতিতে— লোকসংস্কৃতিও তার অংশ।

এই পরিস্থিতি যদি আমরা মেনে নিই আর স্বীকার করি যে লোকসংস্কৃতি পরিবর্তনশীল, তা হলে দেখা যাবে যে 'লোক'-এর অভ্যস্ত স্টিরিওটাইপ আর মানা যাচ্ছে না আর 'লোক' ছড়িয়ে আছে অনেক শ্রেণীতেই, বিশেষত মাও-এর মডেলের মধ্যবুর্জোয়া, পাতিবুর্জোয়া, 'আধাপ্রোলেতারিয়েত ও প্রোলেতারিয়েতদের মধ্যে। মধ্যবিত্তের অবস্থান মূলত মধ্যবুর্জোয়া, পাতিবুর্জোয়া ও আধাপ্রোলেতারিয়েতের মধ্যে। এই বিচারে মধ্যবিত্তের নানা অংশ-ও 'লোক' এবং তাঁদের সংস্কৃতির একটি অংশ 'লোকসংস্কৃতি', নির্মাণে, প্রভাবে, গ্রহণে, প্রচার ও প্রসারে। বলাই বাহুল্য, আমি লোকসংস্কৃতির সেই সংজ্ঞাই স্বীকার করতে চাই যে সংজ্ঞা প্রতিষ্ঠা করে যে লোকসংস্কৃতি মাত্র সাহিত্য-শিল্প নয়, তা একটি পরিকল্পিত শিল্পিত প্রসার (artistic communication)[১১] প্রক্রিয়া এবং সমাজনির্মাণ (social formation)[১২] প্রক্রিয়ার অংশ।

আসলে লোকসংস্কৃতিতে (বলা যায় যে কোনও সংস্কৃতিতেই) একটি দাতব্যের প্রবণতা থাকে, প্রজ্ঞার দাতব্য, কিছু বলতে চাই, প্রতিষ্ঠা করতে চাই বলেই তো নির্মাণও প্রসার। লোকসংস্কৃতিকে তাই অপরিকল্পিত স্বতঃস্ফূর্ত নির্মাণ হিসাবে মেনে নিতে

অসুবিধা হয়। এবং অনেক পরিকল্পিত নির্মাণেরই সর্বজনগ্রাহ্য স্বতঃস্ফূর্ত গ্রহণ ও আশ্রয় জোটে— লোকসংস্কৃতির জোরটা সেখানেই। তা-ই তার হয়ে ওঠা।

## তিন

একটি বার্তা আন্তর্জাতিক লোকসংস্কৃতিচর্চায় এখন মোটামুটি মান্যতা পেয়ে গেছে যে 'লোক' ও 'লোকসংস্কৃতি'কে আর স্টিরিওটাইপে চেনা যাচ্ছে না। এদের অনেক বিস্তার ঘটে গেছে। এই সত্য স্বীকার করে এগোলে মানতে হয় লোকসংস্কৃতি নির্মাণে মধ্যবিত্তেরও একটি ভূমিকা থাকে। আগেও ছিল, এখনও আছে। এই ভূমিকাটি দু'রকম—একটি প্রত্যক্ষ এবং আর একটি পরোক্ষ।

একটি সত্য স্বীকার করে এগনো যাক—সংস্কৃতি নির্মাণে বুদ্ধির (এবং, বলাই বাহুল্য, বুদ্ধিজীবীর) একটি ভূমিকা থাকে। এই সত্য শুধু আজকের সত্য নয়, সমাজবিকাশের প্রতিটি ঐতিহাসিক পর্বেই সত্য। নিরক্ষর আদিম সমাজ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত। আজ হয়ত আমরা বুদ্ধিজীবীদের স্বতন্ত্র অবস্থান ও মর্যাদা চিহ্নিত করি, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে তাই-ই স্বাভাবিক, কিন্তু সমাজনির্মাণ প্রক্রিয়ায় উপযুক্ত সংস্কৃতি ও বিশ্বদর্শন গড়ে তুলতে বুদ্ধির প্রয়োগ সব সমাজেই ছিল, আছে এবং থাকবে। লোকসংস্কৃতি এই প্রক্রিয়ার বাইরে নয়। এক তথাকথিত আদিবাসী (খাসি) সমাজের লোকসংস্কৃতি চর্চার তিন দশকের অভিজ্ঞতায় আমি সমর্থন জানাই গ্রামশির ব্যাখ্যায় যখন তিনি বলছেন : 'এমন কোনও মানবিক ক্রিয়া নেই যা থেকে বুদ্ধিগত অংশগ্রহণের সমস্ত সম্ভাবনা সম্পূর্ণ বর্জন করা যায়, যে মানুষ নির্মাতা ও যে মানুষ চিন্তাশীল তাদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা যায় না। চূড়ান্ত বিচারে প্রত্যেক মানুষই তার পেশাগত ভূমিকার বাইরে কোনও না কোনও ধরনের বুদ্ধিগত ক্রিয়ায় ব্যাপৃত থাকে; অর্থাৎ সে তখন একজন 'দার্শনিক', একজন শিল্পী, একজন রুচিবান মানুষ, সে এক বিশ্বদর্শনে নিরত, তার মধ্যে রয়েছে নৈতিক আচরণের এক সচেতন বিধি, ফলে এক বিশ্ববোধকে লালন করা বা তার সংস্কার সাধনের কাজে, অর্থাৎ নতুন চিন্তা-পদ্ধতির জন্ম দেওয়ার কাজে তার ভূমিকা থাকে' (গ্রামশি, ১৯৯৩: ১৯৯৯)।

এই প্রসঙ্গে পুরোহিতদের কথা আসে। পুরোহিতরা যে বুদ্ধিজীবী (বিশেষত প্রথাগত) শ্রেণীর অংশ সে কথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁরা যে সামাজিক সংস্কৃতি নির্মাণে মুখ্য ভূমিকা নেন তার প্রমাণ মিলবে তথাকথিত আদিবাসী সমাজেও যে সমাজ সাধারণত আজকের নিরিখে শ্রেণীবিভক্ত নয়। আর, কালক্রমে, সমাজ-নির্মাণ প্রক্রিয়ার পরিবর্তনে, তাঁরাও একটি শ্রেণী, নিদেনপক্ষে একটি স্তরে, মধ্যস্তরে (middle strata), অবস্থান করেন। উদাহরণ দিই। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মেঘালয় রাজ্যে তথাকথিত আদিবাসী খাসিসমাজে ঔপনিবেশিক কালের আগে আধুনিক অর্থে শ্রেণী, এবং মধ্যশ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না কিন্তু প্রথার স্বীকৃতিতেই একটি স্তরবিন্যাস ছিল। সেই বিন্যাসে সমাজপ্রধান এবং শাসনপ্রধান সীয়েম ও অভিজাতকুল (বাখরাও) এবং জনসাধারণ (পাইদবা পাইদকার)-এর মাঝামাঝি ছিলেন পুরোহিতকুল (লিংডো) যাঁদের সান্নিধ্য ছিল বাখরাওদের সঙ্গে। যে কোনও সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডে, বিশেষত আচার-উৎসবে, তাঁদের ভূমিকা ছিল সাম্মানিক। যা স্বাভাবিক। তাঁদের নির্দেশ ছিল মান্য। ফলে, লোক-সংস্কৃতির অনেকটাই, সামাজিক প্রথা, ধর্মাচরণ, বিশ্বদর্শন, পুরাণ, পুরাণ বর্ণনা, আচারবিধি ইত্যাদি ছিল তাঁদের নিয়ন্ত্রণে। খাসি-জয়ন্তিয়াদের দু'টি জাতীয় উৎসব, নংক্রেম ও বেডিয়েনখ্লাম পর্যালোচনা করলে এই সত্য জানা যায়। নংক্রেম উৎসবে দেখা যায় যে শাসন-প্রধান (সীয়েম) ও তাঁর পরিবার, অভিজাতকুল (বাখরাও), যাঁরা সীয়েমের দরবারের সদস্য ও মন্ত্রী এবং পুরোহিতরা এই উৎসব নিয়ন্ত্রণ করেন আর জনসাধারণ (পাইদবা-পাইদকার) অংশগ্রহণকারী মাত্র। অথচ এটি একটি লোক-উৎসব, জাতীয় উৎসব। জয়ন্তিয়া পাহাড়ে বেডিয়েনখলাম উৎসবেও শাসনপ্রধান (দলই) ও পুরোহিতের (লিংডো) প্রাধান্য। এই উৎসবের প্রধান আচার সম্পন্ন হয় পুরোহিতের বাড়ির আঙিনায় দলই-এর নেতৃত্বে। এ ক্ষেত্রেও জনসাধারণ অংশগ্রহণকারী মাত্র। প্রশ্ন উঠতে পারে যে আদিবাসী সমাজে তো এটাই স্বাভাবিক — প্রধান ও পুরোহিতরাও তো জনসাধারণেরই অংশ। কিন্তু যথার্থ বিচারে দেখা যায় যে খাসি-জয়ন্তিয়া সমাজে দীর্ঘকাল আগেই স্তরবিন্যাস ঘটে গেছে — তা প্রথাসিদ্ধ। নইলে, প্রধান (সীয়েম ও দলই), অভিজাতকুল (বাখরাও), পুরোহিত (লিংডো) ও জনসাধারণ (পাইদবা-পাইদকার) ইত্যাদি ধারণা প্রথার অন্তর্ভুক্ত হত না এবং প্রত্যেকটি স্তরের কর্তব্য ও অধিকার প্রথা-নির্দিষ্ট হত না।[১৩] জনসাধারণের প্রতি একটি উপদেশ-বাণীও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : শাসন-প্রধান (সীয়েম), এলাকা প্রধান (বাসান) ও অভিজাতদের (বাখরাও) সম্মান করো, মান্য করো, তবেই তোমার দেশের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। হে সীয়েম, হে বাখরাও অনুগ্রহ করে তোমাদের সন্ততি জনগণকে, এই পাহাড়, এই উপত্যকাকে রক্ষা করো দিবারাত্র ও তাদের নেতৃত্ব দাও বিঘ্নে ও সমৃদ্ধিতে।[১৪] এই উপদেশটি আমরা পাই ১৯০৩ সালে প্রকাশিত (Berry 1903 : 31) একটি লোককবিতা (ফাওয়ার) সংগ্রহে—বলা হয়েছে সংগ্রহের কবিতাগুলি ঐতিহ্যের অন্তর্গত। যদি ধরেও নিই যে কবিতাটি ১৯০৩ সালেই রচিত যখন খাসি পাহাড়ে স্বল্প সংখ্যায় হলেও একটি সাক্ষর শিক্ষিত এলিট বা মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব হতে চলেছে এবং তাঁদেরই একজন, এই সংগ্রহের 'সংকলক', এর রচয়িতা, তবু দুটি সত্য মানতে হয় যে ততদিনে সমাজে স্তরবিন্যাস স্বীকৃত এবং কবিতাটি একজন মধ্যশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তির



রচনা হলেও তা ঐতিহ্যের অন্তর্গত হয়ে যায়। লোকসংস্কৃতি এ ভাবেই গড়ে ওঠে, তার সবটাই 'লোক' বা 'জনসাধারণে'র স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি নয়; এর নির্মাণে সমাজের বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা থাকে। খাসি সমাজে বাখরাওরা দরবারের সদস্য ও মন্ত্রীমণ্ডলী, তাঁরা শাসনপ্রধান ও সীয়েমকে মন্ত্রণা দেন, পুরোহিতরা আচার উৎসবের কেন্দ্রে থাকেন এবং তাঁরাই তো আজকের বিচারে খাঁটি বুদ্ধিজীবী ও মধ্যশ্রেণীভুক্ত। আরও উল্লেখযোগ্য পরবর্তীকালে খাসি পাহাড়ে যে আধুনিক বুদ্ধিজীবী মধ্যশ্রেণী শতাধিক বছরে গড়ে উঠেছে, প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের অনেকেই বাখরাওদের বংশোদ্ভূত। সীয়েম ও পুরোহিতও (লিংডো) অভিজাতরূপে স্বীকৃত। তা ছাড়া, যে কবিতায় জনগণকে শাসনপ্রধান ও অভিজাতদের প্রতি আনুগত্যের উপদেশ থাকে তা 'লোক' বা জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত নির্মাণ বলে মানতে দ্বিধা হয়। যদি তা-ও মানতে হয় তা হলে মনে হয় জনগণের চেতনাও একটি ছাঁচে অভ্যস্ত, যে ছাঁচ তখন প্রথাসিদ্ধ, অর্থাৎ সামাজিক স্তর বিন্যাস প্রথার অনুমোদন পায়।[১৫] এবং প্রথা যে সমাজপ্রধানরাই নির্দিষ্ট করে দেন তা বলাই বাহুল্য।

এখন নেমে আসি পাহাড় থেকে সমতলে, মধ্যযুগের বাংলায়, মঙ্গলকাব্যের বাংলায়। প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল যে আমি সাহিত্যের ছাত্র নই, আমার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস জ্ঞান অপরিণত; তাই আমি কিছু প্রশ্ন তুলতে চাই মাত্র। বিদ্বৎজনেরা বিচার করবেন এই প্রশ্নগুলি অপ্রাসঙ্গিক কি না। এবং আমার সহায় কয়েকজন বিশেষজ্ঞের দেওয়া তথ্য, তাঁদের বিচার ও সিদ্ধান্ত।

প্রথম প্রশ্ন, মঙ্গলকাব্য কি লোকসংস্কৃতির অংশ লোকসাহিত্য দ্বিতীয়, এই কাব্যগুলির রচয়িতা কি লোকসংস্কৃতির স্টিরিওটাইপ 'লোক'; এবং তৃতীয় প্রশ্ন, এর রচনা ও প্রচার কি মৌখিক? এই তিনটি প্রশ্নই কিন্তু পরস্পরযুক্ত। তিনটি প্রশ্নের উত্তরই যদি 'না' হয় তা হলে আমাদের সমস্যা মেটে, আমরা স্টিরিওটাইপের অভ্যাসে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। কিন্তু প্রথম প্রশ্নের উত্তর যদি 'হ্যাঁ' হয় তা হলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরও সদর্থক হতে বাধ্য; অন্যথায় 'লোক' ও 'লোকসংস্কৃতি'র স্টিরিওটাইপ সংজ্ঞা বর্জন করতে হবে এবং মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকেও 'লোক'—এর অন্তর্গত মানতে হবে; মানতে হবে যে পুঁথিসাহিত্যও কখনও লোকসাহিত্যের অংশ হতে পারে।

প্রথম প্রশ্নের একটি সদর্থক উত্তর, অন্তত মনসামঙ্গলের ক্ষেত্রে, পাচ্ছি আশুতোষ ভট্টাচার্যর রচনায়। তিনি বলছেন, 'যে সকল উপকরণের উপর ভিত্তি করিয়া সমগ্র বাংলায় একটি অখণ্ড লোক সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, মনসা-মঙ্গল তাহাদেরই অন্যতম' (ভট্টাচার্য, ১৯৫৪)। এবং '... খৃস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী হইতেই মনসাদেবীর মাহাত্ম্য বাংলা পাঁচালীতেও কীর্তিত হইতে লাগিল। তখনই একটি অপূর্ব কাহিনী এই দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের অবলম্বন হইল—তাহাই বাংলাদেশে আজ পাঁচশত বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, ইহা বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী। এই কাহিনী অবলম্বন করিয়াই মধ্যযুগের বাংলার লোক-সাহিত্যের বিশিষ্ট একটি শাখা গড়িয়া উঠিয়াছে — তাহাই মনসা-মঙ্গল' (ভট্টাচার্য, ১৯৫৪ : ১৮)। এই উক্তিগুলি যদি মানা যায় তা হলে সমস্যা তৈরি হয় দ্বিতীয় প্রশ্নে, মঙ্গলকাব্যের রচয়িতাদের পরিচয়ে। আশিসকুমার দে জানাচ্ছেন, 'মধ্যযুগের কবিদের বেশির ভাগ ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাঁদের লেখাপড়া ছিল সংস্কৃত পুরাণ-শাস্ত্র-স্মৃতি ইত্যাদি। কাজেই দেবভাষার অপার প্রভাবকে তাঁরা এড়াবেন কি করে? এ তাঁদের শিক্ষার ভাষা কিংবা উচ্চতর সাহিত্যের ভাষার মানদণ্ড। যাদের কথা তাঁরা লিখছেন এবং যাদের কাছে গাওয়া হচ্ছে, সেসব মানুষের সংস্কৃতজ্ঞান ছিল না' (দে, ১৯৯৭ : ৬৬)। এবং, 'মানবজীবনের লৌকিক কণ্ঠস্বর তাঁরা কি যথার্থভাবে শোনাতে পারছিলেন?' (ঐ. পৃ: ৬৬) আশিসকুমার দে-র প্রশ্নটি অমূলক নয়। সংকট তৈরি হয় রচয়িতাদের পরিচয়, বিশেষত বংশপরিচয়, তাঁদের সাক্ষরতা, পাণ্ডিত্যের স্তর ইত্যাদি জানলে এবং তাঁদের কাব্যের ভাষা লক্ষ করলে। তাঁরা যে মূলত উচ্চবর্ণের মানুষ ছিলেন এবং তাঁদের বংশপরিচয় ও পাণ্ডিত্যের গর্বপ্রকাশ করেছেন তাঁদের আত্মপরিচয়ে তা তো জানা যায় মনসামঙ্গলের দুই কবি নারায়ণ দেব ও বিজয় গুপ্তের কাব্যেই : 'নারায়ণ দেব কয় জন্ম মগধ। মিশ্র পণ্ডিত নহে ভট্টবিশারদ।। অতি শুদ্ধ জন্ম মোর কায়স্থের ঘর। মৌদগোল্য গোত্র মোর গাঁই গুণাকর।।'[১৬] 'পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূর্বে ঘন্টেশ্বর। মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর।। চারি বেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল। বৈদ্যজাতি বসে নিজ শাস্ত্রেতে কুশল।। কায়স্থজাতি বসে তথা লিখনের শূর। অন্যজাতি বসে নিজ শাস্ত্রে সুচতুর।। স্থান গুণে যেই জন্মে সেই গুণময়। হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে বসতি বিজয়।।'[১৭] এঁদের এই পরিচয় জেনে ওয়াকিল আহমদও বলছেন যে মঙ্গলকাব্য মূলত 'ভদ্রসাহিত্য' কারণ 'মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শিবমঙ্গল ব্রাহ্মণ কবিপণ্ডিতরাই রচনা করেছেন' (আহমদ ১৯৭৪ : ১৯)। 'লোক' ও 'লোকসংস্কৃতি'র অভ্যস্ত সংজ্ঞা মনে রাখলে, অর্থাৎ 'লোক' বলতে যদি বুঝি নিরক্ষর নিম্নবর্গের মানুষজন, 'লোক-সংস্কৃতি' যদি হয় মৌখিক, লোকসাহিত্যের ভাষা যদি হয় জীবনযাপনের কথোপকথনের ভাষা (বিশুদ্ধ বাংলা নয়), যদি রচয়িতার পরিচয় না জানা যায়, তা হলে মনসামঙ্গল সহ সব মঙ্গলকাব্যকেই কিন্তু লোকসাহিত্য বলা যাচ্ছে না। তার 'ভাষাপট ও ভাবকথা' আলাদা। কিন্তু আমাদের তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরটা একটু জটিল — 'না' এবং 'হ্যাঁ'। মঙ্গলকাব্য মূলত পুঁথিসাহিত্য, মৌখিক নয়, কিন্তু তার প্রসার মৌখিক। এ-সত্য অস্বীকার করা যাবে না যে এই কাব্য,

বিশেষত মনসামঙ্গলের প্রসার লোককীবনে ব্যাপক, সাময়িক ও স্থানিক উভয় মাপেই।

এই প্রসার ও প্রচারের কথা মনে রাখলে, অর্থাৎ লোক ও লোকসংস্কৃতির স্টিরিওটাইপ থেকে সরে আসতে পারলে এবং যদি মানা যায় (মানতে বাধা দেখি না) যে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর (অবশ্যই তাঁরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত) রচনা, পুঁথি নির্ভর হলেও, কবির পরিচয় জানা থাকলেও, লোকসাহিত্যের মর্যাদা পেতে পারে। এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাই নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্যর বিবরণে : 'তাঁহার (নারায়ণ দেব-এর) কাব্যই সমস্ত মনসা-মঙ্গল কাব্যের মধ্যে সর্বাধিকপ্রচারলাভ করিয়াছিল। ইহা খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বেই আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও সুর্মা উপত্যকা উভয়স্থানেই প্রচারিত হইয়াছিল, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ইহা অনুপূর্বিক মধ্যযুগীয় অসমীয়া ভাষায় পরিবর্তিত হইয়াছে এবং আসামবাসীগণ তাঁহাকে অসমীয়াভাষার আদিকবি বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। নারায়ণদেবের পুঁথি উত্তরবঙ্গে প্রচারলাভ করিয়াছিল, সেই পথেই তাহা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও পূর্ববঙ্গের পথে সুর্মা উপত্যকায় প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। ইহা এতদিনের কথা যে তাঁহার কাব্যে তাঁহার বাসস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও আসামের ব্রহ্মপুত্র ও সুর্মা উভয় উপত্যকায়ই তাঁহার বাসস্থান সম্বন্ধে বহু জনশ্রুতি প্রচলিত হইয়াছে। আসামের গোয়ালপাড়া, কামরূপ, মঙ্গল দৈ প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহার বাসস্থান সম্বন্ধে বহু জনশ্রুতি আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে। শ্রীহট্ট জিলায়ও তাঁহার বাসস্থান সম্বন্ধে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে' (ভট্টাচার্য ১৯৫৪ : ২)।

লোকসংস্কৃতির প্রকৃত মর্যাদা তাই এর রচনা ও নির্মাণেই মাত্র নয়, তার প্রচার, প্রসার ও গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপকতায়। এবং লোকসংস্কৃতি যে মাত্র স্টিরিওটাইপ 'লোক' এর নির্মাণ নয়, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরাও যে এর নির্মাণে অংশ নিতে পারেন, তার প্রমাণ রইল বাংলা মঙ্গলকাব্যে। মনসামঙ্গলের রচয়িতা নারায়ণ দেব, বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি পণ্ডিতকবিরা, তাঁদের শিক্ষার স্তর ও বংশপরিচয় নিয়ে যে মধ্যবিত্ত ট্র্যাডিশনাল এলিট বা বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মানুষ তা অস্বীকার করার উপায় কী। এবং তাঁদের রচনাই যে কালক্রমে বাংলার লোকসংস্কৃতির সমৃদ্ধ রচনা হিসাবে গৃহীত হয় ও মান্যতা পায় (শুধু বিশেষজ্ঞদের বিচারে নয়, জনজীবনেই) তা-ও অস্বীকার করা যায় না।

উদাহরণ বাড়তেই পারে কারণ তা খুব কম নয়। পুরাকাল থেকে মধ্যযুগ হয়ে, আধুনিক কাল পর্যন্ত, বিস্তীর্ণ ধারাবাহিকতায় আমাদের উদাহরণ বিস্তর এবং তার ব্যাখ্যায় আমার সিদ্ধান্তের, অর্থাৎ লোক ও লোকসংস্কৃতির স্টিরিওটাইপ থেকে সরে এসে এতদিন পর্যন্ত অগ্রাহ্য অনেক নমুনাকেই যে লোকসংস্কৃতি হিসাবে মান্যতা দেওয়া যায় আর মানা যায় যে 'লোক' ছুঁয়ে আছেন মধ্যবিত্ত সহ অনেক শ্রেণীতেই, তার সমর্থন দাবি করা যায়। কিন্তু এই প্রবন্ধের সীমার কথা ভেবে, সব উদাহরণের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়ে, উল্লেখ করি শুধু, যাতে বিশেষজ্ঞরা তাঁদের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

শুরু করা যাক বাংলার কবিয়ালদের নিয়ে কারণ তাঁরা এক সন্ধিক্ষণের কবিকুল যখন সাহিত্য রাজসভা থেকে জনসভার দিকে পা বাড়িয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদের অবস্থানের যথাযোগ্য ব্যাখ্যা করেছেন বিনয় ঘোষ : 'অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রায় এক শতাব্দীর সাহিত্যের ইতিহাস হল প্রধানত বাংলার কবিয়ালদের ইতিহাস। এই সময় ইংরেজের প্রয়োজনে বাংলার নতুন রাজধানীরূপে কলকাতা শহর গড়ে উঠছে। তার সঙ্গে ইংরেজের অনুগ্রহে নতুন এক শ্রেণীর বাঙালী ধনিক বাংলার সমাজে দেখা দিচ্ছে। ... এক বিচিত্র শ্রেণীবিন্যাস হচ্ছে বাংলার সমাজে, পুরাতন শ্রেণীবিন্যাসকে ভেঙেচুরে দিয়ে। ধীরে ধীরে হলেও, বাংলার সমাজে এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ হচ্ছে।... বাংলার কবিয়ালরা প্রধানত তাঁদেরই অনুগ্রহজীবী ছিলেন।... এই কবিয়ালদের কবিসঙ্গীতের ধারাতেই বাংলার সন্ধিক্ষণের শ্রেষ্ঠ কবি ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল বাংলা সাহিত্যের আসরে আর কোনও উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেন নি। .... বাংলার কবিয়ালরা ছিলেন কাব্যের ফিরিওয়ালা। এইদিক থেকে বিচার করলে কবিয়ালদের ইতিহাস সত্যিই যুগান্তকারী ইতিহাস। তাঁরা সাহিত্যে এক নবযুগের প্রবর্তক অথবা এক অভিনব নবযুগের প্রতিনিধি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস তাঁদের নিয়েই শুরু। আমরা আধুনিক প্রকাশক ও সাধারণ পাঠকযুগের সাহিত্যিকরা বাংলার এই কবিয়ালদেরই বংশধর। .... যুগসন্ধিক্ষণের প্রতিনিধিরূপে কবিয়ালরা তাই স্মরণীয়। .... ভোলা ময়রা ও তাঁর সমসাময়িক কবিয়ালরাই এই কারণে আধুনিকযুগের প্রবর্তক, ভারতচন্দ্র নন। .... তাঁদের ভিতর থেকেই আমরা কবি ঈশ্বর গুপ্তকে পেয়েছি। .... ঈশ্বর গুপ্তই বাংলার প্রথম কবি যিনি রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতার মোহ ত্যাগ করে, জনসভার দিকে সাহস করে পা বাড়িয়েছিলেন। নতুন শিক্ষিত বাঙালী সমাজ ও বাবুসমাজ নিয়ে সেই জনসভা গঠিত ছিল' (বিনয় ঘোষ, ১৯৭৮ : ৩০-৩৫)।

সন্ধিক্ষণের এই কবিয়ালরা যেমন সাহিত্যের এক নবযুগের সূচনা করলেন, তেমনই তাঁরাই প্রবর্তক বাংলা লোকসংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট উপাদানের — কবিগানের। তাঁরা যে ঐতিহ্য গড়লেন সেই ঐতিহ্যেই বেড়ে উঠল, কালক্রমে নতুন রূপ পেল বাংলার কবিগান। যে ঐতিহ্য এখনও জীবন্ত। কিন্তু তার শুরুটা,





অন্তত তার ব্যাপকতার শুরু, নগর কলকাতার ক্রমবিকশিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নাগরুচির চরিতার্থতায়। এই কবিয়ালদের পেটুন তখন গ্রামীণ কৃষিসমাজ নয়, নগর কলকাতার মধ্যবিত্তশ্রেণীর জনসভা। তখন কবিগানের গৃহীতা স্টিরিওটাইপ 'লোক' নয়, একটি নতুন শ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী। কবিয়ালদের বলা যায় সেই সময়ের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এবং বুদ্ধিজীবীরা মধ্যবিত্তের এক স্বীকৃত অংশ। রাম বসু, হরু ঠাকুর বা ভোলা ময়রাদের কি গ্রামীণ কৃষিজীবী 'লোক' বলা যাবে? তাঁরা বস্তুতই তখনকার মধ্যবিত্তশ্রেণীর অংশ হয়ে যান, নতুন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী হিসাবে, বুদ্ধিজীবী পেশাদার এই কবিকুল। তাঁরা শুধুই মধ্যবিত্তশ্রেণীর রুচি চরিতার্থ করেননি, সেই সূত্র ধরে, তাঁদের পেশার সূত্রেও, তাঁদের অবস্থান মধ্যবিত্ত শ্রেণীতেই।

আবার তাঁরাই বাংলা লোক সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট ধারার প্রবর্তক। লোকসংস্কৃতির চিহ্ন যে স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতায় শুধুই নির্মানে নয়, প্রসারে, তার উদাহরণ মিলছে কবিগানে। আর একটি তথ্য আমাদের এইসব সিদ্ধান্তের সহায়ক হতে পারে : আধুনিক কালের বিখ্যাত কবিয়ালদের বংশপরিচয়ের তথ্য। রমেশ শীলের পিতা ছিলেন পেশায় কবিরাজ (চৌধুরী, ১৯৯৩ : খ) গুরুদাস পালের পিতা ছিলেন জুটমিলের শ্রমিক, 'মেটিয়াবুরুজের ঘনবসতি এলাকাটি ছাড়িয়ে গিয়ে আধাশহর আধাগ্রাম বদরতলা'র বাসিন্দা (ভট্টাচার্য ও বাগচি, ২০০০ : ২০-২১), শেখ গুমানি মুর্শিদাবাদ জেলার জিনদিঘি গ্রামের দেওয়ান বংশের সন্তান (রাকিব, ২০০১ : ১০)। রাম বসু ভোলা ময়রাদের উত্তরসূরী, লোকসংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট ধারার বাহক এই কবিয়ালদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত বুদ্ধিজীবী বলতে বাধা দেখি না। এবং তাঁদের রচনাকে লোকসংস্কৃতি বলতেও বাধা নেই, যদি আমরা স্টিরিওটাইপগুলিকে সঙ্গীত অগ্রাহ্য করি।

এই প্রক্রিয়াতেই হাসন রাজা বা আববাসউদ্দিনের রচনা লোকসঙ্গীতের মর্যাদা পায়। হাসন রাজা যে জমিদার ছিলেন শুধু তাই নয়, ভোগী ও অত্যাচারী জমিদার ছিলেন, তা তো জানা তথ্য আর আববাসউদ্দিন যে সম্ভ্রান্ত 'সেখ' পরিবারের সন্তান এবং তাঁর পিতা ছিলেন আইনজীবী, তাও-তো আমাদের জানা। অথচ এঁদের রচিত গীতি যে লোকগীতি তাও-তো মানা হয়েছে। যদি 'লোক'-এর অভ্যস্ত সংজ্ঞা আমরা মানি তা হলে কিন্তু এই মেনে নেওয়া ভুল। আর যদি 'লোক'-এর ও 'লোকসংস্কৃতি'র পরিবর্তিত সংজ্ঞায় আস্থা রাখি তা হলে মানতে অসুবিধা দেখি না।

পৌঁছে যাই হাল আমলে। এই সময় মধ্যবিত্তেরা নানাভাবেই তাঁদের নিজস্ব লোকসংস্কৃতি গড়ছেন আর অন্য 'লোক'-এর সংস্কৃতিতে তাঁদের পরোক্ষ প্রভাব থাকছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় গণমাধ্যমের। এই মাধ্যম বস্তুতই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের নিয়ন্ত্রণে, বাণিজ্যিক, সরকারি, সামাজিক, যাই হোক না কেন। তার প্রভাবে স্বীকৃত লোকসংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটছে, ঘটবে, এই সত্য, একুশ শতকের গোড়ায়, বিশ শতকের অভিজ্ঞতার পর অস্বীকার করার উপায় নেই। লোকসংস্কৃতির পরিবর্তন তার স্বাভাবিক নিয়মেই যেমন ঘটে, তেমনই বাইরের চাপ ও প্রভাব কখনওই অস্বীকার করা যায় না। এই সংস্কৃতি সামাজিক ভাঙাগড়ার আওতার বাইরে — এই ধারণা ভুল। আধুনিককালে এই ভাঙাগড়ার অনেক তীব্র ও দ্রুততর। যে কোনও সংস্কৃতির অন্তর্বলয় ও বহির্বলয়, উভয়ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তনের চাপ থাকবেই। লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই প্রক্রিয়া বাস্তব কারণ এই সংস্কৃতি স্থবির নয়, জঙ্গম; পরিবর্তন তার সজীবতার লক্ষণ। এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার বাইরেও এক ধরনের চাপ থাকে; আধুনিক কালের গণমাধ্যম এই চাপ গড়ে দ্রুততর।

একজন গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ মিহির ভট্টাচার্যর একটি উক্তি তাই খুব সত্য বলে মনে হয় : 'আধুনিক মাধ্যমের শারীরিক বিস্তারের চেয়ে তার চৈতন্যভেদী বশীকরণ সম্ভবত অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। অবশ্য ভারতীয় সমাজের এখন যে পরিস্থিতি তাতে ভোগ্যপণ্যের অন্যান্য বাজারের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বাজারের দ্রুতপ্রসার অবশ্যম্ভাবী'। এবং যেন 'একদিকে দেখা যায় যে গ্রামীণ শিল্পীরাই বিষয়বস্তু এবং প্রয়োগ বদলে নিচ্ছেন সময়ের চাপে, অন্যদিকে লোকরীতি ব্যবহার করে কৃত্রিম ও মিশ্রিত একটি ঢং প্রচলিত হচ্ছে শহুরে প্রমোদ-বাজারের চাহিদায়। এই দুই প্রক্রিয়ার পিছনেই আছে সমাজব্যবস্থার নগরকেন্দ্রিক সংস্কৃতিধারণার চাপ' (ভট্টাচার্য ১৯৯৯ : ৪৭) এই চাপ তৈরি হয় মূলত গণমাধ্যমে আর নগরকেন্দ্রিক সংস্কৃতিধারণার কেন্দ্রে তো থাকেন পেশাদার বুদ্ধিজীবীরাই, যাঁরা অবশ্যই মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। এই প্রক্রিয়া আজ আমাদের এমন চেনাজানা যে উদাহরণ দেওয়া বাহুল্য মনে হয় যদিও উদাহরণ আছে বিস্তর। মিহির ভট্টাচার্য বাংলার বাউলসঙ্গীত ও আলকাপের কথা বলেছেন, আসামের বিষ্ণাণ ও নাচ, সেরাইকেলা ময়ূরভঞ্জের ছৌ ইত্যাদি নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন অনেকেই — দুশ্চিন্তা এই যে গণ মাধ্যমের দাবিতে ও চাপে এদের শুদ্ধতা বজায় থাকছে না — আমাদের বাউল সঙ্গীত নিয়ে এই দুশ্চিন্তা কম কিছু না। কিন্তু সময়ের চাপ কে আটকাবে? শুধু অভিকরণ শিল্প (Performing Arts) -ই তো না, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই তো এই প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায়। এমনকী ধর্মাচারও বাদ পড়ে না। মন্দিরে সমবেত বা একক ধর্মসঙ্গীতের বদলে ক্যাসেটের ব্যবহারও দেখা যাচ্ছে।[১৭] ভারতবর্ষের, বিশেষত উত্তর ভারতের, তথ্য জানিয়ে উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণ করেছেন পিটার ম্যানুয়েল।[১৮] লোকসংস্কৃতি যেমন মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে সর্বদা যুক্ত, হাল আমলে গণমাধ্যম প্রায় সে

ভাবেই যুক্ত — প্রত্যন্ত প্রদেশেও তার বিস্তার। ক্যাসেট, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি কি আজ আর মাত্র নাগরিক, গ্রামাঞ্চলেও কি তার প্রসার নেই? এবং শহরেই হোক, গ্রামেই হোক, মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এর প্রভাব থাকবেই। আর বলাই বাহুল্য, এই প্রভাবের কেন্দ্রে ও নিয়ন্ত্রণে থাকেন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা।

'লোক'-এর নতুন সংজ্ঞায় আস্থা রাখলে আমরা জানি যে মধ্যবিত্ত কিছু মানুষ ও গোষ্ঠীও তাঁদের নিজস্ব লোকসংস্কৃতি তৈরি করেন। এই সংজ্ঞাটি কী তা এই আলোচনার প্রথম অংশে আছে। ফলে, 'লোকসংস্কৃতি' সম্পর্কে আমাদের ধারণাও পালটাতে হচ্ছে। এই সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার কখনও সীমাবদ্ধ থাকে মধ্যবিত্ত মণ্ডলেই, আবার কখনও ছড়িয়ে যায় বৃহত্তর সমাজে। দু'টি প্রসঙ্গের উল্লেখ করা যায়। একটি 'তামাশা কথা' (Joking Stories) আর অন্যটি 'ভোটসাহিত্য' অর্থাৎ নির্বাচনকেন্দ্রিক কথা; ছড়া, তামাশা ইত্যাদি। শুরু করি দু'টি সদ্যনির্মিত ও প্রচারিত তামাশা-কথা দিয়ে। প্রথমটি আমি শুনেছি 'পদক্ষেপ' পত্রিকার সম্পাদক সমীর বসুর বয়ানে : 'সম্প্রতি ইউরোপ আমেরিকায় অভারতীয়দের কাছে ভারতীয় রান্না খুবই জনপ্রিয় এবং ভারতীয় রেস্তোরাঁতে আমেরিকান ও ইউরোপীয়দের জববর ভিড়। মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতিরাও বাদ যান না। এমনি এক রেস্তোঁরায় গেছেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ। এবং তারিয়ে তারিয়ে খেয়েছেন ভারতীয় "কারি" ইত্যাদি। খাওয়া শেষ হলে তাঁর টেবিলের কাছে এল এক "ওয়েটার"। সে বেচারা সদ্য সদ্য দেশ থেকে এসেছে, তখন পর্যন্ত ইংরেজি ভাষণে রপ্ত হয়নি। সে তার অভ্যাসবশত বিশুদ্ধ হিন্দিতে জানতে চাইল, 'সাব, বিল লা দেঁ'। শুনেই বুশ সাহেব ঝটিতি এক লাফে রেস্তোরাঁর বাইরে এবং তাঁর ত্বরিত পলায়ন। তাঁর কর্ণকুহরে কী বার্তা পৌঁছেছিল তা অনুমান করা যায়;ঘটনাটি ঘটে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পর।'

এই তামাশাটি যখন আমি শোনালাম আমার এক ভাই ও ভ্রাতৃবধূকে, তখন ভ্রাতৃবধূ, কেকা নন্দী, পেশায় শিক্ষয়িত্রী, শোনালেন আরও একটি তামাশাকথা : 'পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু চুল কাটেন বাড়িতে। নাপিত এসে কেটে দিয়ে যান। জ্যোতিবাবুর স্ত্রী লক্ষ করেন প্রতিবারই চুল কাটার সময় নাপিত জ্যোতিবাবুর কানে কানে কী যেন বলেন। কৌতূহল বশত জানতে চাইলে নাপিত বলেন, তিনি বিশেষ কিছুই বলেন না, শুধু বলেন "মমতা"। শুনে জ্যোতিবাবুর চুল খাড়া হয়ে যায়, তার কাটতে সুবিধে হয়।'

'কথা'দুটি কি তথাকথিত 'লোক' এর তৈরি ও তাঁদের বলয়ে প্রচারিত? নিশ্চয়ই না। এ 'কথা' মধ্যবিত্তের তৈরি ও মধ্যবিত্ত সমাজে প্রচারিত।



এই ধরনের তামাশাকথা বাংলায়, ভারতে বা বিশ্বের অন্যত্র আছে বিস্তর। রাজীব গান্ধী যখন অপ্রত্যাশিতভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলেন তখন ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজ বিস্মিত এবং তাঁরা বিশ্বাস করতে পারেননি যে ভারতবর্ষের মতো দেশে তিনি প্রধানমন্ত্রী হবার যোগ্য। তখনই এই অবিশ্বাস, অনাস্থা ও সংশয়ের ফলে তৈরি হয় অনেক তামাশা কথা। এমন একটি আমি শুনেছিলাম দিল্লিতে ১৯৮৫-এর জানুয়ারি মাসে। এবং সে তামাশা যে কত দ্রুত ছড়িয়ে যায়, তা জানতে পারি একই 'কথা' যখন শুনতে পাই দশদিন পর আমার কর্মস্থল শিলংয়ে ফিরে। আমরা তো মধ্যবিত্ত, আমরাই শুনছি কারণ এ আমাদেরই কারও নির্মাণ এবং আমাদের সমাজেই প্রচারিত। রাজীব গান্ধী সম্পর্কিত এমনই আর একটি তামাশা নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন কিরিন নারায়ণ,[১৯] উৎসাহী পাঠক দেখতে পারেন। সর্দারজিদের নিয়ে তো আমাদের তামাশাকথা বিস্তর ও বহুল প্রচারিত। নিঃসন্দেহে তা মধ্যবিত্ত বলয়ে তৈরি ও প্রচারিত। ভারতের স্বাধীনতার পর প্রশাসনিক ও অন্যান্য স্তরে সর্দারজিদের ক্রম-উত্থান অন্যান্যদের যথেষ্ট উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারই অভিব্যক্তি এই সব তামাশাকথায়। এবং এই উদ্বেগ ও অভিব্যক্তি, দুইই, মধ্যবিত্তের।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ ভোটসাহিত্য। পশ্চিমবঙ্গে ভোটের ছড়া আমাদের খুবই পরিচিত। ১৯৫২-র প্রথম নির্বাচন থেকে আজ পর্যন্ত যত নির্বাচন হয়েছে তার প্রচারে ছড়া ও দেওয়াললিপি বড় অংশ জুড়ে থাকে, যখন খবরের কাগজের পাতার ওপর লাল নীল কালিতে পোস্টার লেখা হত তখন থেকেই। শুরু কিন্তু কলকাতা ও তার আশেপাশে। আজ তা ছড়িয়ে গেছে সর্বত্র। এবং এই ছড়ার রচয়িতা বেশির ভাগই নাগরিক ও শহুরে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী, একটি ছড়ার উল্লেখ করি যা আজ অবধি মুখে মুখে ফেরে : 'ভোট দিয়েছ কিসে, কাস্তে ধানের শিষে।' আমার ভুল না হলে, এটি পূর্ণেন্দু পত্রীর একটি কবিতার অংশ। এখন যে কবির নাম কেউ মনে রাখেনি তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। উল্লেখ্য আমার প্রয়াত অগ্রজ, গণনাট্য সংঘের কর্মীশিল্পী, ব্যোমকেশ সেনের ভোট-ছড়ার। তিনি কবি ছিলেন না, তাঁর কোনও সাহিত্যকর্মের প্রকাশনা নেই, এমনকী তাঁর কোনও ছড়ার খাতারও হদিশ পাওয়া যায়নি। অথচ, আমৃত্যু তিনি ভোটের ছড়া লিখেছেন এবং তাঁর অঞ্চলে পার্টিকর্মীরা তা প্রতি নির্বাচনেই দেওয়ালে, পোস্টারে লিখেছেন।

আমাদের দেশে হয়ত এখনও তেমন দেখা যায়নি কিন্তু উন্নত দেশে, যেমন ব্রিটেনে, নির্বাচন প্রচারে যে লোককথা-তুল্য কাহিনি রচনা করা হয়, তার একটি কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা করেছেন গিলিয়ান বেনেট। তাঁর পর্যালোচনা এই যে আধুনিক





নির্বাচনে যাঁদের 'স্পিন ডক্টর' বলা হয়, অর্থাৎ নানা মার্গের পেশাদার বুদ্ধিজীবী, তাঁরা নির্বাচনের প্রচারে লোককথাতুল্য কাহিনি নির্মাণ করেন এবং তার বহুল প্রচার হয়।[২০]

এবার প্রবন্ধটি শেষ করার পালা। বলা যায় আমাদের কথাটি ফুরল, নটে গাছটি মুড়ল। এবং আশা করতে পারি যে লোকসংস্কৃতি নির্মাণ ও প্রসারে যে মধ্যবিত্তের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ দুই ভূমিকাই থাকে তা প্রতিষ্ঠা করা গেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নানা গোষ্ঠীও যে তাঁদের নিজস্ব 'লোকসংস্কৃতি' গড়েন তা-ও মেনে নিতে চাই। এই তথ্য ও তত্ত্বই এই প্রবন্ধের প্রস্তাব।

## সূত্রনির্দেশ

১. ১৮৪৬ সালের ২২ আগস্ট লন্ডনের The Athenaeum পত্রিকায় একটি চিঠিতে William Thoms এই সংজ্ঞা প্রস্তাব করেন।

২. পুরাণ, কিংবদন্তী, লোককথা, গাথাকাব্য, ধাঁধাঁ, প্রবাদ, আচার, সংস্কার, প্রথা ইত্যাদি মূলত এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

৩. দ্র. Leach and Fried, 1949.

৪. এই প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনার জন্য দ্র. আমার কয়েকটি রচনা, ১৯৮২, ১৯৮৩, ১৯৮৪।

৫. দ্র. Mao Tsetung 1971 : 11-22.

৬. উইলিয়াম অ্যাডাম-এর এই রিপোর্টে বলা হয় : 'There is no class of persons that exercises a greater degree of influence in giving native society the tone, the form, and the character which it actually possesses than the body of the learned, not merely as the professors of learning, but as the priests of religion'. Benoy Ghose 1972 : 75.

৭. দ্র. আনতোনিও গ্রামশি, নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ, সম্পা. ও অনু. সৌরীন ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৩ : ৮

৮. ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মেঘালয় রাজ্যের খাসি-জয়ন্তিয়া জনজাতি সমাজে এই প্রক্রিয়া খুবই স্পষ্ট। এবং বলা যায় যে জনজাতি সমাজে এটাই প্রায় সাধারণ প্রথা। দ্র. Soumen Sen 1985.

৯. বিনয় ঘোষ বলছেন, 'The traditional elite of Bengal was both intellectual and religious elite, and as such the tone and the form of the Bengali society was given by them. দ্র. Benoy Ghose 1972 : 75.

১০. এই সংজ্ঞা পরিবর্তন নিয়ে গত কয়েক দশক অনেক আলোচনা হয়েছে। প্রসঙ্গত দ্র: আমার একটি প্রকাশিতব্য রচনা (লোকশ্রুতি ২০) — 'লোক-এর বিভাজন'।

১১. এই সংজ্ঞার আলোচনার জন্য দ্র. Ben Amos, 1971.

১২. খাসি-জয়ন্তিয়া জনজাতির সমাজ নির্মাণ প্রক্রিয়া ও লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে আমার আলোচনা (দ্র : Sen 1985) এই প্রসঙ্গে সহায়ক হতে পারে।

১৩. এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এই প্রবন্ধের সীমায় নেই। উৎসাহী পাঠকের মনোযোগ আমার কয়েকটি রচনার (১৯৮৫, ১৯৯৭ ও ১৯৯৯) প্রতি আকর্ষণ করি।

১৪. খাসি-জয়ন্তিয়া পাহাড়ে একটি লোককবিতার নাম ফাওয়ার এবং এই কবিতা রচিত হয় নানা উৎসব, খেলা বা প্রতিযোগিতা উপলক্ষে। উদ্ধৃত কবিতাটি এমনই একটি ফাওয়ার — আমার বাংলা অনুবাদে তা আর কবিতা থাকেনি অবশ্য, যদিও মর্মকথা অটুট আছে।

১৫. অনেক লোককাহিনি, বিশেষত পুরাণ বা মিথ যে স্বতঃস্ফূর্ত রচনা নয়, পরিকল্পিত ও নির্দিষ্ট, খাসি-জয়ন্তিয়া লোককাহিনির বিশ্লেষণে সে আলোচনা আছে আমার একটি প্রবন্ধে। দ্র. Sen, 2001.

১৬. দ্র. ভট্টাচার্য, ১৯৫৪ : ২।

১৭. দ্র. ঐ ২।

১৮. ম্যানুয়েল বলছেন, 'Cassettes have become the first and in many cases the only mass medium to represent the extraordinary diversity and richness of India's myriad forms or India's local religious song and discourse. ... Cassettes are not neutral mass medium. Clearly, in some contexts the spread of tapes has been at the expense of live performance. (Manuel 1996 : 129).

১৯. দ্র. Narayan, 1993 : 177-204.

২০. বেনেট জানাচ্ছেন, 'Certainly, story-like themes seem to be an inherent part of electioneering. .... To an increasing extent, too, an election is conceived and controlled by professional storytellers .... their so-called "spin doctors" .... The story-isation of election can also be seen in the way both personalities and issues are made to fit folktale patterns' (Bennett 1995 : 22-23).

# এস ওয়াজেদ আলীর প্রাসঙ্গিকতা

## বিজিতকুমার দত্ত

প্রায় পাঁচশো বছর ধরে বাংলাদেশ মুসলমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটা একটা যুগান্তকারী ঘটনা। এই কারণে যুগান্তকারী যে ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগেও যে বিদেশিরা এসেছিলেন সেই বিজয়ী জাতি বিজিত জাতির দেহে লীন হয়ে গিয়েছিলেন। কিছু ব্যতিক্রম আছে। এই মুহূর্তে যে দুটি সম্প্রদায়ের কথা মনে আসছে তারা হলেন পার্শি এবং খ্রিস্টান। মুসলমান বিজয়ের তাৎপর্য আরও গভীর এবং ব্যাপক। বাংলাদেশের কথাই ধরা যাক। পাঠান মোগল রাজত্বে কখনও সহিংস কখনও অহিংস পথে অন্ত্যজ হিন্দুরা মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হন। ধীরে ধীরে এই হিন্দু-মুসলমান কোনও কোনও অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠতাও লাভ করে। অন্ত্যজ হিন্দুরা বর্ণহিন্দুদের কাছে প্রায় উপেক্ষিত ছিল।

বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে অন্ত্যজ হিন্দুদের সামাজিক বৈষম্য ছিল ব্যাপক। অন্ত্যজ হিন্দুদের এখনও নিচু বলতে কেউ কেউ বেশ গর্ব বোধ করেন এবং কেউ কেউ শেষোক্তদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্যও করেন। এই তুচ্ছতা থেকে সরিয়ে এনে ইসলাম অন্ত্যজদের কোল দিয়েছিল। এস ওয়াজেদ আলি ইসলামের অন্যতম অবদান বলতে অন্ত্যজদের উদ্ধারকে খুব বড় একটা স্থান দিয়েছেন। তিনি দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার নির্মমতার প্রসঙ্গ এনে বলেছেন ইসলাম না এগিয়ে এলে এরা সেই সময়ে যে তিমিরে ছিল আজও সেই তিমিরেই থেকে যেত। ইসলাম যেন এদের কাছে Mesiaha, আল্লাহর দূত ছিল। সেই অন্ত্যজ হিন্দু মুসলমান হয়ে গেল। হিন্দুর মনোপলি নষ্ট হল। ধর্মের চেহারাটা বদলে গেল। চরিত্র বদলে গেল।

এস. ওয়াজেদ আলী নৈষ্ঠিক মুসলমান। তাঁর প্রায় প্রতিটি দীর্ঘ নাতিদীর্ঘ এবং ক্ষুদ্র রচনায় তিনি ইসলামের, আল্লাহর, পয়গম্বরের কথা বলেছেন। আল্লাহ তায়লার প্রতি আনুগত্য, বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল এস ওয়াজেদ আলীর মননে, অনুভবে। তিনি ভারতবাসী কিন্তু বাঙালির মঙ্গলচিন্তাই তাঁর ধ্যানে ছিল। আবার, বাঙালির চিন্তায় তাঁর লেখার সিংহভাগই ছিল বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা। এটাও স্বাভাবিক বলে মনে হয়। কেননা তিনি তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের নানা কষ্ট দুর্দশার কথা জানতেন, কুসংস্কারের কথাগুলিও ভাল করেই জানতেন। এবং ধর্মভাবনাকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে কীভাবে স্বসম্প্রদায়ের উন্নতি সম্ভব তার আলোচনা করেছেন, বিশ্লেষণে এগিয়ে এসেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ইসলামধর্ম যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। খ্রিস্ট ধর্ম তা নয়। ইংরেজি শিক্ষিত ওয়াজেদ আলী যে যুক্তির পথে এগিয়ে যাবেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। যদিও এস. ওয়াজেদ আলীর লেখায় রবীন্দ্রনাথের কথা প্রায় পাওয়াই যায় না (ব্যতিক্রম আছে) তবুও রবীন্দ্রচিন্তায় সমাজের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সমাজের শুভ এবং মঙ্গলবোধের তিনি ছিলেন অতন্দ্র প্রহরী। ওয়াজেদ আলিকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করা অসমীচীন। তবু বলব আলী সাহেবের লেখায় রবীন্দ্রসমাজেরও প্রতিফলন দুর্লক্ষ নয়। পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী মুসলমান ধর্ম। ওয়াজেদ আলী 'পৌত্তলিক' (গুল-দাস্তা) গল্পে অনায়াসে স্থান করে দেন আলী হোসেনকে। আলী হোসেন একদিন দেখলেন কালির বরাভয় মূর্তি। মুসলমান পঞ্চায়েত বেত মারা, কান মলার ব্যবস্থা করল। আলী হোসেনের বক্তব্য শুনে এস ওয়াজেদ বিধান দিলেন, 'তোমার উপর যাতে কোন অত্যাচার না হয় সে চেষ্টা আমি করবো। আর, তুমিও একবার চেষ্টা করে দেখো সেই কল্পনার ছবি মন থেকে সরাতে পারো কি-না।' এইখানে আমরা এস ওয়াজেদ আলীকে তাঁর স্বরূপে দেখতে পাই। ঢাকা-কেন্দ্রিক শিখা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান আলী সাহেব। আলী সাহেব অবশ্য সমন্বয়ের কথা বলেননি কিন্তু সহনশীলতার উপর জোর দিয়েছেন। এটা যে খুব জরুরি ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যার বিশ্লেষণে ওয়াজেদ আলী সাহেবের মতামত লক্ষণীয়। তিনি বলেছেন, 'প্রতিবেশিক সমাবেশের দরুণ হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের জীবন এমনই ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট যে, হয় তারা পরস্পরের জীবনকে সুভাবে প্রভাবান্বিত করবে, নয় কুভাবে প্রভাবান্বিত করবে; এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। সুতরাং হয় তারা পরস্পরকে ভালবাসবে, নয় ঘৃণা করবে; বাংলাদেশে ঔদাসীন্যের ভাব পরস্পরের প্রতি পোষণ করার মত এমন আবেষ্টনীর মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ঠিক বসবাস করে না'।

এর কারণ কী? ওয়াজেদ আলী দশদফা কারণ উপস্থিত করেছেন : (১) ইতিহাসশিক্ষা (২) ধর্মগুরুর আবঞ্ছনীয় প্রভাব





(৩) সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন সাহিত্য (৪) চাকুরিজীবীর অর্থনৈতিক সমস্যা (৫) চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আধিপত্য (৬) অতীতকে ফিরিয়ে আনার দুরাশা এবং দুঃস্বপ্ন (৭) বিভিন্ন ধরনের জীবনযাপন প্রণালী (৮) সম্মিলিত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের অভাব (৯) ভবিষ্যতের জন্য সমবায়িক মনোভাবের অভাব (১০) বর্তমান বাঙালি জীবনে অবাঙালির অতিরিক্ত প্রভাব।

এস ওয়াজেদ আলীর বক্তব্য সঠিক ইতিহাস রচনা করতে হবে, ইতিহাসের সদর্থক চরিত্র বিবরণ বিশ্লেষণ বেশি করে পাঠ্য বইয়ে থাকবে। ইংরেজ রাজ্যও (উপনিবেশের কালে) ছিঁড়ে ফেলতে হবে। আর ধর্মগুরুদের সুবিধাবাদী কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে। নয়ত রাষ্ট্রের প্রগতিশীল চিন্তাকে তাঁরা বাধা দেবে। আমাদের প্রয়োজন সে বাধাকে অতিক্রম করা। সাহিত্যকে হতে হবে অসাম্প্রদায়িক। সাহিত্য প্রচারের বাহন নয়, কিন্তু সাহিত্যের পাঠক প্রচুর। তাদের চিত্তকে শুভবোধে উদ্রিক্ত করতে হবে। সাহিত্যই পারে, পরম অসহিষ্ণুতা, ঈর্ষা, ঘৃণাকে দূরীভূত করতে। ওয়াজেদ আলী জোর দিয়ে বলেন, 'এখন হিন্দু-মুসলমানের নিবিড় মিলনের প্রয়োজন আমরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করি। এখন প্রকৃতস্থ বাঙালী বোঝেন, হিন্দু-মুসলমানের আন্তরিক মিলন না হলে এদেশ রসাতলে যাবে, বাঙালী নিজ দেশে পথের ভিখারী হবে।' হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি, ঐক্যবোধ যাতে ফুটে ওঠে আমাদের সাহিত্যকর্মকে সেই দিকে সেইদিকে চালনা করতে হবে। এই সাহিত্যকে তিনি জাতীয় সাহিত্য বলেছেন। এখানে আমরা কি বলতে পারি হিন্দু-মুসলমানের এই সম্মিলিত চেষ্টাই জাতীয়তার আদর্শ? তা হলে, জাতীয় আদর্শ যদি ওই পথে চলে এবং প্রতিষ্ঠিত হয় তা হবে বাঙালি জাতির সাধনা। বাঙালি বলতে আমরা বুঝব বাঙালি হিন্দু-মুসলমান। মনে রাখতে হবে ১৯৪৩ সালে এস ওয়াজেদ আলীর এ সব লেখা প্রকাশিত হয়। যখন হিন্দুমুসলমান হিন্দুর ভেদ-বিভেদ প্রায় পাকাপাকিভাবে রাজনৈতিক নেতারা গ্রহণের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছেন। আলী সাহেবের দৃঢ়তা আরও প্রকাশ পেয়েছে যখন তিনি হিন্দু-মুসলমান বিভেদের বা বিরোধের কারণ বিশ্লেষণ করেন, 'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে তাদের সামাজিক মিলনের বিরলতা, তাদের ভিন্ন ভিন্ন জীবনধারণের প্রণালী, তাদের বিভিন্ন রীতিনীতি'।

আলী সাহেব বলেছেন, এই বিভেদ অনেকটাই সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনে। যুগধর্মের প্রভাবেই এটা সম্ভব হয়েছে। আমাদের প্রয়োজন এখন এই মিলনের পথে এগিয়ে যাবার পথকে ত্বরান্বিত করা। ধর্মের ক্ষেত্রেও এই সংস্কারের ব্যবস্থা করা দরকার। পূজা, পার্বণ, অনুষ্ঠান ধর্মের এই উপাদানগুলির সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করেন আলী সাহেব।

আলী সাহেব, এমিল লাড উইকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, 'The form has changed. One condition, however, has been required through all the ages – courage, physical as well as moral. For the rest, every revolution creates new forms, new myths, new rites; and the would be revolutionist while using old traditions must refashion them. He must create new festivals, new gestures, new forms which will themselves in turn become traditional. The aeroplane festival is new to-day. In half a century it will be entrusted with patina of tradition. কাজটা অত্যন্ত দুরূহ। এস ওয়াজেদ আলীও তা জানতেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, এ কাজে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে হবে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ। হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়কেই বুঝতে হবে জাতীয় ঐক্যই মূল কথা। কেবল মুখে নয়, কাজেও তা করে দেখাতে হবে। অনেকেই মুখোশ পরে থাকেন। ধর্মের এবং গোষ্ঠীর প্রচারেই তাঁরা অধিকতর উৎসাহী। ওই ভণ্ডামিকে আঘাত করা দরকার। আলী সাহেব ধর্ম, গোষ্ঠীকে মানেন। কিন্তু জাতীয় ঐক্যবিধানে আরও কিছু প্রয়োজন। ধর্মের প্রসঙ্গে ধর্মীয়তত্ত্ব কিংবা গোষ্ঠীর আলোচনায় গোষ্ঠীতত্ত্বের বিশ্লেষণ অবশ্যই থাকবে। কিন্তু জাতীয় ঐক্য স্বতন্ত্র কথা। জাতীয় ঐক্যের আলোচনায় জাতীয় কথাটির উপরই জোর দিতে হবে।

সর্বভারতীয় জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে তিনি সম্রাট আকবরকে প্রতিনিধিস্থানীয় পুরুষ রূপে গণ্য করেছেন। তাঁর ধ্যানের, মননের এবং বিচারের নিদর্শন তাঁরই রচিত আকবরের জীবনীর কথা মনে পড়ায়। বাঙালির ঐক্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি সিরাজদ্দৌলার নাম করেছেন। দেশবন্ধুর অবদানের কথাও স্মরণ করেছেন আলী সাহেব। গৌরকিশোর ঘোষ তার ত্রয়ী উপন্যাস জল পড়ে পাতা নড়ে, প্রেম নেই এবং প্রতিবেশীতে চিত্তরঞ্জন দাশের কথা বারবার স্মরণ করেছেন। সম্ভবত বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের রাজনীতির নায়ক বলে চিত্তরঞ্জনকেই গৌরকিশোর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আলী সাহেব নতুন নতুন উৎসব প্রবর্তনের কথা বলেছেন যেখানে হিন্দু-মুসলমান এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ মেলামেশার সুবিধা পাবে। এ যেন চৈত্রমেলা, হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠার কথা (যদিচ, হিন্দু নামটি মুসলমানদের পছন্দ হওয়ার কথা নয়)। এ প্রস্তাব নিঃসন্দেহে অভিনব। আজ বাংলাদেশে বোধ করি সবচেয়ে বড় উৎসব পয়লা বৈশাখের উৎসব। সম্মিলিত জাতির ওই উৎসব মিলনের প্রাঙ্গণ। আলী সাহেব বলেন, 'হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এখন বাঙালীর কাজ হচ্ছে, প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে, বাঙালীত্বের জীবনদায়ী আদর্শকে সম্মুখে রেখে নিজ দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়া; বিদেশীর বিষাক্ত প্রভাব থেকে, মাতৃভূমিকে মুক্ত করা। এই আদর্শের কল্যাণ স্পর্শই সাম্প্রদায়িকতার বিষ থেকে তার সমাজদেহকে মুক্ত করবে।'

দেশবন্ধুর স্বরাজ দল বারবার এ কথাই বলেছে। লক্ষ করতে হবে আলী সাহেব তাঁর জন্মভূমিকে মাতৃভূমি বলেছেন, এও তো সংস্কারমুক্ত মনের প্রকাশ।

আলী সাহেব রাজনীতির কথা বেশি বলেননি। তিনি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের কথা বলেছেন সংস্কৃতির দিক থেকে। রাজনৈতিক প্রচেষ্টার হালচাল তো তিনি দেখলেন। সেখানে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরকে ছাপিয়ে ভেদবিভেদ যেন দিনে দিনে বাড়ছিল। লালা লাজপৎ রায়, হিন্দু মহাসভা অন্যদিকে মুসলিম লিগের বিরোধটিকে জটিল করে তুলেছিল। গোলাম মুরশিদ স্পষ্টই বলেছেন এই বিরোধই বৃহদাকার ধারণ করে দেশবিভাগের জন্ম দেয়। আলী সাহেব বলেন খাওয়া বসায়, খেলাধুলায়, মেলামেশায়, আনন্দ উৎসবে হিন্দু মুসলমান যখন একত্র হবে তখনই মনের মিল হবে। প্রত্যেকের ধর্মকে স্বীকার করে নিতে হবে।

এই অন্তরের মিল নিয়ে আসতে পারে সাহিত্য, ভাষা। আজকে ভাবতে ভালও লাগে যে আলী সাহেব বাংলা ভাষা সম্বন্ধে এমন জোরালো সওয়াল করেছিলেন সে সময়ে।আগেও বলেছি আলী সাহেব হিন্দু-মুসলমান ধর্মের পৃথগত্ব যেমন স্বীকার করেন তেমনই মানেন বাঙালি বলে একটা জাতি আছে। এই বাংলার কথা বলতে গিয়েই তিনি বলেছেন, 'বাঙ্গলা হচ্ছে আমাদের মাতৃভাষা। বাঙ্গলাতেই আমাদের জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি করতে হবে। অন্য কোন ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করলে সে চেষ্টা নিশ্চয়ই বিফল হবে।' ১৩৩২ ভাদ্রের এই লেখা বা অভিভাষণ (বাঙ্গালী মুসলমান) মুসলমান বাঙালির উদ্দেশে রচনা। সে জন্যই বোধ করি তিনি আধুনিক বাংলাভাষায় মুসলমানের অবদান প্রায় নেই বলে খেদ প্রকাশ করেছেন। এই ভাষা পুষ্ট লালিত হয়েছে হিন্দুদের দ্বারা। তার সৌন্দর্যও হিন্দুর সৃষ্টি। এখন সময় হয়েছে বাংলা ভাষাকে গড়ে পিটে মুসলমান ভাবনা, সংস্কৃতি, ধর্মকে প্রকাশ করা। এখানে লক্ষ করতে হবে মুসলমান সমাজে আশরাফ আতরাফের ফারাকই নয়, শহরে এবং পল্লির মুসলমানদের মধ্যেও পার্থক্যের কথা। শহরে মুসলমানরা সাধারণত উর্দু ব্যবহার করেন, আর পল্লির মুসলমান বাংলাই ব্যবহার করেন। আর পল্লিবেষ্টিত মুসলমানদের বাদ দিয়ে (যারা সংখ্যায় গরিষ্ঠ) শহরের দিকে তাকিয়ে উর্দু গ্রহণ করা কখনওই সম্ভব নয়। আমরা বলি আলী সাহেবের বাঙালি জাতি হিসাবে ধর্মে বিভক্ত হয়েও ভাষার ক্ষেত্রেই একটি বিপ্লব ঘটাতে পারে মিলনের জন্য। মুখ্যত আলী সাহেব ধর্ম ও সংস্কৃতিকে পৃথক রূপে বিবেচনা করেছেন। উনিশ শতকেও মুসলমানি বাংলা বলে একটি ভাষা গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল। বলা বাহুল্য তা সফল হয়নি। একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন আলী সাহেব, এই ভাষাও হিন্দুর গড়া—মুসলমানের নয়। কী সংস্কার করতে চাইছেন আলী সাহেব? সবুজপত্রের লেখক, প্রমথ চৌধুরীর স্নেহধন্য আলী সাহেব কিন্তু কোনও ধর্মীয় বাতাবরণের কথা বলেননি। তিনি সহজ সরল বাংলা চেয়েছেন। চলতি বাংলাভাষাকেই গ্রহণ করতে বলেছেন। প্রয়োজনে শরৎচন্দ্রের ভাষাকেও তিনি অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তা হলেই ভাষা হয়ে উঠবে 'জীবনের শিল্প' (যে গ্রন্থে এই ভাষণটি ছাপা হয়েছে তার নাম 'জীবনের শিল্প')। এবং আদরের জাতীয় সাহিত্য। আলী সাহেব জোর দিয়ে বলেছেন প্রাচীনকে আঁকড়ে থাকলে মুসলমান সমাজের উন্নতি কখনওই হবে না। নব্যতন্ত্রীদের স্বাগত জানাতে হবেই। এও যেন সবুজপত্রের আহ্বান। রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে সবুজের অভিযানের কথাই এস ওয়াজেদ বলেছেন। গতানুগতিকতাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। Orthodoxy কে পরিহার না করলে বাঙালি জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। নবীনের উদ্দাম জীবনস্রোতকে বন্দনা না করলে জাতি (বাঙালি জাতি) ভালকে হারাবে। ওয়াজেদ আলী বলেন, 'সোলতান আবদুল হামিদ ভালমন্দের বিচার না করে রাজবলে সমস্ত নূতন জিনিষকে, আটক রাখতে, আর সমস্ত জরাজীর্ণ পুরাণ-জিনিষকে জাগিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন'। এর জন্যে সোলতান অনেক অনাচার, অত্যাচারও করেছিলেন। আলী সাহেব প্রশ্ন করেছেন এর ফল কী হল? নবীন তুর্করা এর ফলে পুরাতনের সঙ্গে অনেক উৎকৃষ্ট বস্তুকেও বিসর্জন দিল। ওয়াজেদ আলী সাহেব তুর্কদের সমর্থন করেননি। প্রাচীনের দেয়াল ধ্বসিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কোনও বিহারি মুসলমান বলেছিল বিহারে 'হিন্দু উকিল, হিন্দু ডাক্তার, হিন্দু শিক্ষক ছেয়ে গেছে কিন্তু মুসলমানরা তুলনায় যেই তিমিরে সেই তিমিরে।' উত্তরে আলী সাহেব বিশ্বে মুসলমানের জাগরণ, মুসলমানের শৌর্যবীর্যের উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি স্বীকার করেছেন ভারতে বিশেষত বাংলাদেশে মুসলমান পিছিয়ে আছে সন্দেহ নাই। এর পরিবর্তনের জন্যই তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থাকে মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে বলেছেন। এখানে প্রগতিবাদী আলী সাহেবকে পাই আমরা। তাঁর 'ভবিষ্যতের বাঙ্গালী' গ্রন্থেও আলী সাহেব ওই ভাষাসমস্যার উপর জোর দিয়েছিলেন। বোঝা যায় উনিশ শতকের মুসলমান বাঙালি যে মুসলমানি বাংলার কথা বলে আসছিলেন তার সজীব রূপটা এখন যেন আরও জোরদার। এই গ্রন্থে তিনি বলেছেন, 'শহরে মুসলমানদের বাংলা শিখতে হবে। পল্লীবাসীর নয়, কেননা বাংলা তাদের মাতৃভাষা।' এ সব কথা বলার অর্থ ওয়াজেদ আলী এই সমস্যা সমাধানের পথগুলি হাত জেনেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন বাংলাদেশ ভারতের অংশ থাক কিন্তু ভারতবর্ষের রাষ্ট্রকাঠামো হোক যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক। বাঙালির স্বাতন্ত্র্য তাতে অটুট থাকবে। কী আশ্চর্য দেশবিভাগের প্রাক্কালে সুরাবর্দি, শরৎ বসু এঁরাও এই রকম ভেবেছিলেন। কিন্তু তাঁরা চেয়েছিলেন বাংলাদেশ



হবে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। সেটা হয়নি, কিন্তু আজ বাংলাদেশ সত্যিই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এখন বাংলাদেশের (উভয় রাষ্ট্রের) দায়িত্ব হচ্ছে সেই প্রাচীনতন্ত্রীদের ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেওয়া। আর 'ক্ষুধার জোরে সুধার জগৎ জয়' করতে হবে। নজরুল ইসলামের কথা আলী সাহেব বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র এমনকী রবীন্দ্রনাথের চিন্তাও তিনি গ্রাহ্য করেননি। রবীন্দ্রনাথের আজীবনের সাধনাকে সম্ভবত আলী সাহেব তলিয়ে দেখেননি। তিনি ইসলামের আদর্শের মধ্যেই হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ক্ষেত্রটিকে সন্ধান করেছেন।

এস ওয়াজেদ আলী বুদ্ধিচর্চার কথা বারবার বলেছেন। মননই মানুষের সংস্কারকে বিচার করতে পারে।আসলে সবুজপত্র তো বার করা হয়েছিল এই জ্ঞানচর্চার জন্যই। 'সাধনা' পত্রিকার জন্মও এই রকমই। শশধর তর্কচূড়ামণি, বঙ্গবাসীর দল, চন্দ্রনাথ বসু ইত্যাদির গোঁড়া মনোভাবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল 'সাধনা'। বঙ্গভঙ্গের নিষ্ফলতা (অন্তত রবীন্দ্রনাথ তাই মনে করেছিলেন) দেশকে আর একবার অন্ধভক্তির পথে নিয়ে যাচ্ছিল সেই সময়ে বের হল 'সবুজপত্র'। এস. ওয়াজেদ আলীও মুসলমান সমাজের ধর্মান্ধতাকে আঘাত করেছেন। তিনি ইসলামের ইতিহাসকে স্মরণ করেছেন। আরবের জাগরণের সময়ে গ্রিক দর্শন ও মনন প্রায় ভুলে যেতে বসেছিল সেখানকার মানুষ। কিন্তু মোতাজেলা সম্প্রদায় এই মনন ও দর্শনকে অবলম্বন করে বৌদ্ধিক জগতে এক বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিল। আলী সাহেব বলেছেন এঁরা ছিলেন জ্ঞানতাপস। কিন্তু রক্ষণশীলরা এঁদের শ্রদ্ধা করত না। রক্ষণশীলরাই জয়ী হয়েছিল। বলা বাহুল্য ওয়াজেদ সাহেব মোতাজেলাদেরই অনুকূলে রায় দিয়েছিলেন। ইসলামের আর একটি ধারা ইরানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁরা হচ্ছেন সুফি। ওয়াজেদ সাহেব এই মরমিয়া সাধকদের পরিচয় দিয়ে ভারতে তাঁদের আগমন এবং সুফি মতবাদের প্রচারের কথা বলেছেন। এই সুফি ধর্মের অনুরাগী ছিলেন সম্রাট আকবর। সুফিদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন সম্রাট। আমৃত্যু আকবর সুফি সাধকদের মতবাদের সঙ্গে নিজেকে সামিল করে নিয়েছিলেন। ওয়াজেদ সাহেব তাঁর 'প্রেমের ধর্ম' প্রবন্ধে খাজা মইনুদ্দিন চিশতি, নিজাম উদ্দীন আউলিয়া, শাহ সুফি-সুলতান, শাহ জালালের কথা বলেছেন। আমির খসরু, উরফি, ফায়জি, আবুল ফজল, কবির, সারমুদ প্রমুখ ব্যক্তি সুফি মত প্রচার করেছেন।

জালালুদ্দীন রুমির রচনা উদ্ধার করে প্রেমের আদর্শের কথা ওয়াজেদ সাহেব বলেছেন। পাণ্ডুয়ায় শাহ সুফি সুলতানের মাজারের সামনে দাঁড়িয়ে আলী সাহেব শুনলেন, খাদেম বা সেবাইত বলছে, 'মুসলমানের যিনি খোদা তিনিই হিন্দুর ভগবান'। তাঁরই উদ্দেশ্যে নামাজের ডাক আর শঙ্খের হাঁক। সর্বশাস্ত্র তাঁরই মহিমা-কীর্তন করে; সেই প্রেমের ঠাকুরকে যিনি জেনেছেন বা চিনেছেন তার ভেদবুদ্ধি থাকতে পারে না।' এই শুনে ওয়াজেদ সাহেব অভিভূত। 'আমরা বাঙালী যদি এই প্রেমের ধর্মে অভিষিক্ত হতে পারতাম তাহলে সৌহার্দ্যে, প্রেমে, আত্মার আত্মীয়তায় এ দেশে কি শ্রেয়ঃ, শান্তি কল্যাণই না বিরাজ করত।' আলী সাহেব বলেছেন, 'ধর্মান্ধ লোকের প্রচারেনা না থাকলে, বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মিলন খুবই সহজ ছিল এবং এখনও আছে, আর ভাবীকালেও থাকবে।' আশাবাদী উদার মানবপ্রেমিক ওয়াজেদ সাহেব এই কথা বলেছেন যখন হিন্দু-মুসলমানের বিরোধটা নগ্নভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল। তখন সওগাত পত্রিকা ওয়াজেদ সাহেবকে অভিনন্দন জানিয়েছিল এই মতবাদের জন্য (১৩৫১, অগ্রহায়ণ)।

ওয়াজেদ সাহেব হিন্দু-মুসলমান সমস্যাটি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেছেন। অনুন্নত মুসলমানদের শিক্ষা চাই, আর্থিক সঙ্গতি চাই, মনের প্রসার চাই। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন একজন বাঙালি হিন্দু মারাঠা হিন্দু বীরকে যত নিকটের ভাবে বাঙালি মুসলমানকে ততটাই দূরের ভাবে আর একজন মুসলমান একজন কাফ্রি মুসলমানকে যতটা নিকটের ভাবে একজন বাঙালি হিন্দুকে ততটাই দূরের ভাবে। এই অবস্থায় মিলনের পথ সুদূরপরাহত। বোধ করি কাজী নজরুল এর সমাধান দিয়েছিলেন। নজরুল ইসলামের মতামত এতই সুপরিচিত যে এখানে তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মিশ্র সংস্কৃতির সজীব উদাহরণ নজরুল। ওদুদ, ওয়াজেদ আলী এই মিশ্র সংস্কৃতিকেই চেয়েছিলেন। এঁরা মুসলমান সংস্কৃতিকেও শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন আবার হিন্দু জাগরণকেও তারিফ করেছেন। যদিও ওয়াজেদ সাহেব মুসলমান সংস্কৃতির প্রসঙ্গই তাঁর লেখায় বারবার টেনে এনেছেন। এতে লাভই হয়েছে। সংস্কৃতির বিনিময়ের পথটি সুগমই হয়েছে। ওয়াজেদ সাহেব মসজিদের সামনে বাজনার প্রসঙ্গ তুলেছেন। গরু জবাইর প্রসঙ্গও বাদ দেননি। কিন্তু এই দুইকেই তিনি ভেদবুদ্ধির প্ররোচনামূলক বলে নিন্দা করেছেন। কলকাতায় যখন এই ঘৃণ্য দাঙ্গা বাধত তখন সচেতন, যুক্তিপ্রবণ হিন্দুমুসলমান একে নির্বোধের কাজ বলেছেন। শিক্ষিত ভেদবুদ্ধিরহিত হিন্দু মুসলমান পুরোহিততন্ত্র এবং উলেমা মোল্লাতন্ত্রকে অকপটে বিধবস্ত করতে চেয়েছেন। এখানেই আলী সাহেবের অবদান।

ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শের ধারা সম্পর্কে ওয়াজেদ সাহেবের বিখ্যাত উক্তি "সেইট্রাডিশন সমানে চলেছে"র সঙ্গে অধিকাংশ বঙ্গবাসী নিশ্চয় পরিচিত। কিন্তু আমরা ক'জনে, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায় তার এই জাতীয় আরও অসংখ্য লেখার সঙ্গে পরিচিত? ওয়াজেদ সাহেব গল্প, মহাপুরুষের জীবনী, মরমিয়া সাধকদের জীবনী রচনা করেছেন। বলতে দ্বিধা নেই সেই সব রচনার সঙ্গে পরিচিত হলে ওয়াজেদের আর একটা রূপ আমাদের সামনে ভেসে উঠবে। ওয়াজেদ সাহেব এইসব

রচনায় শিল্পী। জীবনের শিল্পরূপকে তিনি মূর্ত করেছেন তাঁর ব্যক্তিগত নিবন্ধপ্রবন্ধে, রচনায় ।ভাষা ও সাহিত্যের ওপর তাঁর কেবল প্রীতিপক্ষপাতই ছিল না। সাহিত্যের প্রতি দাবি ছিল অনেকখানি। তিনি জানতেন সাহিত্যই মানুষের চিৎপ্রকর্ষ ঘটায়, সাহিত্যই মানুষকে সৌন্দর্যে দীক্ষা দেয়। সাহিত্যই মানুষের রুচিকে সৌন্দর্য-মণ্ডিত করে।

তিনি হাফেজের ওমর খৈয়ামের সঙ্গে একাত্ম বোধ করেন। হাফেজ চেয়েছিলেন একটি পাত্রপূর্ণ মদ, শাকি আর নারী। প্রেম মানুষের জীবনে কেবল কিংকর্তব্য তাই জানায় না নীলাকাশের চন্দ্রাতপে এক আনন্দের ছায়াঘন মায়াবি জগৎকে উদ্‌ঘাটিত করে। ঈশ্বরভজনা ভুলে গিয়ে হাফেজ যে এই সর্বনাশা প্রেমের সৌন্দর্যের অসীমকে সীমার সঙ্গে বাঁধতে চেয়েছেন তার জন্য সব কলঙ্ক গ্রহণ করতে নতজানু এই প্রেমিক। শিল্পের জন্ম তো এইখানে। এবারে ওয়াজেদ সাহেবের শিল্পী মহাশিল্পী থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধার করি। শিল্পীর প্রশ্ন মহাশিল্পীকে, 'আপনার শিল্পীর রচনায় কি প্রয়োজন? আপনি তো প্রয়োজনের ঊর্দ্ধে। মহাশিল্পী বললেন, কে বললে আমি প্রয়োজনের ঊর্দ্ধে? সমস্ত সৃষ্টিই তো আমার প্রয়োজনের অকাট্য প্রমাণ! শিল্পীর কল্পনা দিয়েই আমি রূপের ধ্যান করি;শিল্পীর কামনা দিয়েই আমি রূপের সাধনা করি, আর শিল্পীর তুলি দিয়েই আমি রূপের ছবি আঁকি।' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন জীবন মহাশিল্পী। এই মহাশিল্পীর ভাবনা আর শিল্পীর ভাবনা একবিন্দুতে মিলে যায়। মিশে যায়। জীবনের শিল্প প্রবন্ধে বার্কের কথায় তিনি বলেছেন, 'শিল্পীর সৃষ্টির উদ্দেশ্য কেবল সৌন্দর্যের সৃষ্টি নয়, সুন্দর এবং sublime উভয়ের সৃষ্টিই তার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।'

এস ওয়াজেদ জীবনকে সুন্দর বলেছেন—সে জন্য বাস্তবের কুরুচি এবং কুৎসিতকে তিনি তিরস্কার করেছেন। তিনি পোশাকে আশাকে, চলাফেরায় আচারআচরণে মানুষকে সুন্দর হতে বলেছেন। গুলবাগিচার সৌন্দর্য নজরুলকে টেনেছিল। নজরুল আত্মহারা হয়েছিলেন প্রকৃতি প্রেমে। এস ওয়াজেদের গুল দাস্তা, জীবনের শিল্প প্রবন্ধগ্রন্থে এই আত্মহারা কবির প্রকাশ দেখতে পাই। 'বাগান' নামে একটি প্রবন্ধে গোলাপ এবং সুগন্ধী ফুলের কথা বলেছেন। এ ফুল আরবের। তারাই এনেছিলেন এ ফুল ভারতবর্ষে। মোগল বাদশারা এ ফুলের চর্চা করেছেন সকলেই।

একরাম বা ইকবাল নিয়ে ছোট প্রবন্ধ ও বড় বই রচনা করেছিলেন এস ওয়াজেদ। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করে ইকবালকে বলেছেন দার্শনিক কবি আর রবীন্দ্রনাথকে কবি দার্শনিক। ইকবাল জার্মান ভাষায় সুপণ্ডিত, তিনি নিৎশের দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। নিৎশে চেয়েছিলেন অতিমানবের (Super man) প্রতিষ্ঠা। এস ওয়াজেদ দেখিয়েছেন কোরানেই এই অতিমানবের কথা আছে। এস ওয়াজেদ বুঝেছিলেন ইকবালের অনুভূতিই তাঁকে যথার্থ সন্ধান দিতে পেরেছি ক্ষমতা, অতিমানবের পথের শেষ কোথায়। মনন এবং অনুভূতি ইকবালকে দিয়েছিল এক স্বচ্ছ ভিশনারি-দ্রষ্টার মর্যাদা। ইকবালকে নিয়ে লেখা আলী সাহেবের 'ইকবালের পায়গাম' (১৩৪০) এ একের পর এক উদ্ধৃতি দিয়ে এই কবির তথা যথার্থ একনিষ্ঠ মানুষটির পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করেছেন। আমরা ওই গ্রন্থ থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

> চোখ চেয়ে একবার দেখ, দেখবার মত চোখ যদি তোর থাকে, জীবনীশক্তি নূতন এক বিশ্বসৃষ্টির কাজে রত আছে। পুরাতন এই মৃত্তিকা স্তূপের মধ্যে নূতন জীবনের বীজ আমি দেখতে পাচ্ছি। প্রত্যেক যে দানা (বীজ)টি এখনও মাটির জঠরে লুকিয়ে আছে, তার শাখা-প্রশাখা ফল-ফুল আমি দেখতে পাচ্ছি তার পরিপূর্ণ জীবন আমার চোখে দেখা দিচ্ছে। পর্বতকে আমি এক খণ্ড ঘাসের মত উড়তে দেখতে পাচ্ছি, তৃণখণ্ডকে আমি পর্বতের গাম্ভীর্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখতে পাচ্ছি।

অথবা,

> জীবন গতিশীল স্রোতস্বিনীর মত, আর চিরকাল গতিশীলই থাকবে। এই পুরাতন শরাব সদাই নূতন উত্তেজনায় ভরপুর আর সদাই তাই থাকবে। যা আছে, অথচ যার থাকা উচিত নয়, তাকে যেতেই হবে। যা নাই অথচ যার থাকা উচিত, তাকে আসতেই হবে।

অথবা,

> আমার গান আজমে (আরবের বাইরের দেশগুলিকে আজম বলা হয়) তার পুরাতন অগ্নিশিখাকে প্রজ্বলিত করেছে;আরবভূমি কিন্তু এখনও আমার অন্তরের জ্বালার সঙ্গে অপরিচিত (অর্থাৎ অমুসলিম আমার গান থেকে প্রেরণা লাভ করে কিন্তু মুসলিম আমার গানের মর্ম এখনও বুঝে নি)।

এই সবের জন্যই এস ওয়াজেদ আলী ইকবালকে গ্যেটের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ইকবালকে মহাকবি আখ্যা দিয়েছেন। ইকবালের বাণী চয়ন করতে আলি সাহেব ক্লান্তি বোধ করেননি। মানুষের ইচ্ছাশক্তি মানুষের কামনাকে ইকবাল কখনও ঢাকা দিতে চাননি। রবীন্দ্রনাথের মতোই বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি চাননি। বৈরাগ্যকে ইকবাল ভীরুতার লক্ষণ বলেছেন। ইকবাল বলেছেন, আল্লা এই সৃষ্টির জগতে মানুষকে পাঠাচ্ছেন মানুষের সমাক হৃদয়বৃত্তির পরিস্ফুটনের জন্য এবং মানুষ শক্তিতে, সাহসে, বীর্যে সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করবে। মানুষকে মৃত্যুভয় জয় করতে



হবে। ওয়াজেদ আলী সাহেব দরদ দিয়ে ইকবালের বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন তোঘলক একজন হিন্দুকে বর্শার আঘাতে মেরে ফেললেন। তখন কাজির কাছে বিচারের জন্য তোঘলক এলেন। হয় মৃত্যব্যক্তির আত্মীয়ের হাতে মৃত্যুবরণ নচেৎ মৃতের আত্মীয়রা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পেয়ে যদি সুলতানকে ক্ষমা করেন তবেই সুলতান মুক্তি পাবেন। এই বিচারই ইসলামের আদর্শ। ইকবাল একে মেনে নিয়েছিলেন।

এবারে বাংলাদেশের মুসলমানদের জাগরণের দিকে লক্ষ করে আমরা ওয়াজেদ আলীর মূল্যবান মন্তব্য উদ্ধার করি। এই ক্ষেত্রে তিনি ইকবালের উক্তি স্মরণ করেছেন :

"যে মহাকবির কাব্যে এবং গানে বিংশ শতাব্দীর প্রাচ্য জগতে নবজাগরণের প্রচেষ্টা মূর্ত হয়ে দেখা দিয়েছে;আর সেই জাগরণের অন্তর্নিহিত রূহানী (আধ্যাত্মিক) শক্তি ও প্রেরণাকে অপূর্ব ভঙ্গিমায় সাহিত্যে ব্যক্ত করেছেন; আর সেই শক্তির দাবীকে যিনি প্রাচীনকালের একজন পায়গাম্বরের মতই বজ্র-নির্ঘোষে বিশ্বময় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে তুলেছেন— সেই যুগপ্রবর্তক মহামানবের পায়গামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করা আমাদের ব্যক্তিগত এবং জাতীয় কল্যাণের জন্য একান্তই প্রয়োজন"। প্রায় একই ভাষায় সত্যসন্ধানী উদার মানবপ্রেমিক "আকবরের রাষ্ট্রসাধনা" (১৯৪৯) গ্রন্থে লিখেছেন, "যিনি রাষ্ট্রের নায়ক তিনি সকলের আপনজন। প্রত্যেক ধর্মকে তিনি গ্রহণ করেন, প্রত্যেকের ধর্মকে তিনি ভালবাসেন। প্রত্যেকের দুঃখের সঙ্গে তিনি সমবেদনা অনুভব করেন, প্রত্যেকের আনন্দে তিনি যোগ দেন। সকলের যিনি ভগবান—তারই তিনি ভক্ত, সকলের যে ধর্ম—তারই সাধক এবং প্রতিভূ।" হিন্দুমুসলমানের যুক্ত সাধনার এর চেয়ে বড় আদর্শ আর কী হতে পারে?

# মেঘ

## বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

তোমাকে মেঘের শরীর থেকে কি করে আলাদা করি বলো।
চুল থেকে,
চোখ থেকে,
বুক থেকে,
শুধু মেঘ আর মেঘ
কোথায় চলেছে উড়ে?
সামনের জন্মের দিকে, নাকি অনেক পেছনে, যেখানে
মেঘের আঙুল দিয়ে তোমার মেঘের কান্না আমি মুছিয়ে দিতাম
রোজ রাতে?
তোমার মেঘের ঘর উড়ে গেছে কবে, আমার মেঘের ঘর
কখনও কি ছিল?
কেন তবু ঘর দিয়ে বাঁধা, কেন মেঘ দিয়ে বেঁধে রাখা নয়?

# লগ্নতা

## আনন্দ ঘোষ হাজরা

তোমার সঙ্গে তেমনি আমি লগ্ন থাকব
যেমন থাকে জলের সঙ্গে জলের অণু
হাওয়ায় যেমন মিশছে হাওয়া দিগ্‌বিদিকে
রোদের সঙ্গে লিপ্ত হচ্ছে রোদের রেখা
তেমনি করেই তোমার সঙ্গে লগ্ন থাকব
যেমন থাকে বালির সঙ্গে বালির কণা।

তোমার ব্যাপ্ত সমগ্রতায় মগ্ন থাকব ভেবেছিলাম
কিন্তু এত ধ্বংসপ্রবণ জটিলতায়
সব কিছুকে গ্রাস করবার উন্মাদনা
আর কিছু নয়; তোমার এমন সর্বনাশা সর্বহরা
রূপের নদীর জলের ঢেউয়ে সব হারানো
কেমন করে ঘটাই বলো? আমার আমির চূড়ান্তকে
কেমন করে মেশাই বলো?
তোমার সঙ্গে লগ্ন থাকব ভেবেইছিলাম
যেমন করে লগ্ন থাকে জলের সঙ্গে জলের অণু।

কিন্তু নিজের ধ্বংসে কে চায় বলতে পারো?

# অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত

## পরিমল চক্রবর্তী

যতই বয়স বাড়ে অভিজ্ঞতা তত বেড়ে যায়।
অভিজ্ঞতা যেন এক বয়সিনী নারীর মতন
আমাকে নির্মাণ করে তিলে-তিলে স্নেহ ও ক্ষমায়।
জীবনের পথে-পথে ঘুরে-ঘুরে অরূপরতন
যা-কিছু পেয়েছি খুঁজে, অভিজ্ঞতা-পরিশুদ্ধ সব;
সুখ বলো, দুঃখ বলো কিংবা সুখ-দুঃখের নির্যাস
যা কিছু করেছি জমা গর্ভবতী স্মৃতির কৌটায়,
যে-কটি স্বপ্নের বীজ বৃক্ষ হয়ে সুখের বৈভব
জীবনে ঘনিষ্ঠ করে, আমাকে বাঁচায় বারোমাস—
প্রচণ্ড ক্ষুধায় তারা অবগাঢ় অভিজ্ঞতা চায়।

যতই বয়স বাড়ে অভিজ্ঞতা তত দীপ্ত হয়।
হতে-হতে অবশেষে জ্বলে ওঠে, ঠিক যেন মণি
জীবন-সর্পের শিরে, অপরূপ আভায় অক্ষয়।

অভিজ্ঞতা জীবনের সারাৎসার, হিরণ্ময় খনি।।

# তুমি কি শুধুই মুসলমান? শুধুই হিন্দু?

## অজিত বাইরী

তুমি কি শুধুই মুসলমান?
মানুষ নও।
তুমি কি শুধুই হিন্দু?
মানুষ নও।

হানাহানি করে কেড়ে নাও
একে অপরের প্রাণ;
যেন বৃন্তের ফুল
ছিঁড়ে নাও অবলীলাক্রমে।

অস্ত্রের আঘাতে যে রক্ত
গড়িয়ে পড়ে মানচিত্রে,
হিন্দু মুসলমান ভেদে
তার বর্ণ কি ভিন্ন ভিন্ন?

ক্ষুধার আর শোকের উপলব্ধি
কি দু'রকম দুজনের ক্ষেত্রে?
মার কোলে শিশুর স্তন্যদানের দৃশ্য
দু'জনের চোখে নয় অভিন্ন?

প্রাণ-পাখি উড়ে গেলে পর
প'ড়ে থাকে যে দেহ
তা কি নয় একইরকম পচনশীল?
গোরে যাও কিংবা শ্মশানে
মুছে যায় পূর্ব-পরিচয়।

ধূমকেতুর মতো জেগে থাকে
একটিই প্রশ্ন :
তুমি কি শুধুই মুসলমান,
তুমি কি শুধুই হিন্দু,
মানুষ নও?

# শুধুমাত্র

## দেবাঞ্জন চক্রবর্তী

এ কেমন মন নিভে এল  তুমি এলে রাস্তার ধারে
পথকে পিছনে স্থির রেখে  হেঁটে যাও বীজধান মাঠ
ক্রমশই আলো নিভে আসে  অন্ধকার দ্রুত জেগে ওঠে
তোমার দৃষ্টি কমে যায়  সাহসী দু'চোখ জ্বালা করে

পথের পাশেই জলকাদা  সেই মাটি গভীর সবুজ
ক'দিন সে থাকে পৃথিবীতে  আয়ুমাত্র দুই তিন মাস
জল মাঠে তাকে দেখা যায়  শব্দহীন তার কলরব
শূন্য কোনও ধর্ম নয় তার  শুধু মাত্র পূর্ণ হয়ে ওঠা

# স্রোতে, সন্তরণে

## রঞ্জনা দত্ত

সে এখন রোদবিহনে
ছুটে যায় পুকুরপাড়ে,
যেখানে দীঘল ছায়া
ফেলে যায় বৃক্ষশাখা।
মাছেরা ছলাৎছল
ঘাই দেয় সঙ্গোপনে
করে মন কার উচাটন।
করে মন কার উচাটন?

কখনও হরিণশাবক
অতি ধীর, তৃষ্ণা-আতুর
ইতিউতি দৃষ্টিপাতে
আসে জল খেতেও বা যে
ভীরু মন উথাল পাথাল
বাঘেরা নিকট না কি
ঘন ওই দূর সবুজে!
কাছে কি বধ্যভূমি?

একী এ কী অনাচার!
তবে কি অন্য কোথাও
অতি দূর দ্বীপান্তরে
যাওয়া আর আসাই কেবল—

ছেড়ে এই শস্যভূমি,
জলাশয়, ছোট্ট বাড়ি—
পাতা দই সখ্যটিও।

কী জানে রাখালছেলে
কী জানে লতায়-পাতায়
মেয়েটির চোখের কোণে
কত প্রেম প্রত্ন-অতীত
কত ছবি স্বপ্ন-আশায়
কত ভুল কী কুয়াশায়
পাতে জাল দৃষ্টি-অতীত!

তাই সে স্রোতের টানে
ভেসে যায় অকূল পাথার
যেন কোন পাহাড়ঝোরা—
যেন কোন গহীনবনে—
কোনও এক মরুর দেশে
ভাসে আর ভাসায় কেবল
বহতা নদীর মতো—

সে এখন নদীর শরীর
সে এখন নদীর শরীর।

# রাত্রির কোলাজ

## জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সারিবদ্ধ আলোবিন্দু : দোকানঘরের
আচ্ছাদনে বাঁক নিচ্ছে অন্ধকার, সামাজিক ভুল
ওভারব্রিজের গাঢ় আবছায়া খুঁজে নিয়ে
মোহগ্রস্ত ঘ্রাণগুলো ধীরে উন্মোচিত
যুবকের ধৈর্যহীন চকিত আঙুলে....

শব্দের ভেতরে দীর্ঘ ক্লান্তি জমে থাকে
পার হয় গম্ভীর ইঞ্জিন, তার অবসন্ন হুইসিল, ছায়া
ওভারহেডের তার ছিঁড়ে গিয়ে চলাচল বন্ধ ছিল যেন
এতক্ষণ, এইমাত্র আবার জেগেছে স্থির ধাতব লাইন
পিছল কান্নার মতো সেখানে নেমেছে আজ
সাংকেতিক আলো
আমাদের দুঃখগুলো কোনও একদিন
নিটোল চাঁদের মতো হবে?

তুমি বলছ পৃথিবীটা তো ছোট্ট হয়ে এল
হাতের মুঠোতে, বসবার ঘরের জানালা দিয়ে ঢুকে
কখন যে একেবারে পাশটিতে এসে বসে আছে!
আমি ভাবতুম তুমি বুঝি ছেলেবেলার কথা বলছ
তখন তো রামধনুর রং এসে মিলে যেত এমনিভাবে
ঝটোপুটি সাঁতারকাটা পুকুরের জলে

# ধর্ম কি ওদেরও ধরে রাখে

## মেঘ মুখোপাধ্যায়

*কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাব: পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতা।* — শ্রীমদ্‌ভগবদগীতা

ধর্মনদী বেয়ে কারা পাল তুলে প্রচণ্ড উল্লাসে
গুরু গুরু রবে ধেয়ে আসে
হাতে হাতে শূল ভল্ল খড়্গ কৃপাণ
বিলোল মশাল
হাতে হাতে মৃত্যুগোলা নিয়ে লোফালুফি
চোখে নরকের জ্বালা, রোমে রোমে লকলকে রোষ
জিভ বেয়ে পাগলাকুত্তার মতো ঝরে বিষরস
নদীর দু'পাড় কাঁপে ত্রাসে

পল্লিতে বস্তিতে নেমে রে রে শব্দে ধেয়ে যায় কাতারে কাতারে
ধর্মপাণ্ডা ছেয়ে ফেলে ধর্মক্ষেত্র, ধর্মধ্বজা শিরে
আগুনের গোলা ছোঁড়ে বিধর্মীর বিপণি কুটিরে
তালগোল পাকিয়ে মারে শিশুদেহ, বুড়ো হাড় ফাটে
ধর্ম মৃত্যু হানে
ধর্ম ধ্বংস হানে
বিধর্মী নারীকে ধর্ষে পরিতৃপ্ত কামে
ধর্ম জিভ চেটে নেয়, মুখ মুছে হাই তোলে দ্বিগুণ আরামে
ধর্ম উল্লোল মাতে এ ভোগের অন্যতর স্বাদে

ধর্মনদী বেয়ে যারা পাল তুলে মশাল জ্বালিয়ে
'মার' 'মার' রবে বাতাস কাঁপিয়ে ধেয়ে আসে
ধ্বংসের বীভৎস রসে কদাকার মুখগুলি ঝুলে থাকে
নরকের দিকে
পৃথিবী তাদের সহ্য করে! আজও পৃথিবী ওদের পেটে ধরে!
ধর্ম কি ওদেরও কোলেপিঠে পালে, ধরে রাখে?

যা দেখি গুজরাটে
মহল্লায় মহল্লায় প্রকাশ্য রাস্তায় তল্লাটে
এ ধর্ম কি দেখা যায় চোখে
এ ধর্ম কি রাখা যায় বুকে?
এ ধর্ম তোমাকে কেন এ ধর্ম আমাকে
কেন ঘোর শোকে ম্রিয়মাণ করে—
অমাবস্যা নিশি আনে শরতের ভোরে

ধারাবাহিক সন্দর্ভ

# প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবন

## শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

*[পূর্ব প্রকাশিতের পর]*

বৎসর ত্রিশ পূর্বে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশানের রিফাইনারি বিভাগের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, "দেখুন, পরিবেশ সম্বলিত সব কথাবার্তা বিলকুল অসার।" উত্তরে আমি বলেছিলাম, "যতই আমরা উড়তে চাই না কেন, মানুষের economics কে প্রকৃতির economyর বশে থাকতেই হবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা লঙ্ঘন করে কোনও শিল্প বা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। এই যে বিপুল ব্যয়ে রিফাইনারি গড়ছেন, তা-ও একদিন মানুষের ভুলের মাশুল দিতে প্লাবনের প্রকোপে অকেজো হয়ে যেতে পারে।" তখন বুঝিনি যে আমার অভিশপ্ত মুখের কথা অতি শীঘ্র ফলে যাবে। অল্প কিছুদিন পরে বিহারে গভীরতা-হারা গঙ্গায় প্লাবন এল, বারৌনি রিফাইনারির অনেকগুলি নির্মীয়মান অংশ জলমগ্ন হল, তেলের পুরু স্তরে গঙ্গার বিস্তৃত অংশ দূষিত হল। সকলকে মানতেই হল নদী যদি গভীরতা হারায়, তার অববাহিকায় যদি ভূমিক্ষয় হতে থাকে, তা হলে শিল্পপ্রতিষ্ঠান-ও চলতে পারে না।

মুম্বাই-বাসী আমার এক অতি প্রিয় বাঙালি বন্ধু গত দশ বৎসর ধরে প্রচণ্ড প্রত্যয় ও আবেগ নিয়ে তর্ক করে আসছেন যে পরিবেশকেন্দ্রিক অনুধ্যান দেশের উন্নতির পরিপন্থী। মনে হয় মুম্বাই-এর গরিব মানুষের সম্পর্করহিত কিছু পরিবেশবিলাসীর কার্যকলাপ দেখে তাঁর এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটেছে। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস, যাঁরা GDP র (Gross Domestic Product) মাপকাঠিতে বিকাশের পরিমাপ করেন, যাঁরা সাধারণ মানুষের মধ্যে ঘুরে, খেতমজুর বা ভূমিহীন কৃষকের আঙ্গিনায় বসে এদের ভবিষ্যৎ অর্থাৎ দেশের বৃহত্তর অংশের ভবিষ্যৎ কোন দিকে চলেছে সে বিষয়ে গভীর চিন্তা করার সুযোগ বা সময় পাননি, যাঁরা উচ্চবর্গীয়দের শ্রীবৃদ্ধিভিত্তিক জাতীয় বিকাশধারা ও অন্ত্যোদায়ী বিকাশধারার মধ্যে যে কী দুস্তর প্রভেদ আছে, তা উপলব্ধি করার চেষ্টা না করেছেন, তাঁদের কাছে বর্তমান পৃথিবীতে শক্তিশালী পশ্চিমি অর্থনীতিক মডেল ও প্রযুক্তিধারা বেশি আকর্ষণীয় হয়। তাঁদের কাছে নদীর বুকে বড় বড় বাঁধ, বৃহৎ শিল্প ও তাদের চালু রাখার জন্য দেশ জুড়ে বিরাট thermal power plant, nuclear power plant, express highways, sea port ও airport -এর প্রাচুর্য দেশের শক্তি ও উন্নতির পরিচায়ক।

গত ত্রিশ বৎসর ধরে আমি একটা concept চালু করার চেষ্টা করে আসছি। "যেমন GDP দেখছ, তেমন GDBR (Gross Destruction of Basic Resources) এর পরিমাপ কর, তবেই বোঝা যাবে দেশ মূলত বিকাশের পথে — কিংবা বিনাশের পথে এগুচ্ছে।" এই ধ্যানধারণা উচ্চবর্গীদের চেতনান্তরে এতদিন সাড়া জাগাতে পারেনি। মনে হয়, আজ তার দিন এসেছে। তা ছাড়া, প্রকৃতি-পরাজয়-অভিলাষী প্রযুক্তিবিদ্যা যে একাধারে আত্মঘাতী ও সমগ্রদর্শী বিজ্ঞানের (holistic science) পরিপন্থী, সে বিষয়ে অনেকের টনক নড়েছে। Fragmented science যে প্রকৃতপক্ষে অ-বিজ্ঞান, সেই সত্যের স্বীকৃতি ক্রমশ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে। নিম্নের এক একটি আলোচনা হবে তার প্রমাণ।

### কেন তেহরিবাঁধে ধ্বংস লীলার সম্ভাবনা

গত সংখ্যায় প্রবন্ধ শেষ করেছিলাম তেহরি বাঁধের যে কী ভয়ঙ্কর পরিণতি হতে পারে, তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে। সর্বনাশা পরিণতি সম্বন্ধে এ হেন সাবধানবাণীর কারণ আরও একটু



পরিষ্কার করে বলা দরকার। যে Plate movement এর উল্লেখ করা হয়েছে, তা হচ্ছে tectonic plate. ভূগর্ভে কঠিন আবরণে আবৃত চলমান ভূত্বক (crust) বিভিন্ন plate এ বিভক্ত। ভারতের অবস্থান Indo-Australian plate এর উত্তর পশ্চিমাংশে। সমগ্র অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ, ভারত মহাসাগরের বৃহৎ অংশ, ভারত ও কয়েকটি ছোট ছোট দেশ এই plate -এর অন্তর্ভুক্ত। এই চলমান plate বৃহতর Eurasian plate এর সঙ্গে সতত সংঘর্ষের ফলে পরোক্ত plate -এর তলদেশে প্রক্ষিপ্ত হচ্ছে। একের মহাকর্ষণ ও অন্যের সজোর অন্তর্প্রবেশের এই ক্রিয়া যেখানে চলে, ভূতত্ত্ববিদের ভাষায় তাকে বলে subduction zone. এই এলাকায় অন্তর্প্রবেশী plate এর উপরিস্থ ভূমিস্তর প্রতিনিয়ত উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। হিমালয় পর্বতের উৎপত্তি এবং তার ক্রমাগত উচ্চতাবৃদ্ধি এই উৎক্ষেপণের ফল। উথল-পাথলের ক্রিয়াশীল এই অঞ্চল যে ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্পের জন্মভূমি হবে সেটা প্রায় অবধারিত। সকলেই জানে, সাধারণ যে কোনও জায়গাতেই বিরাট জলস্তম্ভের সৃষ্টি করলে তা ভূপৃষ্ঠের উপর চাপ দেয়, যার ফলে ভূমিকম্প ঘটে যেতে পারে। সে প্রেক্ষিতে এ হেন ভূ-কম্পন-প্রবণ অঞ্চলে নদীর রূপান্তর ঘটিয়ে সুগভীর ও সুবিশাল জলস্তম্ভ সৃষ্টি করার পিছনে যে কী পরিমাণ দায়িত্বহীনতার মানসিকতা কাজ করছে, তা ভাবতে গেলে বাক-হারা হয়ে যেতে হয়।

সরকারের তরফ থেকে দুইটি সাফাই আছে, যদিও তা সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত নয়। একটি হচ্ছে, এই বাঁধের ফলে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে, যা শিল্পচালনায় ও নগরবাসীদের কাজে লাগবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এই জলাধার দিল্লি নগরীর জলসরবরাহে নিশ্চয়তা এনে দেবে। দুই সাফাই-ই যুক্তির বিচারে অগ্রাহ্য। প্রথম সাফাইটির সঙ্গে জড়িত কতকগুলি প্রশ্ন : কোন বা কী ধরনের শিল্পে ও কোন scale এর শিল্পে উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন? তাদের কি high-concentration energy বিপুলভাবে প্রয়োজন? বিকল্প পদ্ধতিতে যথা run-of the way technique এ তৈরি বিদ্যুৎ কি তাদের প্রয়োজন মেটাতে পারে না? যে সব শিল্প গড়ে উঠবে তাদের emission ও effluents সম্পর্কে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যাতে জল বা বায়ুদূষণ বাড়বে না বা মূল নদীই sewer -এ পরিণত হতে পারবে না? নদী sewer এ রূপান্তরিত হওয়ার প্রসঙ্গ কোনও কষ্টকল্পিত প্রশ্ন নয়, বাস্তবে সব নদীগুলিই কমবেশি sewer হতে চলেছে। বিকাশের নামে যে ধরনের শিল্পায়ন ও শহরায়ন চলছে, তাতে নদীসমূহের মৃত্যু অবধারিত।

নগর ও শহরের জল সরবরাহের জন্য বৃহৎ জলাধারের পরিকল্পনার কোনও প্রয়োজন নেই। বৃষ্টির জল ধরে রাখার (water harvesting) যে পদ্ধতি আছে, সে পদ্ধতিতে শহর ও নগরবাসীরা-ও একটু চেষ্টা করলেই এমন ব্যবস্থা করে নিতে পারে যে মন্দাবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির বৎসরগুলিতে-ও তাদের প্রয়োজন মিটে যেতে পারে। গত বৎসর দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবন সে পথ দেখিয়েছে। দিল্লির Centre for Science and Environment এর (CSE) উদ্যোগে বেশ কয়েকটি housing societies ভূগর্ভে জলধারণের কাঠামো বানিয়ে নিয়েছে। এই উদ্যোগের ব্যাপক বিস্তার প্রয়োজন। *

### বাঁধ নিয়ে আমেরিকায় বোধোদয়

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নদীর বুকে আড়াআড়িভাবে বাঁধ নির্মাণ শুরু হয়। সেই পথ অনুসরণ করে সোভিয়েট ইউনিয়ন, ভারত, চিন ও অন্যান্য অনেক দেশ অতি উৎসাহে বাঁধ নির্মাণ শুরু করে। তাদের ধারণা হয়েছিল, বিজ্ঞানে ও পার্থিব সমৃদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ USA যখন সেচ, বন্যানিরোধ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও শহরে জল সরবরাহের জন্য এই ব্যবস্থা করেছে, তখন নিশ্চয়ই তা উৎকৃষ্ট পথ হবে। আজ সেই যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা ও তাদের বৈজ্ঞানিক সংস্থা-সমূহ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে নদীর বুকে বাঁধ বাঁধলে লাভের চেয়ে ক্ষতি অনেক বেশি হয়। ফলে তৈরি করা বাঁধগুলি তারা ভাঙতে শুরু করেছে। পৌনে দুই বৎসর পূর্বে সঙ্কলিত সংবাদে জেনেছিলাম যে তারা ইতিমধ্যে নর্থ ক্যারোলিনায় Neuse নদীর বুকে কোয়েকার নেক বাঁধ, মেইন্‌স কেনেবেক নদীর বুকে এডওয়ার্ডস বাঁধ, ক্যালিফোর্নিয়ায় স্যাক্রামেন্টো নদীর এক উপনদীর বুকে ওয়েস্টার্ন ক্যানাল বাঁধ, ওরেগান রোগ (Oregan Rogue) নদীর বুকে Savage Rapids বাঁধ ভেঙে দিয়েছে। সে দেশে সব চেয়ে বড় প্রজেক্ট (Project) গুলির অন্যতম Glen Canyon বাঁধ — যে বাঁধ Corps of Engineers এর গৌরব হিসাবে মান্যতা পেত — ভাঙার জন্য বাজেটে ৫২ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে। Elwha বাঁধ ভাঙার জন্য তো আগে থেকেই ব্যবস্থা ছিল। সে দেশের জনমত এবং বৈজ্ঞানিকদের এখনকার অভিমত যে সব নদীকেই তাদের আগেকার প্রবহমানতায় ও নিজস্ব বৈভবে ফিরিয়ে আনতে হবে। অবশ্য একবার নষ্ট করে দিয়ে প্রত্যেকের স্বকীয় বৈভবে কতটা ফিরিয়ে আনা যাবে, সে বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করেন। আমাদের দেশেও নকলবাজির নেশায় ভুলে বহু হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে যে সব বাঁধ বেঁধেছি, যে সব ঘর ও জনপদ ভেড়েছি, বনসম্পদ নষ্ট করেছি, তার মাশুল হিসাবে আবার বেশ কয়েক হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে সেগুলি ভাঙার কাজ আমাদেরই করতে হবে। নতুবা পরিত্রাণের পথ থাকবে না। তেহরি বাঁধকেও একদিন ভাঙতে হবে, যদি বাঁধটি তার আগেই নিজে burst করে অসংখ্য মানুষের প্রাণ নিয়ে না বসে।

CSE -এর ঠিকানা 41,Tughlakabad Institutional Area, New Delhi – 1100 62.

## উত্তর ভারতের নদীগুলির বৈশিষ্ট্য

নদীর বুকে বাঁধ কতভাবে চরম সর্বনাশ ডেকে আনে, সে আলোচনায় একটু পরে আসা যাবে। হিমালয় পর্বত ভারতীয় জীবন কীভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং সে নিয়ন্ত্রণধারা না বুঝলে যে কী দুর্গতি হয়, তার প্রাথমিক পাঠে আমাদের প্রথমেই আসতে হয় কারণ সেই পাঠে আমাদের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক চিন্তাবিদদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়নি। তেহরি প্রসঙ্গে সে কথা এসেই পড়ে। উত্তর ভারতের নদীসমূহের ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গেও সে কথা এসে যায়।

হিমালয় হচ্ছে পৃথিবীর কনিষ্ঠতম পর্বত। হিমালয় যেখান থেকে উঠেছে, সেখানে পূর্বে ছিল টেথিস (Tethys) সমুদ্র। সেই সমুদ্রের পলিমাটি (alluvium) দিয়ে তৈরি হিমালয়ের দেহ। উৎপত্তির বৈশিষ্ট্যের জন্যও বটে আবার কম বয়সের জন্যও বটে, হিমালয়ের শিলা বিশেষ শক্ত হতে পারেনি। আমরা বলি বটে পাথর, তবে এ পাথর বেশ নরম (uncompacted) থেকেই গেছে। কনিষ্ঠ হলেও কিন্তু হিমালয় পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত বিস্তারেও বিরাট। উত্তর পশ্চিমমুখী মৌসুমি বাতাসের সাধ্য নেই একে ডিঙিয়ে যায়। তাই হিমালয় অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণও অত্যধিক। সুতরাং এখানে আছে তিনটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ — প্রচুর বৃষ্টি, বিরাট উচ্চতা থেকে তার প্রবল অবতরণ, নরম শিলারাশির গা' বেয়ে এই ঢল। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে উত্তর ভারতের সমস্ত নদ-নদী দ্রুততম siltation-এর শিকার। এই siltation হারের (rate) তুলনা পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যাবে না। গঙ্গা-সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্র ও তাদের উপনদী সমগ্র উত্তর ভারতজুড়ে যেখানে যত আছে, তাদের সকলের ভাগ্য যদি এই হয়, তাহলে এই বিস্তৃত জনপদের অর্থাৎ ভারতের বৃহত্তর অংশের অধিবাসীদের নদীসংরক্ষণের ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব থাকে। তথাপি ভারতের এতগুলি যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হয়ে গেল, তাদের কোথাও এই স্বীকৃতির কোনও চিহ্ন আছে কি? পরিবেশের মূল উপাদান বাদ দিয়েই আমরা প্ল্যান করি।

নদীসংরক্ষণের জন্য প্রথম দায়িত্ব ছিল স্পর্শকাতর এই অঞ্চলে বিশেষত পর্বতগাত্রে ঘন বন সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করা যাতে তার শিকড়ের জাল শিলারাশিকে আঁকড়ে রাখতে পারে কারণ জঙ্গলের ঘনত্ব কোথা-ও একটু কমলেই নরম শিলার ধ্বস নেমে আসবে। দ্বিতীয় কর্তব্য ছিল, নদীতে নিয়মিত dredging ব্যবস্থা চালু রাখা। অবশ্য অতি গোঁড়া পরিবেশবাদী বলবেন, 'যেখানে বিপুল পরিমাণ পলিমাটি (alluvium) অবিরাম জমছে, সেখানে মানুষ কত dredging চালাবে? তার চেয়ে নদী silted হওয়া ও বারে বারে গতিপথ বদলানো অনেক শ্রেয়।' বর্তমান লেখক এই অতি গোঁড়ামির সমর্থক নয়। যেহেতু মানুষ জলনিষ্কাশনের পথ (drainage channels) ও flood plains রোধ করে সর্বত্র লক্ষ লক্ষ ইমারত বানিয়েছে, সেহেতু এত বসতবাটি ভেঙে নতুনভাবে সব কিছু গড়ে তোলার স্বপ্ন আকাশকুসুম মাত্র। সে জন্য desiltation এর ব্যবস্থা ছাড়া অন্য উপায় নেই, তা সে dredge করেই হোক কিংবা শুকনো নদীর বুকে মানুষের শ্রমে মাটি কেটে হোক। চিনে মাও-সে তুং-এর আমলে ইয়াংসি নদীর শুকনো বুকে এক সময় অসংখ্য মানুষ কাজে নেমেছিল নদীর পলি স্থানান্তর করার কাজে। নিয়মিতভাবে তা করলে চাষের জমির উর্বরতা বাড়ত, আবার নদীর জলধারণের ক্ষমতা বাড়ত। ফলে বন্যা ও খরা দুই-ই রোধ করা সম্ভব হত।

তৃতীয় দায়িত্ব ছিল, পর্বতের পাদদেশ থেকে নদীর শেষপ্রান্ত অর্থাৎ বদ্বীপের শেষ স্থলভূমি পর্যন্ত নদীর দুই ধার ধরে বরাবর কমপক্ষে আধমাইল প্রস্থ জুড়ে ঘন বন সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করা, যাতে নদীতে সহজে ধস না নামে এবং বৃষ্টিহীন দিনগুলিতে দুইকূলের বনতলভূমিগর্ভে সঞ্চিত জলধারা ধীরসঞ্চারে ক্ষীণতোয়া নদীর বুকে নেমে এসে নাব্যতা বজায় রাখে। চতুর্থ দায়িত্ব ছিল, নদীপ্রবাহে বড় বাধাসৃষ্টিকারী কোনও স্থায়ী কাঠামো নদীবক্ষে যথাসম্ভব পরিহার করা।

এই সব দায়িত্ব উপেক্ষা করে, পর্বতগাত্রে ও নদী কিনারে অবাধে বন ধ্বংস করে, drainage channels রোধ করে, নদীবক্ষে অগণিত বিরাট বাধা গড়ে তুলে যে অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে, তার অনিবার্য পরিণতি জলাভাব মেটাতে নদীর অক্ষমতা আর বন্যাবৃদ্ধির প্রবলতা।

## বাঁধ কীভাবে সর্বনাশ ডেকে আনে

নদীর গতিপথে আড়াআড়িভাবে বাঁধ বাঁধা মানেই নদীটিকে অন্তিমযাত্রার পথে বসানো। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান প্রয়োগ করলেইএ কথার সত্যতা বোঝা যাবে।

(ক) নদী সাধারণত ২০ থেকে ৩০ ফুট গভীর হয় — অল্পস্থানে এর ব্যতিক্রম ঘটিয়ে নদী গভীরতর হতে পারে। যদি নদীর বুকে ১২০ কিলোমিটার বাউন্ডারি নিয়ে এক জলাধার তৈরি করা হয় যার গভীরতা ৩০০ ফুট আর প্রস্থের বিস্তার দেড় কিলোমিটার থেকে ২০ কিলোমিটার, তা হলে বাকি নদীটির থাকে কী? আর যে নদীতে — যেমন নর্মদার ক্ষেত্রে — উঠাউঠি কয়েকটি বিশাল জলাধারে বিপুল জলরাশি বন্দি করার প্ল্যান আছে, তার প্রবহমানতার অবশিষ্ট থাকে কতটুকু? এ হেন অবস্থায় নদী আপন বেগে চলার, মানুষের ঢেলে দেওয়া দূষণের ঢলে অক্সিজেন মিশিয়ে পরিশুদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা প্রথমেই হারায়। তারপরে ঘটে যায় বহু প্রকার অনিষ্ট, যার মধ্যে মাত্র কয়েকটি নিম্নে দেওয়া হল।





(খ) জলাধার থেকে জল ছাড়ার কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম থাকা সম্ভব নয়। কখনও বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়োজনে সেচের প্রয়োজন উপেক্ষা করতে হয়। আবার কোনও সময় সেচের দাবিকে প্রাধান্য দিতে হয়। এই ভাবে জলাধার থেকে কখনও অধিক মাত্রায়, আবার কখনও ক্ষীণধারায় জল ছাড়ার ফলে নদীর বেলাভূমিতে (shorelines) প্রচণ্ড অভিঘাত (shock effects) সৃষ্ট হয়। ফলে নদীর দু'কূল ভাঙতে থাকে, নদীতল (river bed) উঁচু হতে থাকে জলধারণের ক্ষমতা কমতে থাকে। নদীর ক্রমবর্ধমান siltation এর ফলে বর্ষায় প্লাবন ও খরায় জলশূন্যতার সম্ভাবনা বাড়তেই থাকে।

(গ) স্বতঃপ্রবাহী নদী তার অববাহিকায় ভূমির উপরিস্তরে জমে যাওয়া লবণ ও অন্যান্য দূষিত বা বিষাক্ত পদার্থ বহন করে সমুদ্রে নিয়ে যায়। বেঁধে ফেলা নদী সে ক্ষমতা হারায়। ফলে তার দু'ধারের ভূভাগ (basin) ক্রমশ নোনামাটিতে পরিণত হয়।

(ঘ) মুক্ত নদীর ধারা পলিমাটি বয়ে নিয়ে যেত নিরন্তর। পলির বেশির ভাগ সে পায় তার উৎস-সন্নিপে, পর্বতসঙ্কুল পথপরিক্রমায়। যখনই তার গতিপথে বাঁধ বাঁধা হয়, তখন পলি ওই বাঁধের গন্ডির মধ্যে বন্দি হয়ে জলাধারের গভীরে থিতিয়ে পড়ে। ফলে বাঁধোত্তর (downstream) নদীর জলে উর্বরতাদায়ী পলিমাটি প্রায় অনুপস্থিত থাকে; উপরন্তু সেখানে থাকে ক্ষতিকর লবণের ভার — Silt এর বদলে salt। কৃষির জন্য নদীজল যে সব জমিতে নিয়ে যাওয়া হয়, সেই সব সিঞ্চিত ক্ষেত্রে ভূমিগর্ভ থেকে capillary action প্রভাবে অসংখ্য লবণ কণিকা উঠে এসে ভূমির উপরিভাগে (surface) সঞ্চিত হতে থাকে। সেচের জল নদীতে প্রত্যাবর্তনের পথে সেই লবণকণিকারাশি বহন করে আনে। তার ফল downstream region-কেই ভোগ করতে হয়। সে কারণে নদীর গতিপথ বন্ধ করা বাঁধ upstream ও downstream অঞ্চলের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষের সূত্রপাত করে।

(ঙ) বড় বাঁধ ছোট ছোট বন্যা (floods) রোধ করে কিন্তু বহুক্ষেত্রেই মহাবন্যার সৃজক হয়ে দাঁড়ায়। দারুণ বৃষ্টির সময় যখন বর্ষণের প্রবল চাপ থেকে ত্রাণ পাওয়া প্রয়োজন, সেই সময়েই upstream থেকে অতিরিক্ত জলের ঢল এসে হাজির হয়। অতিবৃষ্টির সময় বাঁধবন্দি জলাধার জলে ভরে যায়, বাঁধ burst করে আশেপাশের জনপদ ডুবিয়ে দেওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি করে, তখন এই বিপদ রোধ করার জন্য বিপুল বেগে জল ছাড়তে বাধ্য হতে হয়। দামোদরের বাঁধ, হীরাকুন্ডের বাঁধ, ময়ূরাক্ষীর বাঁধ এই ভাবে বারে বারে অতিপ্লাবনের কারণ ঘটিয়েছে। কয়েক বৎসর পূর্বে আমেরিকার মিসিসিপি (Mississipi) নদীর বাঁধ মহাবন্যার কারণ ঘটিয়েছিল।

(চ) মুক্তপ্রবাহী নদীর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যে তার তটদেশে বালি, পলি ও clay পৃথকভাবে জমা হতে থাকে, যেন মানুষের সুবিধার জন্য প্রকৃতি নিজেই বাছাই করে দিতে থাকে। এগুলির ওজন বিভিন্ন, সে জন্য থিতিয়ে পড়ার সময় ও দূরত্ব বিভিন্ন। যে নদীর প্রবাহে কোনও স্থিরতাই নেই, সেখানে এই সুবিধাও চলে যায়।

(ছ) বাঁধ বাঁধলে জলাধারের অতি গভীরে অক্সিজেন প্রবেশ করতে পারে না। বাঁধ থেকে যখন দুর্বার গতিতে জল ছাড়া হয়, তখনও oxygen-এর ঠিক মিশ্রণ ঘটে না; আবার শ্লথগতি অগভীর জলও জলচর প্রাণীর জীবনের সহায়ক নয়। এই উভয় কারণেই বাঁধ-বাঁধা নদীতে সুস্বাদু মাছের বংশ লোপাট হয়। যে সব মাছ ডিম পাড়ার জন্য নুড়ি (gravel) খোঁজে, তারা বাঁধ পার হয়ে নুড়ি-প্রকীর্ণ অঞ্চলে পৌঁছাতে পারে না, ফলে সেই সব অতি-সুস্বাদু মাছের বংশও ক্ষয় হতে থাকে।

(জ) বাঁধবন্দি নদীর শেষপ্রান্তে (at the tail end) জলধারা অতি ক্ষীণ হয়ে আসে। সেখানে hydrostatic pressure অতি কম হয়ে যাওয়ায় সমুদ্রের লোনাজল বদ্বীপের ভূগর্ভে প্রবেশ করতে থাকে। ফলে বদ্বীপ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ ভূমি অনুর্বর হয়ে ওঠে। এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, যে-গুজরাট আজ সর্দার সরোবর বাঁধ তৈরির জন্য পাগল হয়ে উঠেছে, ভবিষ্যতে সেই গুজরাটকেই অনুতাপ করতে হবে। সমুদ্রের লোনাজলের অনুপ্রবেশ তারাই ডেকে আনছে তাদের উর্বর জমিতে।

(ঝ) মুক্তপ্রবাহী নদীর মোহানা — যেখানে নদীর মিষ্টিজল ও সমুদ্রের লোনা জলের সঙ্গম হয় — সব সময় নবজীবনের উৎস। এই মিশ্রণজনিত উথল-পাথল ও মন্থনপ্রক্রিয়ার ফলে nutrient সমূহের উৎসেচন ঘটে; সৃষ্টির মহোৎসবে মেতে ওঠে মাছ, কাঁকড়া, ঝিনুক, জলকুক্কুট জাতীয় যাবতীয় প্রাণী; বিভিন্ন species এর বিপুল অভ্যুদয় ঘটে। ফলে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর খাদ্যসম্ভারে সমারোহ আসে। অপর পক্ষে বাঁধবাঁধা নদী মোহানায় চলে শীর্ণদশায়; মিষ্টিজলের ধারা ক্ষীণ হয়ে যাওয়ার ফলে সেখানে জীবনের সক্রিয়তা থাকে না। তাতে পুষ্টি ও ওষুধের ঘাটতি মানুষকেই ক্লিষ্ট করে। এতে যে শুধু জীবনবৈচিত্র্য (biodiversity) ক্ষুণ্ণ হয়, তাই নয়; সমগ্র অঞ্চল স্থায়ীভাবে জলবায়ুর ভারসাম্য হারায়।

(ঞ) বাধাবন্ধনহীন প্রবহমাণ নদী সবেগে সমুদ্রে গিয়ে মেশে সঙ্গে নিয়ে যায় পলিমাটি ও বহুপ্রকার জৈবিক পদার্থের ঘর্ষণক্লিষ্ট অবশেষ। সেইগুলিই সমুদ্র ও মহাসমুদ্রের phytoplankton সমূহের খাদ্য হিসাবে কাজে লাগে। বাঁধ বাঁধার ফলে যেহেতু মোহানায় পৌঁছানোর পূর্বে ক্ষীণ স্রোতস্বিনীর বিলয় ঘটে, সেহেতু phytoplanktons অনেকাংশে বিনষ্ট হবে। মনে রাখতে হবে,

পৃথিবীর অক্সিজেন সম্ভারের অধিকাংশ-ই এই phytoplanktons -এর অবদান। অক্সিজেন উৎপাদনে এই বাধার ফল যে কী মারাত্মক হতে পারে, সে বোধ আপাতত বাঁধ-উৎসাহীদের চেতনার বাইরে থেকে গেছে।

(ট) বাঁধ শুধু যে নদীর অপমৃত্যু, জলজ প্রাণীর ক্ষতি এবং মৎস্যব্যবসায়ী ও মৎস্যভোজী মানুষের রুজিরোজগারের ক্ষতি করে তাই নয়, স্তন্যপায়ী ও অন্যবিধ সকল প্রাণীর ক্ষতি করে। তার মধ্যে পড়ে পক্ষিজগতের ও পতঙ্গজগতের সমূহ ক্ষতি। নদীর কিনারা সমস্ত বন্যপ্রাণীর তৃষ্ণা মিটাবার স্থল; নদীপ্রবাহের ঠিক উপরে বায়বীয় স্তর বিভিন্ন পাখি ও পতঙ্গের ক্রীড়াভূমি। বাঁধোত্তর যুগে শ্লথগতি ও অতি দ্রুতগতি স্রোতের পালাবদলে তাদের খাদ্যের স্থায়িত্ব থাকে না; নদীকিনারে বৃক্ষশাখায় বাসাও অর্থহীন হয়।

পরিবেশতত্ত্বের দিক দিয়ে আরও অনেক কথা আছে যা নদীর গতি রুদ্ধ করে জলাধার সৃষ্টি করার বিরোধী। তন্মধ্যে মাত্র দু'টি দিকের উল্লেখ করে ক্ষান্ত হব। যেখানে জনপদের মধ্যে বিশাল জলাধার সৃষ্টি করা হয়, সেখানে malaria, sleeping sickness, schistosomiasis প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়। ফলে আশেপাশের মানুষ ও পালিত পশুর স্বাস্থ্য দারুণ ভাবে ভেঙ্গে পড়ে; বৎসরের অধিকাংশ দিনগুলি হাড়কাঁপুনি জ্বরে কাটাতে হয়।

বাঁধ-পরবর্তী (downstream) এলাকাগুলিতে যখন nutrients-এর অভাব তখন বাঁধবন্দি জলাধার nutrients এর অতিভারে ভারাক্রান্ত, ফলে সেখানে algal bloom-এর সমারোহ। এই algae পচনের ফলে জলাধারের উপরিস্তরে যদি বা কিছুটা অক্সিজেন থাকতে পারত, তা-ও নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে fungi, bacteria, sludge-worm এবং anaerobic (বায়ুহীন) জগতের যাবতীয় হীনতর প্রাণী আসর জাঁকিয়ে বসে। তার ফলে জলাধারতলে যে সব (মানুষের হিসাবে) উচ্চতর প্রাণী থাকত, তারাও বিনষ্ট হয়। কয়েক দশক পরে জলাধার হয়ে দাঁড়ায় নরককুণ্ড আর নদী হয়ে দাঁড়ায় sewer (ময়লাবাহী নর্দমা)।

পরিবেশতত্ত্ব বাদ দিলেও বড় বাঁধ আর এক কারণে পরিত্যজ্য। এর মধ্যে আছে মৃত্যুর হাতছানি, যে রকমটি থাকে যুদ্ধক্ষেত্রে। বিমান আক্রমণের মুখে দৃশ্যমান বড় বাঁধ খঞ্জ হংসের (lame duck) মতো অসহায়। বহিঃশত্রুর সহজ লক্ষ্যস্থল (target) হয় বড় বাঁধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানির Ruhr উপত্যকায় যে সব বাঁধ ছিল, আমেরিকান বিমানবাহিনী তার উপর বোমাবর্ষণ করায় বাঁধভাঙা জলরাশি তালবৃক্ষসম উচ্চতায় প্রাণপণে পলায়মান জনসমষ্টিকে মুহূর্ত মধ্যে গ্রাস করেছিল। তেহরি বাঁধ, ইন্দিরাসাগর, সর্দার সরোবরের তুলনায় সে সব বাঁধ ছিল অতি ক্ষুদ্র। তাদের যখন এই দশা হয়েছিল, তখন বিশাল বাঁধের উপর আক্রমণ হলে কত বড় বিপর্যয় ঘটতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। যেখানে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ঘাতিতি আছে, সেখানে বড় বাঁধ নির্মাণ আত্মহত্যার নামান্তর।

## মৌসুমি বর্ষণের বৈশিষ্ট্য : মানুষের দায়িত্ব

প্রশ্ন ওঠে : নদীর বুকে বাঁধ যদি এতই ক্ষতিকর হয়, তা হলে ইউরোপ, চিন ও অন্যান্য দেশে নির্মিত বাঁধ ভেঙে ফেলার হিড়িক পড়েনি কেন? ষাট বৎসর আগে তৈরি টেনেসি বাঁধ এখনও নরককুণ্ডের পর্যায়ে আসেনি কেন? আমাদের দেশে— যেখানে চারমাস বৃষ্টির পর ৮ মাস খরা থাকে, সেখানে— কি বৃষ্টিহীন দিনগুলির জন্য বাঁধ বেঁধে জল ধরে রাখা ছাড়া গত্যন্তর আছে?

মধ্য অক্ষাংশীয় দেশগুলির সঙ্গে আমাদের দেশের জলবায়ুর প্রভেদ আরও গভীরভাবে বুঝতে হবে। বিশ্ববিখ্যাত meteorologist ভারতীয় অধ্যাপক P. R. Pisharoty -র মতে নদীর বুকে যত বড় জলাধার তৈরি করা কেন, আমাদের মৌসুমি বৃষ্টির অধিকাংশ সমুদ্রে চলে যাবে, তার ২৫—৩০ শতাংশের বেশি ধরে রাখা যাবে না। এ অঞ্চলের মৌসুমি বর্ষণ মধ্য অক্ষাংশীয় দেশগুলির মতো মিনমিনে বৃষ্টি নয়। শেষোক্ত দেশগুলিতে এক বড় বাঁধ তিন বৎসরের সমগ্র বৃষ্টিও ধরে রাখতে পারে। পক্ষান্তরে আমাদের দেশে দশ দিনের ঘনতম বর্ষণ ধরে রাখবে, এমন সাধ্য কোনও বাঁধবন্দি জলাধারেরই নেই, থাকতে পারে না। তার কারণ এখানে বৃষ্টির বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে শুধু চার মাস ধরে বৃষ্টি হয় না, বৎসরের সমগ্র বর্ষণের অর্ধেকটা ঘটে যায় মাত্র ২০ থেকে ৩০ ঘন্টার মধ্যে। এত মুষলধারে সে বৃষ্টি।

এই বৃষ্টির মাঝারি সাইজের ফোঁটাগুলিও ইংল্যান্ডের ফোঁটাগুলির তুলনায় তিন গুণ থেকে পাঁচগুণ বড়; আর তাদের গতিবেগ (kinetic energy) ইংল্যান্ডের বারিবিন্দুর চেয়ে এক হাজার থেকে দু'হাজার গুণ। এই বৃষ্টির অধিক অংশ ধরে রাখতে পারে শুধু ঘন বন, নিবিড় তৃণভূমি, soil organic matter সমৃদ্ধ খেতি জমি, দেশজুড়ে লক্ষ লক্ষ farm ponds, percolation tanks, দু'ধারে বনসমৃদ্ধ গভীরতা-রক্ষিত নদী ও প্রতি পাহাড়ের পাদদেশে বৃত্তাকার গভীর পরিখা— এই সকল এজেন্সি একসঙ্গে মিলে। এই সমষ্টির কোনও বিকল্প নেই। স্বল্পবৃষ্টির এলাকায় মাদ্ধাতারকাল থেকে চলে আসছে যে সব ব্যবস্থা— যথা rooftop harvesting, বাড়ির basement -এ (ভূগর্ভে) নির্মিত জলাধারে জলধারণ, খেতিজমির মধ্যে গভীর কূপ ও তার চারদিক জুড়ে সিমেন্টে তৈরি Catchment ও জলপ্রবেশপথে পরিশোধন (filter) ব্যবস্থা, ভূমিগর্ভে বাষ্পীভবন (evaporation) সম্ভাবনামুক্ত অসংখ্য ক্ষুদ্র জলাধার— মানুষের সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে পারে অনেক কম খরচে।





অধ্যাপক পিশারোটির মতে কোনও এলাকায় যদি বৎসরে মাত্র ৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টি হয় আর সেখানে পুকুরের surface area র ৫০ গুণ catchment area রাখা হয়, তা হলে শতকরা ৪০ ভাগ জল বাহিরে চলে যাবে (run-off) ধরে নিলেও ১০ মিটার গভীর জল থাকতে পারবে। গ্রীষ্মের তাপে ২ মিটার জল উবে যাবে ধরে নিলেও বাকি ৮ মিটার মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পারবে। গ্রামের প্রয়োজন অনুযায়ী পুকুরের surface area সম্বন্ধে অবশ্যই গ্রামবাসীরা সিদ্ধান্ত নেবেন।

উল্লেখযোগ্য যে, গুজরাটের Land Development Corporation সর্দার সরোবরের বিকল্প হিসাবে সহস্রাধিক অনুক্রমিক (a series) চেক ড্যাম ও plug তৈরির পরিকল্পনা পেশ করেছিল, যাতে মাত্র দু'হাজার কোটি টাকা খরচ করে ১৬-১৭ মিলিয়ন acre feet জল পাওয়া যাবে। এই চেক ড্যামগুলির নির্মাণ সম্পূর্ণ করতে বড় জোর দু'বৎসর লাগার কথা। যেখানে সর্দার সরোবরে ১৮ হাজার কোটি টাকা ও কয়েকsurface area বৎসর খরচ করে মাত্র ৯ মিলিয়ন একর ফিট জল পাওয়া যাবে, সেখানে এই অর্থ ও সময় ব্যয় তো নস্যির মতো অথচ জল প্রাপ্তির পরিমাণ অনেক বেশি। যেহেতু এই বিকল্পে বিপুল বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রতিশ্রুতি নেই, সেহেতু এই পরিকল্পনা গুজরাট সরকারের মনঃপূত হয়নি।

জল পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা লাভ করতে গেলে সর্বপ্রধান কাজ বনসম্পদ রচনা। গুজরাটে যে সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ এলাকা আজ মরুর মতো শুষ্কতার শিকার, সেখানে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত বিলগঙ্গা, সর্থি, ভর্তু, মনসুর ও ঘি নদী সারা বৎসর প্রবহমাণা ছিল। সৌরাষ্ট্রের উত্তর পশ্চিমে মহুবা নামে পোতাশ্রয়ী শহরের কাছে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যেত— সমুদ্রে ভাঁটার জল পিছু হটতে থাকলে সমুদ্রের বেলাভূমিতে পাঁচটি মিষ্টি জলের ফোয়ারা জেগে উঠত। বন সাফ করে দেওয়ার পর এই সবনদীও ফোয়ারা লুপ্ত হয়ে গেছে।

নদীর সাবলীলতার সঙ্গে ও জলসরক্ষণের সঙ্গে বনের যে কী গভীর সম্পর্ক তা না বুঝে, নদীর দু'তীর ধরে বরাবর ঘন বনের প্রয়োজনীয়তা না বুঝে, প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করে আমরা বাঁধবন্দি জলাধার বানাই, বা ব্যারাজ বানাই। গঙ্গায় স্বাভাবিক নিয়মে যেখানে অঢেল জল থাকতে পারত, সে দিকটা না ভেবে পশ্চিমবঙ্গে ফরাক্কা ব্যারাজ তৈরি করা হয়েছিল। নদীতে ধস নামায় সে ব্যারাজের অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে আবার বহু গ্রাম নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে। ফরাক্কা ব্যারাজ হুগলি নদীর নাব্যতা বজায় রাখতে পারবে না। ফরাক্কা ব্যারাজ নির্মাণের বিরুদ্ধে স্বর্গত কপিল ভট্টাচার্য মহাশয় তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী আজ সত্য হতে চলেছে; কিন্তু তিনি হিমালয় অঞ্চলে ঘনবন রক্ষা ও নদীর দু'কূল বরাবর বনরক্ষা/বনসৃষ্টির কথা বলেননি। ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ দিকে ২৪ পরগণার এক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (জাতিতে ইংরাজ) আক্ষেপ করে বলতেন "হুগলি নদীতে যথেষ্ট জল থাকছে না। আণবিক শক্তি দিয়ে হিমালয় পর্বতের হিমবাহ (glacir) গলিয়ে কি জল আনা যায় না?" এ সব উদ্ভট চিন্তার কোনও প্রয়োজন থাকত না উত্তর ভারতের নদীগুলির বৈশিষ্ট্য বুঝলে ও প্রকৃতি-অনুগ দায়িত্ব পালন করলে। ফারাক্কা ব্যারাজ নির্মাণের এই সমালোচনায় বাংলাদেশের কিছু লেখক উল্লাস বোধ করতে পারেন। তবে তাঁরা যে বিকল্পের কথা বলেছিলেন, তা অতীব মারাত্মক ও আত্মঘাতী। "ফারাক্কা ব্যারাজনা করে হিমালয়ে বিরাট জলাধার সৃষ্টি কর না কেন?" এই ছিল ভারতের কাছে তাঁদের প্রশ্ন। এই পথে গেলে সর্বনাশ ঘটত। এমনিতেই ব্রহ্মপুত্র নদের তলদেশ ভূকম্পসৃষ্ট অগণিত ফাটলে ক্ষতবিক্ষত। ভারত যদি এই পথে যেত, তা হলে ভূকম্পের প্রকোপে ও ব্রহ্মপুত্রের রুদ্রমূর্তিতে বাংলাদেশের অস্তিত্বই বিপন্ন হত; ভারতও বিধ্বস্ত হত।

## জলসরবরাহে বেসরকারিকরণের পরিকল্পনা

প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করার ফলে ভারতের এক বিরাট অংশ জুড়ে মানুষ ও পশু খরার প্রকোপে, তাপের দহনে বুভুক্ষা ও তৃষ্ণার শিকার হয়েছে। অন্য অংশে সেই সময় প্লাবনের তাণ্ডব চলেছে। আবার এমনও দেখা যাচ্ছে যে একই এলাকায় এক মরশুমে প্লাবন, অন্য মরশুমে তীব্র জলাভাব। এই দুই ভয়ঙ্করতার উৎস কিন্তু একই— বন ধ্বংস, নদীর গতিবিজ্ঞান লঙ্ঘন, রাসায়নিক সার ব্যবহারের মাধ্যমে ও অন্য প্রকারে ভূমির জৈবিক উপাদানের (soil organic matter) বিনাশ, সমুদ্র উপকূলে mangrove (গরান গাছের বন) বিনাশ, মোটরবাহী রাস্তা সম্পসারণের নামে সেতু ও culvert সৃষ্টিতে কৃপণতাহেতু খালবিনাশ, কৃষিভূমি ও বাসভূমি বাড়াতে গিয়ে বিলের (wetlands) সর্বনাশ।

প্লাবন ও খরা উভয়েই ব্যবহার্য জলের ও খাদ্যের সংকট আনে। প্লাবনের সময় চারিদিকেই জল, তবুও একবিন্দু পানীয় জল মেলে না— আর দারুণ খরার সময় তো মরুর দশা। এইভাবে অন্ন ও পানীয়ের অভাবের কারণ ঘটিয়ে আমাদের দেশ ও বিশ্বের বহু দেশেই water policy র নামে privatisation শুরু করেছে অর্থাৎ মানুষকে জল কিনতে বাধ্য করতে চলেছে। "জলই জীবন নির্মল পানীয় জল পাওয়া বিশ্বের প্রতিটি ব্যক্তির মৌলিক অধিকার" এই সত্যকে নাকচ করে দিয়ে আজকের "বাজারি বিশ্ব" জলকে পণ্য বানিয়ে ছাড়ছে। এখানে এক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি, আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা কীরূপ প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা বোঝাবার জন্য। আমি পূর্ব-দিল্লিতে যে housing society

তে বাস করি, সেখানে আমাদের উপরে ছ্যাটে দুইটি ফ্ল্যাটে প্রতিদিন Kinley কোম্পানির 'bottled water' বিক্রি হয়। এক পরিবার সে জন্য প্রতিদিন ৮০ টাকা খরচ করে, অন্য পরিবার ৫০ টাকা। যেখানে মিউনিসিপ্যালিটির জল সরবরাহ করা হয় সেখানে যেমন, যেখানে societies ভূগর্ভস্থ জল সরবরাহ করে সেখানেও তেমন, নিরাপদ পানীয় জলের নিশ্চয়তা কোথাও নেই, তাই শহরগুলিতে প্রাইভেট জল কোম্পানিগুলি এইভাবে আসর জাঁকিয়ে বসতে পারছে। কিছুদিন পরে এইভাবে গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকেদের মধ্যেও এই ব্যবস্থা চালু হবে। অবশ্য প্রাইভেট কোম্পানিগুলির bottled water যে নিরাপদ, তা-ও নয়। আহমেদাবাদের Education and Research Centre রাসায়নিক সমীক্ষা করে দেখেছে যে ১৩টি পরিচিত brand এর মধ্যে একটিও ব্যাকটিরিয়া-মুক্ত নয় যদিও অনেকেই শতকরা একশো-ভাগ ব্যাকটিরিয়া-মুক্ত ও জীবাণু-মুক্ত বলে দাবি করে থাকে। Bottled water এর ব্যবসা ভীষণ লাভজনক। যে বিশ্বব্যাঙ্ক বিভিন্ন প্রকৃতি-পরিপন্থী জল প্রজেক্টে সাহায্য দিয়ে নদীকে ময়লাবাহী নর্দমা বানিয়ে ছেড়েছে, সেই বিশ্বব্যাঙ্কই বিশুদ্ধ জলসরবরাহ সেবার নামে privatisation of water প্রকল্পে সাহায্য করছে ও ঋণ বিতরণ করছে। বিশ্বব্যাঙ্কের বিবেচনায় জলের বাজারে এক trillion (১,০০০,০০০,০০০,০০০) ডলার মূল্যের বিক্রয় ঘটবে। Coco-cola কোম্পানি প্রকাশ্যেই বলেছে যে তারা চেষ্টা করবে বিশ্বের ৫৬০ কোটি লোকের মধ্যে একজনও যাতে তাদের কোম্পানির উপর নির্ভরতামুক্ত থাকতে না পারে। উপভোক্তাদের এই সংখ্যাটি কয়েক বছর আগের। বলাবাহুল্য ইতিমধ্যে তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রামের কিঞ্চিৎ-ধনী লোকেরা-ও bottled water এর পিছনে ছুটবে কারণ কৃষিতে কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারের ফলে ভূগর্ভের জলও বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। তবে প্রাইভেট কোম্পানির জল কী নিরাপত্তা দেবে, তার বিবরণ একটু দেখা যাক। ভারতের Research Foundation for Science, Technology and Ecology র কল্যাণে জানতে পারছি যে ১৯৯৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে privatised জল চালু হওয়ার পর দেখা গেল সে জলে *Giardia* ও *Cryptos* Poridium-এর অত্যধিক সংক্রামক বিদ্যমান। এই সব কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর সব স্কামেলা বন্ধ করার জন্য testing ব্যবস্থা-ও privatise করা হল; আর এই পরীক্ষার ফলগুলিও Confidential intellectual property হিসাবে গণ্য করার অধিকার কোম্পানিগুলি পেল। দূষিত জল-জনিত রোগে মৃত্যু কিন্তু নীরব থাকে না; সব মিথ্যা দাবির মুখোশ খুলে দেয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে Natural Resources Defence Council ১৯৯৯ সালে ১০৩ টি brand এর bottled water পরীক্ষা করে দেখতে পেল যে এক-তৃতীয়াংশ হচ্ছে স্রেফ tap water; এক তৃতীয়াংশে রয়েছে আর্সেনিক ও মারাত্মক E. coli ব্যাকটেরিয়া।

মূল কথায় ফিরে আসা যাক। কেন থাকবে না দূষণমুক্ত পানীয় জলের নিশ্চয়তা? নির্মল পানীয় জল পাওয়ার সর্বজনীন মৌলিক অধিকার কীভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যায়? নদীর জল যাতে কর্দমাক্ত হতে না পারে, তার জন্য করতে হবে ব্যাপক বনবিস্তার ও ভূমিক্ষয় নিবারণ। বনবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মাটির গভীরে aquifer গুলি চাঙ্গা হয়ে উঠবে এবং নদীর জল আবিলতামুক্ত হবে। তা ছাড়া, নদীর জল যাতে পায়খানার ময়লাজলবাহী নর্দমা হতে না পারে, সে জন্য চাই সর্বব্যাপী কার্যকরী sewage treatment ব্যবস্থা; নদীর জলে যাতে chemicals ও heavy metals না আসতে পারে, সে জন্য চাই প্রতি কারখানায় বাধ্যতামূলক effluent treatment ব্যবস্থা। তা ছাড়া চাই খালবিলের পুনর্জীবন, যাতে তাদের seepage থেকে দুই পাশের subsoil স্তরে জলসরবরাহ বাড়ে ও অনতিগভীর টিউবওয়েলগুলি-ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। চাই রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈবিক সারের সার্বিক প্রচলন যাতে ভূগর্ভস্থ জল দূষণমুক্ত থাকতে পারে। বর্তমান "বিকাশধারায়" এ ব্যবস্থা কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। দৃষ্টান্ত, গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করার অভিযান। ১৫ বৎসর আগে এর শুরু হয়েছিল। বহু ব্যয় করার পর উন্নতি বিশেষ কিছু হয়নি। বর্তমান বিধানে ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠান জরুরি, তার emission control ও effluent পরিশোধন সমান গুরুত্ব পাবে না। বাসস্থান নির্মান জরুরি, তার sewerage নদীতে ছেড়ে দেওয়ার আগে সম্পূর্ণভাবে দূষণমুক্ত হোক, সে ব্যবস্থা সমান গুরুত্ব কখনও পাবে না। কৃষিতে chemical ব্যবহারের ফলে জলের যে দূষণ, সে বিষয়ে কারও মাথাব্যথা-ই নেই।

সব চেয়েবড় কথা, এই কর্মপন্থাকে অগ্রাধিকার দিতে গেলে বৃহৎ শিল্পভিত্তিক শিল্পায়ন, express highways, নূতন নূতন বিমানবন্দর, পোতাশ্রয়, flyover, stadium, সুবৃহৎ (mega) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণের agenda খর্ব করতে হবে। তার পরিবর্তে প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে এবং প্রকৃতি-অনুরাগী বিকেন্দ্রিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা, বিকেন্দ্রিক শিল্পসংস্থান, polycultural কৃষির ব্যবস্থা করতে হবে। এ প্রকার ব্যবস্থায় দেশের স্থায়ী উন্নতি ও সর্বজনের সমৃদ্ধি ঘটবে। (কী প্রকারে তা সম্ভব, সে আলোচনা ভবিষ্যতে বিশদভাবে করা যাবে।) কিন্তু সে পথ নিলে দেশি-বিদেশি ব্যবসায়ীশ্রেণী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে—প্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে বলে চিৎকার শুরু হয়ে যাবে। বিদেশি, যারা ফাটকা পুঁজির খেলা খেলে আমাদের currency র অবমূল্যায়ন ঘটিয়ে এ দেশের শিল্প ও সৌধসম্ভার জলের দরে কিনে নেওয়ার জন্য ওঁৎ পেতে বসে



আছে এবং সে জন্য globalisation, liberalisation, privatisation তন্ত্রের বুলি শিখিয়ে আমাদের ময়না বানিয়ে ছেড়েছে, তারা তারস্বরে পৃথিবী জুড়ে ভারতের পশ্চাতগামিতার কথা প্রচার করতে থাকবে। সে ধাক্কা সামলাতে হলে বিকল্প সভ্যতা এবং তার ভিত্তি হিসাবে জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে বিকল্প প্রযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে স্বচ্ছদৃষ্টি থাকা দরকার। আশা করব বাংলার মুক্তবুদ্ধি বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিশারদ ও সমাজসংবীগণ এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়ার জন্য সচেষ্ট হবেন। জীবনের প্রয়োজনে নির্মল পানীয় জলের অধিকার এবং বিকল্প সভ্যতাগঠন আজ এক হয়ে গেছে।

সম্প্রতি দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়া দেশের জনগণ বিদেশি প্রাইভেট কোম্পানিগুলিকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হওয়ার পর বিভিন্ন দেশে নির্মল জলের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে কিছুটা সংগ্রামী চেতনা জেগে উঠেছে। সেই সঙ্গে জাগছে, পরিবেশ ও জীবনের যোগসূত্র সম্বন্ধে চেতনা। তবুও বলি, পরিবেশরক্ষা ও বিকল্প সভ্যতার যোগসূত্র সম্বন্ধে চেতনা না জাগলে বাজারি সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বঘোষী মৃত্যু-সওদাগরদের আক্রমণ আবার ফিরে আসবে।

## ভারত মহাসাগরের আকাশে বিপদের সঙ্কেত

জল সম্বন্ধে যখন আমরা আলোচনা করছি, তখন Indian Ocean Experiments (INDOEX) নামক এক আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানী দল জলবায়ু/আবহাওয়া সম্বন্ধে এক উদ্বেগজনক সংবাদ প্রকাশ করেছেন। ভারত মহাসাগরের উপকূল থেকে ১৬০০ কিলোমিটার দূরে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে শুরু করে তিন কিলোমিটার উর্ধ্ব পর্যন্ত দৃষ্টি ঝাপসা করে দেওয়া এক বিপুল aerosol স্তর সারা আকাশ জুড়ে রেখেছে। Aerosol এর অর্থ ভাসমান কণিকা (tiny particles of solids floating in the air)। ধূলিকণা, খনিজচূর্ণ, ঝুলকালি, sulphates, organic carbon, আয়েয়গিরি-উদ্গত পদার্থ ও সমুদ্রোত্থিত বায়ুতাড়িত জলকণিকার (spray) সমষ্টি এই aerosoal স্তর। INODEX প্রজেক্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিকরা এই ভাসমান কণিকাসমূহের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে দূষণের শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষের কর্মের ফল। কয়লা, পেট্রোলিয়াম জ্বলনের emission, কল-কারখানার emission ও biomass (কাঠ, তুঁষ প্রভৃতি) জ্বলনের ফলে। (পরিমাণ বিচারে কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক দ্বিমত পোষণ করেন।) এই aerosol এর গভীরতা ভারত মহাসাগরের দক্ষিণাংশে কম কিন্তু বিষুবরেখার উত্তরে বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের উপরিভাগে দূষণ গুরুতর।

নিঃসন্দেহে মেঘসৃষ্টির উপর, বৃষ্টির উপর এই aerosol এর দারুণ প্রভাব পড়বে। কোনও কোনও বৈজ্ঞানিকের মতে ভারতের পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অনাবৃষ্টি আরও প্রকট হবে এবং পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে বৃষ্টির প্রকোপ আরও বাড়বে। ফলে উভয় অঞ্চলে কৃষি ব্যাহত হবে; অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি উভয়েই বিপর্যয় ঘটাবে, আর হাঁপানির প্রকোপ বাড়বে।

এই ভাসমান কণিকারাশির একটি বিশেষত্ব, বিশ্বজুড়ে এর আনাগোনা। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের কলকারখানা যে sulphate aerosol সৃষ্টি করেছিল, সেই aerosol ১৯৮০ সালে আফ্রিকার Sahel অঞ্চলে ভীষণ অনাবৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গত ৩০ বৎসর ধরে সে অঞ্চলে শতকরা ২০ থেকে ৫০ ভাগ বৃষ্টি কমে গিয়েছে। মঙ্গোলিয়ায় অতিরিক্ত গোচারণ ও ভূমিকর্ষণের ফলে (oevrfarming and overgrazing) অতিরিক্ত ভূমিক্ষয় হয় এবং চুরা-মাটির ধূলার মেঘ চিন দেশের বেজিং এবং অন্যান্য শহরের উপর দিয়ে ভেসে যাওয়ার সময় কলকারখানা থেকে উঠে আসা বিবিধ দূষণ সংগ্রহ করে কলেবর বৃদ্ধি করে।

Greenhouse gases (কার্বন ডায়াক্সাইড, মেথেন), Ozone hole এবং aerosol haze - এই ত্রয়ীর প্রভাবে পৃথিবীতে জীবন বিপন্ন হয়ে উঠছে ক্রমবর্ধমান ভাবে। প্রতিকার হিসাবে fossil fuel burning কমাতে হবে, পেট্রোলিয়াম বা coal gas চালিত যানবাহন কমাতে হবে; সৌরশক্তি চালিত বৈদ্যুতিক যান ও সাইকেল চালু করতে হবে; কলকারখানা থেকে নির্গত তাপ ও দূষণমূলক gas কমাতে হবে। আর তা শুধু নিজের দেশে করলেই হবে না; অন্য সকল দেশও যাতে কমায় বা কমাতে বাধ্য হয়, তার জন্য বিশ্বজুড়ে অভিযান চালিয়ে যেতে হবে। বাঁচতে হলে এই বিপুল পরিবর্তনের দায়িত্ব থেকে পরিত্রাণ নেই।

## বিশ্বমত উপেক্ষায় আমেরিকার একগুঁয়েমি

দূষণের উপরি উক্ত উৎস প্রথমত কমাতে, পরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বন্ধ করতে চাইলে, সেখানেও আসে বিকল্প প্রযুক্তির কথা, বিকল্প জীবনধারার কথা, যে জীবন হবে সরল, সজীবতায় ভরপুর, অতি-ভোজ আর অতি-ভোগের অপচয় হতে মুক্ত। মুশকিল হচ্ছে, শুধু দেশের ভোগী সম্প্রদায় নয়, বর্তমান বিশ্বের সর্বাপেক্ষা পরাক্রমী শক্তি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভীষণভাবে তার বিরোধী। বর্তমানের দূষণব্যবস্থা থেকে একচুলও নড়তে চায় না। জাপানের কিয়োটো শহরে ১৯৯৭ সালের বিশ্বসম্মেলনে ঠিক হয়েছিল যে ধনী দেশগুলি তাদের ১৯৯০ সালের emission-এর শতকরা ৫ ভাগ মাত্র Carbon dioxide কমাবে ২০০৮-২০১২ সালের মধ্যে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশ রাজি হলেও USA — যে দেশ একাই পৃথিবীর ৩০ ভাগ $Co_2$ ছড়ায় — এই সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর করতে সরাসরি অস্বীকার করেছে। USA -এর ছুতা যে তা করতে গেলে তাদের দেশে বেকারত্ব বাড়বে, জীবনযাত্রার মান কমে যাবে। সেই জন্য পরিত্রাণকামী সব দেশ

মিলে USA—এর শিল্পমালিকদের এবং তাদের বশংবদ সরকারকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে পৃথিবীকে বাসযোগ্য করতে এবং সেই অভিযানে আমেরিকার জনসাধারণকে সঙ্গে নিতে হবে।

সুখের বিষয়, প্রকৃতি-অনুরাগী যে সব প্রযুক্তিবিদ্যা বিদ্যমান, সেগুলি উৎপাদন পদ্ধতির বিকেন্দ্রীকরণ ঘটাতে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা সাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করতে এবং সার্বজনিক সমৃদ্ধি আনতে বিশেষ উপযোগী। সে জন্য সেগুলি G–7 দেশগুলির এবং রাশিয়া ও চিনের জনগণকেও আগ্রহান্বিত করতে পারবে। বৃহৎ (mega) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও oligopolistic শিল্প-বাণিজ্যের বদলে co-generation ব্যবস্থা সমন্বিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা, micro-hydel, mini-hydel, সৌরশক্তি, wind energy, biofuels, fluidised bed technology এবং তৎ-সঙ্গত (compatible) বিকেন্দ্রিক শিল্পসংস্থান এবং agri-horti-flori-sylvi-pisciculture, poultry and animal husbandry সমন্বিত integrative farming সমবায়-ভিত্তিক, প্রকৃতির সঙ্গে অন্তর-আলাপী সভ্যতার বাহক হিসাবে সাড়া জাগাতে সক্ষম হবে।

মুক্ত কণ্ঠে ও দৃঢ় প্রত্যয়ে বলা যায় যে যতদিন সভ্যতার আদর্শ থাকবে "বাজারি" ব্যবস্থা ও তার আনুষঙ্গিক হিসাবে থাকবে প্রকৃতি-বিজয়-অভিলাষী প্রযুক্তিবিদ্যা, ততদিন এই ভাবে সমগ্র জনসমষ্টিকে খাদ্য, জল ও বায়ুর সঙ্কটে দুর্নিবার গতিতে নিক্ষিপ্ত হতেই হবে, মৃত্যুর আলিঙ্গনে। তাই যারা মানুষের ক্ষুধার অন্ন, নিঃশ্বাসের বায়ু ও পিপাসার জল বিষাক্ত করছে, সভ্যতানামী সেই দস্যুবৃত্তির পোষকদের প্রতিটি ছলাকলা প্রতিহত করতেই হবে বাঁচার প্রয়োজনে। সেটা সম্ভব করতে হলে শুধু ধনতন্ত্র বা Market economy র সমালোচনা করে ক্ষান্ত হওয়া চলবে না বিকল্প জীবনধারা ও বিকল্প প্রযুক্তির ধারণা চাই, যাকে সমস্ত রাজনীতিক দল এতদিন peripheral বলে অবজ্ঞা করে এসেছে, তলিয়ে দেখার চেষ্টা না করে।

### বায়োটেকনোলজি নামের আড়ালে রাক্ষসী বিদ্যা

যেখানেই প্রকৃতিকে পরাভূত করে অতি লাভের লোভ প্রাধান্য পেয়েছে, সেখানেই অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে, এ ধারণা অনতিস্পষ্টভাবে অনেকের মধ্যে এসেছে। কৃষিকে তার স্বাভাবিক চরিত্র থেকে হটিয়ে দিয়ে মূলত রাসায়নিক পদার্থ-নির্ভর করতে গিয়ে যে বিষম ক্ষতি হয়েছে, তা সাধারণভাবে সকলেরই জানা আছে। তবুও বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে এই কারণে যে এই বিপর্যয় থেকে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করা হয়নি। সে আলোচনা আমরা আগামী কোনও সংখ্যায় করব। এখানে শুধু এইটুকু বলা দরকার যে বাণিজ্যিক সভ্যতার যুগে প্রকৃতির রহস্যসন্ধানী, কৌতূহলী, সমগ্রদর্শী বিজ্ঞানীদের (philosopher scientist) চেয়ে বিজ্ঞানীনামী technicalist -দের চাহিদা বেড়েছে, আর আমরা তার বলি হচ্ছি।

কেমিক্যাল-নির্ভর কৃষি টেঁকসই হবে না দেখেও এই সব প্রকৃতি বিজয়-অভিলাষী technicalist ঈশ্বরের ভূমিকায় উত্তরণের আশা ছাড়লেন না। প্রকৃতির জগতে যে সব শস্য বা প্রাণী নেই, এমন প্রকার শস্য ও প্রাণী সৃষ্টির চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলেন। সে জন্য সাধারণ মানুষের কল্যাণসম্ভবী bioscience কে hijack করে তাঁরা biotechnology র প্রাবল্য ঘটালেন। Bioscience ও biotechnology র মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। Bioscience (জীব-বিজ্ঞান) চর্চা হদিশ দিতে পারে প্রকৃতি-সৃষ্ট কোন পদার্থ কীভাবে, কী সহযোগে ব্যবহার করলে বিনা খরচায় বা স্বল্পমূল্যে নির্ধন ব্যক্তির জীবনেও স্বাচ্ছন্দ্য আসতে পারে (যেমন গত সংখ্যায় blue green algae, floating fern-এর উল্লেখ করেছি)। অন্যদিকে সাধারণত Biotechnology-র উদ্দেশ্য বাণিজ্যিক স্বার্থে ফ্যাক্টরিতে নতুন পদার্থের উৎপাদন যার অস্তিত্ব নেই প্রকৃতির জগতে। অবশ্য Biotechnology হিসাবে পরিচিত হলেও tissue culture বাঞ্ছনীয় এবং বিপন্ন species রক্ষার জন্য সীমিত পরিমাণে cloning সমর্থনযোগ্য। তবে Biotechnologyর নামে আজকাল trans-genetic engineering এর যে ঢেউ তোলা হয়েছে (এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় যার মোহাবিষ্ট হয়ে Bioscience চর্চা অবহেলা করছে) তার বিষময় পরিণতি সম্বন্ধে সজাগ হতে হবে। আজ শুধু এই কথা বলে শেষ করব যে এর পরিণতি জীবজগতের সার্বিক ধ্বংসে (biological holocaust) যা nuclear holocaust এর চেয়েও ভয়াবহ। প্রকৃতির মধ্যে জীবনের প্রয়োজন মেটাবার জন্য যে কী বিস্ময়কর আয়োজন আছে, তা বুঝলে উৎপাদনবৃদ্ধির উপায় হিসাবে এই রাক্ষসী বিদ্যার ভাবনা মনে আনারও কোনও প্রয়োজন থাকত না।

(চলবে)

ছোটগল্প

# অমৃতার পুত্র

স্বপ্না গুহ

কোমরটা টনটন করছে। হয়ত বিছানায় পিঠটা পাততে পারলে ভাল লাগত। কিন্তু অমৃতা নড়তে পারছেন না বারান্দার চেয়ারটা ছেড়ে। বারান্দার নীচের দৃশ্যটা ছেড়ে। একতলার বাড়ির ছোট্ট ছেলেটা গেটের ভিতরের অপরিসর জায়গাটুকুর মধ্যে একটা চাকা-ওলা ঠেলা ঠেলে ঠেলে খেলছে তার আয়ার সঙ্গে। গেটের বাইরে রাধাচূড়া গাছটা হলদে ফুলে ভরে উঠেছে কুড়ি বছর আগের মতো। গাছটা তখন অনেক শীর্ণ ছিল। অপরিণত। অপ্রচুর ছিল তার মাথা ভরা ওই হলুদ ছোপ। কিন্তু বুলানকে চুম্বকের মতো টানত ওই গাছটা। নীচে খেলতে গেলে, গেট পেরিয়ে ওই রাধাচূড়া গাছের তলায় গিয়ে ফুল কুড়োবার জন্য অস্থির হত। আজকাল থেকে থেকেই বুলানের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায় অমৃতার। বুঁদ হয়ে থাকেন সেই সব দিনের স্মৃতিতে। বোধ হয় উটপাখির মতো। আজকের কোনও ঝড়ের সংকেতকে যেন অস্বীকার করেন বুলানের শৈশবের স্মৃতিতে মুখ ডুবিয়ে।

স্বামীর কাছে দ্বিতীয় সন্তান প্রার্থনা করেছিলেন অমৃতা তেইশ বছর আগে, যখন তাঁর প্রথম আত্রেয়ীর বয়স ছিল চার। 'তোমার বীর্য নয়, তোমার অবিচল প্রত্যয় আমায় দাও—আমি ধারণ করি তোমার আমার মননের সন্তান-আমার গর্ভে নয়, হৃদয়ে।' অবশ্য, এই কাব্যিক সংলাপ অমৃতার সেদিনের সন্তান-প্রার্থনার প্রথম বয়ান ছিল না, ছিল উপসংহার। তরুণী অমৃতা সরল গদ্যেই তার যুবক স্বামীকে বলেছিল, 'একবার ভেবে দেখ তো, জন্ম নিয়ন্ত্রণের তাগিদে আজকাল শিক্ষিত সমাজে যে রকম পরিবার দেখতে পাও তা কি পরিবার হিসেবে খুব স্বাস্থ্যকর? ধরতে পারেনি সূর্যকান্ত - 'তার মানে?' আর একটু খোলসা করে বলে অমৃতা, 'সমাজসচেতন নাগরিক হিসেবে তুমি আমি কী চাইব? বড় জোর দুটি সন্তান? একটি হ'লে আরও ভাল—জনসংখ্যার চাপ যতটা লাঘব করা যায়! এই তো? কিন্তু একটি মাত্র সন্তানকে ঘিরে মা-বাবার স্নেহ ভালবাসার বন্যা, আর তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার চাপ একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করে না কি দু'পক্ষের জন্যই?' এবার সূর্যকান্তর চোখ মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়। অমৃতার ছোট্ট কোমরটি দু'হাতে বেষ্টন ক'রে তাকে বুকের একেবারে কাছে টেনে এনে সে বলে, 'সত্যিই তো! আমার অমুর জন্য মা ষষ্ঠির চাঁদের হাটটিকে মর্তে আনার পারমিশন তো ভারত সরকার দেবে না! আমাদের রেস্তোও কিন্তু সামাল দিতে পারবে না।' সূর্যকান্তর রসিকতায় যোগ না দিয়ে, গম্ভীর মুখে সে বলে, 'সে পারমিশন চাইতে যাচ্ছি না আমি। আপাতত দুই-কি-তিনের অনুমতি তো ভারত সরকার দিয়েই রেখেছেন। কিন্তু তোমার মন সায় দেয় সু? এমন করে সন্তান প্রজননে? এই দুর্দিনে, প্রতি দুটো মানুষের সংসার গড়ার সাধ মেটাতে আরও দু-তিনটে, নিদেন একটা ক'রেও নতুন জীবনের সৃষ্টি করা—একে কি সমর্থন করা যায়?' এবার একটু ধন্দ লাগে সূর্যকান্তর, 'কি বলতে চাইছ অমু?'

অমৃতা যখন বলে সে অনাথাশ্রম থেকে দত্তক নিতে চায় তার দ্বিতীয় সন্তানকে, সূর্যকান্ত কয়েক মুহূর্তের জন্য বোবা হয়ে চেয়ে থাকে তার দিকে। অমৃতার কথাগুলি সূর্যকান্তর কাছে এক হঠাৎ-আবেগ বা ইম্পালস বলে বোধ হয়। সূর্যকান্তর চোখের দৃষ্টি আর তার দুই ভ্রূর সামান্য জড়ো হ'য়ে আসার মধ্যে অমৃতা কোনও 'সৃষ্টিছাড়া' প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া দেখতে পায়। কিন্তু অমৃতার বিশ্বাস সে পারবে। এ প্রস্তাব যে সৃষ্টিছাড়া নয় প্রথা-বিরুদ্ধ মাত্র—এ সিদ্ধান্ত যে গভীর বোধের শক্ত জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে—এ প্রস্তাবকে ভাবালুতা বলে উড়িয়ে দেবার মতো আপাত নিরেট যুক্তিগুলোই যে আসলে মূলহীন শ্যাওলা মাত্র, এ কথা নির্মলবুদ্ধি সূর্যকান্তকে স্বীকার করাতে পারবে অমৃতা।

মনে পড়ে, সে রাত্রে, যেন দাম্পত্য-আরম্ভের দিনগুলির মতো প্রায় সারারাত কথা হয়েছিল তাদের। সে যে কি আশ্চর্য এক অভিজ্ঞতা! একটা করে সংশয় প্রশ্ন হয়ে আসছে সূর্যকান্তর দিক থেকে - একটা ঢেউয়ের মতো। অনায়াসে তার সমাধান করছে অমৃতা দক্ষ সাগরবিলাসীর মতো। সেই ভাবনাসমুদ্রে অবগাহন সূর্যকান্তকেও আপ্লুত করতে লাগল। আর সেই মুহূর্তে অমৃতার অনুভব হল এক অভিনব মৈথুনে রত হয়েছে তারা—মননের মৈথুন! সৎ, দৃঢ়চেতা আর অনুভবী সূর্যকান্তর বোধের মধ্যে অমৃতা বপন করল এক বিশেষ ভাবনার বীজ। একে যদি মননের মৈথুন বলা যায় তবে সেই ফাল্গুন মাসের শুক্ল পক্ষের রাত্রি তিন প্রহরে উচ্চারিত সূর্যকান্তর স্বীকারোক্তিটিকে বলতে হয় তার সুখোচ্ছ্বাস।

'আ'য়্যাম কনভিন্সড অমু, আয়্যাম কনভিন্সড!' অমৃতার মাথাটা বুকে নিয়ে সূর্যকান্ত বলতে থাকে, 'নিজের রক্তে শিশু

সৃষ্টি করা আর পৃথিবীতে পৌঁছে থাকা শিশুকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করা, এ দু'এর মধ্যে শুধুই আমাদের মানসিক সংকীর্ণতার বাধা ছাড়া আর কিচ্ছু নেই।' মাথাটা সরিয়ে এনে ওর চোখে চোখ রেখে সেদিন অমৃতাও যেন সেই উত্তেজনার আলোটাই দেখতে পায় যা সূর্যকান্ত অমৃতার চোখে দেখতে পেয়েছিল বছর চারেক আগের এক রাত্রির আশ্লেষের মুহূর্তে। সে রাতে অমৃতার শরীরে সূর্যকান্ত সঞ্চারিত করেছিল প্রথম সন্তানের সম্ভাবনা। আজ একই ভাবে সূর্যকান্তর বোধের মধ্যে অমৃতা সঞ্চারিত করল তাদের দ্বিতীয় সন্তানের সম্ভাবনা। আর তখনই অমৃতা উচ্চারণ করে ওই কাব্যিক সংলাপ, 'তোমার বীর্য নয়, তোমার অবিচল প্রত্যয় আমায় দাও — আমি ধারণ করি তোমার আমার মননের সন্তান — আমার গর্ভে নয়, হৃদয়ে।'

সন্ধ্যা নেমে আসায় নীচের বাড়ির বাচ্চাটা বোধ হয় ঘরে ফিরে গেছে। অমৃতা উঠে দাঁড়ান কোমরটাকে দু'হাতে চেপে। ধীরে ধীরে ঠাকুর ঘরের দিকে এগোন। ঠাকুর ঘরে প্রদীপ জ্বালতে গিয়ে দেখেন তেলের শিশিটা একদম খালি। ভারি বিরক্ত লাগে তাঁর। সকালে পুজো করার সময় শিশিটা চোখে পড়েছিল, কেন যে তখন তেলটা ভরে রাখেননি! এখন কোমরটা —। শিশি নিয়ে, কোমরের অংশের শিরদাঁড়াটাকে তিন আঙুলে চেপে, উঠে দাঁড়ান। রান্না ঘরের দিকে যেতে গিয়েই ফুলকপি ভাজার চড়া গন্ধটা নাকে লাগল। বুকের মধ্যে কি যে করে উঠল। মনে হল সরস্বতীকে এক ধমক দিয়ে বলেন, 'আজ হঠাৎ ফুলকপি ভাজবার কী হ'য়েছিল?' কিন্তু নিজেকে সংযত করলেন অমৃতা, এ ধমক ওর পাওনা নয়। শিশিতে প্রদীপের তেল ভরে নিয়ে চুপচাপ ঠাকুর ঘরে চলে গেলেন। প্রদীপ জ্বালা হল, শাঁখ বাজানো, এমনকী মেঝেয় মাথা ঠেকিয়ে প্রণামও। কিন্তু সবই কেমন যান্ত্রিকভাবে। ঠাকুর প্রণামেও যেদিন মন বসে না সেদিন বড় অসহায় লাগে অমৃতার। মনে মনে বলতে থাকেন 'ক্ষমা করো ঠাকুর! মার্জনা করো আমার চিত্তবৈকল্যকে'। শোবার ঘরে গিয়ে মশা তাড়ানো ম্যাট জ্বেলে দিয়ে এবার বিছানায় কোমর পেতে শুয়ে বলেন 'আঃ'! স্বস্তিতে নয়, সন্নিবদ্ধ যন্ত্রণায়। আর রান্নাঘর থেকে নাকে লেগে থাকা এক সন্নিবদ্ধ সুগন্ধ যেন আবার ছড়িয়ে পড়ে শ্বাসের মধ্যে — ভাজা ফুলকপির গন্ধ।

অনেক দিক থেকে অনেক বাধা এসেছিল। অনেক সমালোচনা। সূর্যকান্তর সমর্থনে সমৃদ্ধ অমৃতা ক্ষেত্রবিশেষে বিতর্কে নেমেছিল, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে শুধু মৃদু হেসে প্রসঙ্গান্তরে ঘুরিয়ে নিয়েছিল আলোচনাকে।

দু'হাতে পেতে বুলানকে নিয়েছিল আশ্রমের সন্ন্যাসিনীর কোল থেকে। চোখের ইশারায় সূর্যকান্তকে বলেছিল কাছে আসতে। এক হাতে অমৃতার পিঠ বেষ্টন করে অন্য হাতে বুলানের ছোট্ট মুঠিটাকে মুঠোয় জড়িয়েছিল সূর্যকান্ত। সামনে স্নেহময়ী মা মেরির মূর্তি। এই ছিল সূর্যকান্ত-অমৃতার দ্বিতীয় সন্তানলাভ। ছোট্ট তাতুকে নিয়ে নার্সিং হোম থেকে যেমন বাপের বাড়িতে এসেছিল অমৃতা তেমনই ছোট্ট বুলানকে নিয়েও বাপের বাড়িতেই এল ওরা। শুধু মায়ের অভাব পুরিয়ে সেদিন দুয়ারে অপেক্ষারত ছিল অমৃতার ছোট বোন শমিতা। হাতে তার হলুদ চন্দন প্রদীপ দিয়ে সাজানো বরণডালা। দুই পাশে শাড়ি-পরা খুদে দিদি তাতু আর ধুতি পরা খুদে দাদা গুটলু — অমৃতার দাদার ছেলে। দাদা-বৌদি আর সূর্যকান্ত সহ বুলানকে কোলে নিয়ে আলপনা আঁকা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শঙ্খ আর ঝুরো ফুলের অভ্যর্থনায় অমৃতার দু'চোখে জল উপচে এসেছিল। সে কি ছোট বোনের প্রতি কৃতজ্ঞতায়, না মায়ের কথা মনে পড়ায়?- হয়ত বা দুই-ই।

এই অভ্যর্থনা-পর্বের গল্পটা ছোট্ট বুলানের ভারি প্রিয় ছিল। বুলান যে তার মা-বাবার কোলে এসেছিল পৃথিবীতে এসে পৌঁছবার চোদ্দ দিন বাদে, এ'কথা তাকে জানানো হয় সাড়ে চার বছর বয়সে। তাতু অর্থাৎ আত্রেয়ী তখন ক্লাস থ্রিতে পড়ে। সূর্যকান্ত সেদিন সন্ধ্যা হবার আগেই আপিস থেকে ফিরেছিল। অমৃতার ঠেলাঠেলিতেই তাতুর যাওয়া, নইলে ওর মতে খেলা করার বয়স ওর মোটেই নয়। নীচে গিয়েও সুবালাদির সঙ্গে পুটুরপুটুর গল্প করেই সময় কাটাত তাতু। খেলাটা করত বুলান। আর দিদিদের চোখ এড়িয়ে, গেটের হুড়কো খোলা পেলেই যখন ছুট মারত বাইরের রাধাচূড়া গাছের দিকে, তাতু চিল চিৎকার দিত 'মা— দেখে যা—ও'। বারান্দায় এসে অমৃতা দেখতে পেল বুলানকে লেছড়ে টেনে আনছে সুবালা, আর বুলান ছটফট করে বলছে 'শুদ্ধু ফুল নেব আর কোনও দিকে যাব না। ঠিক বলছি।'

সেদিন হঠাৎ সকাল-সকাল বাবাকে আসতে দেখে উচ্ছ্বসিত বুলান ছুটে এসে বাবার উরুজোড়া বেষ্টন করে ঝুলে পড়ল। সূর্যকান্ত বুলানকে কোলে তুলে নিয়ে তাতুর হাত ধরে ওপরে উঠে এলে পর সুবালা চা-জলখাবার গুছিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে গেল। লুচির সঙ্গে আলু-ফুলকপি ভাজা। সূর্যকান্ত খেতে শুরু করলে অমৃতা আড়-চোখে ঠিক দেখতে পায় সূর্যকান্তর প্রতিটি লুচি, যেন একান্ত কাকতালীয়বৎ, শুধু আলুই জড়িয়ে তুলতে থাকে। আর বুলানও পায়ে-পায়ে এগিয়ে এসে, বাবাকে এক ঝুড়ি উটকো প্রশ্ন করার ফাঁকে-ফাঁকে, যেন একান্ত অন্যমনস্কভাবে, বাবার থালা থেকে একটি একটি ফুলকপির কুচি মুখে তুলতে থাকে। অমৃতা অতি কষ্টে হাসি চেপে কড়া গলায় বলে 'আ-মি দে-খ-তে পা-চ্ছি বুলান!' ভারি অপ্রস্তুত মুখে বুলান হেসে বলে, 'এ-মা—! এটা তো বাবার! আমি তো এত্ত খেয়েছি। না মা?, সূর্যকান্ত আর তাতু হেসে ওঠে। কিন্তু অমৃতা, ওই মায়াবি মুখখানাকে দু'হাতে তুলে ধরে চুমোয় ভরে দেবার ব্যাকুলতা বুকে চেপে রেখে, অপ্রসন্ন মুখে বলে, 'ছিঃ'



'ইচ্ছে ক'রে না মা, ইচ্ছে ক'রে না'-বুলানের ব্যাকুল সাফাই, 'বাবার সাথে কথা বলছি তো? কপি ভাজার গন্ধ নাকে লেগেছে! ভুল হয়ে গেল।'

সেই ছোট্ট বুলানের আজ দশাশই চেহারা। — রাধাচূড়ার মোহ নেই। — নেই তার দিদির সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে মায়ের আদর খাবার তাগিদ। কিন্তু সেই ফুল কপি-ভাজার গন্ধে আজও বুলানের 'সব ভু-ল হ-য়ে যা-য়!' মনের ভিতর থেকে জিভে এসে পড়ে কথা কটা। অমৃতা নিজের মনে মুচকি হাসেন। তারপর কোমরটা একটু ছেড়েছে বুঝে, বিছানা ছেড়ে উঠে আর একটা ধূপকাঠি জ্বালাতে নেন সূর্যকান্তর ছবির সামনে দেবার জন্য। ঠাকুরঘর্ থেকে এসেই এটা জ্বালেন অমৃতা, কিন্তু আজ কোমরটা একান্তই বিদ্রোহ করছিল সে মুহূর্তে। দু'বছর হয়ে গেল মানুষটা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছেন, কিন্তু ছবির ওই হাসিমুখখানার দিকে চাইলেই একরাশ অভিমান যেন অমৃতার বুকের মধ্যে দাপাদাপি শুরু করে। ধূপটা জ্বেলে দিয়ে, ছবির মুখোমুখি রাখা ইজি চেয়ারটায় বসে পড়লেন অমৃতা একদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চেয়ে। এই শুভ-দৃষ্টির আয়োজনটা মেয়ে তাতুর করে দেওয়া। সেবার সূর্যকান্তর পারলৌকিক ক্রিয়া সেরে, হায়দারবাদ ফেরার আগে এই চেয়ারটা কিনে এইখানে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল সে।

সূর্যকান্তর লুচি খাওয়া হলে তাকে চা ছেঁকে দিয়ে বুলানকে কোলে টেনে নিয়েছিল অমৃতা। বুলান চট করে মায়ের মুখে চোখ রাখল একবার, তারপর চিৎপাত হ'য়ে শুয়ে পড়ল মায়ের ছড়িয়ে পাতা কোলটাতে, 'কেন মা?' অমৃতা হেসে ফেলল, 'এমনি একটু ইচ্ছে করল।' তারপর, বুলানের শার্টে লেগে থাকা ধুলোটা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'তোদের কস্তুরি মিস স্কুলে এসেছিলেন আজ?' বুলানের পত্রপাঠ জবাব, 'এখন কি করে আসবে? আগে পেটের থেকে বেবিটা বেরোক! হি-উ-জ পেটটা নিয়ে হাঁটতে পারে?' অমৃতার উচ্চ হাসিতে যোগ দিল সূর্যকান্তও।

হাসিটার জের টেনেই অমৃতা বলে উঠল, 'একটা মজার কথা জানিস, তুই আমার পেটের থেকে বেরসনি।' চূড়ান্ত অবিশ্বাসের সুরে বুলান বলল, 'ভ্যাট, তা আবার হয় নাকি? স-ব বাচ্চাই পেটের থেকে বেরয়, আমি কি জানি না?' অমৃত হাসে, 'সেটা একদম ঠিক জানিস তুই। পেটের থেকেই সবাই বেরয়, তুইও বেরিয়েছিলি, কিন্তু আমার পেটের থেকে নয়।' 'বাজে কথা', এবার যেন বুলানের কথায় প্রত্যয় একটু ঢিলে। বাবা আর দিদির দিকে চেয়ে সে বলে 'বাজে কথা বলছে মা, না বাবা?' সূর্যকান্ত ঝলমলে হাসি মাখা মুখে বলে, 'না রে বুলান, এটা একদম সত্যি! ওফ্ কী যে এক্সাইটিং ব্যাপার! মাকে বল, পু-রো-টা তোকে বলবে।' অমৃতার গায়ের কাছে সরে এসে বুলানের দিদি তাতুও, প্রিয় গল্প শোনার খুশি গলায় নিয়ে, বলে 'হ্যাঁ মা বলো বলো, দারুণ লাগে শুনতে।'

চোখ গোল-গোল করে বুলান শুনতে থাকে যেন রূপকথার গল্প। মা তো ঠাকুরকে বলেই খালাস যে তাদের এবার আর একটা বেবি চাই ... ছোট্ট তাতুর চাই একটা খেলার সাথী- ছোট্ট একটা ভাই। কিন্তু দিন যায় ... মাস যায় ... মার পেট আর ফোলে না! একদিন, হঠাৎ মা বাবাকে বলে, 'আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে আমার ছেলেটাকে ঠাকুর অন্য কারো পেটের মধ্যে দিয়ে পাঠিয়েছেন?' বাবা বলে 'সত্যিই তো!' অমনি ছুট-ছুট-ছুট ...! কোথায় রয়েছে সেই অমৃতা-সূর্যকান্তর ছেলে! এই অবধি শুনে বুলান বাধা দেয়, 'ঠাকুর কখনও কারো ছেলেকে অন্যের পেটে দেয় নাকি? সবাই তো মায়ের পেটের থেকেই বেরয়!'

অমৃতা এবার বুলানের বট্‌ঠাকুমার সবজি-বাগানে দেখা বেগুন ফুলের থেকে বেরনো ছোট্ট বেগুনের দৃষ্টান্ত দিয়ে, বড় মানুষের শরীর থেকে ছোট্ট বেবি বার হবার প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করে। তারপর বলে, 'ফুলটা কি বেগুনের মা হয়?' বুলান আবিষ্কারের চোখে তাকায়। অমৃতা বলে, 'ফল সবজির তো আর ভাত খাওয়া নিয়ে বায়না — জল ঘেঁটে সর্দি বাধানো — কি স্কুল-ড্রেসে বাবল্‌গাম লাগিয়ে ফেলা, এ'সব থাকে না,' বুলানের কুলকুলিয়ে ওঠা হাসির মধ্যে দিয়ে অমৃতা কথা শেষ করে, 'তাই ওদের মা বাবা লাগে না, দিদি লাগে না, তাই না?' বুলান হাসতে-হাসতেই মাথা নেড়ে সায় দেয়। অমৃতা বলে, 'কিন্তু বড় মানুষের শরীর থেকে বেরনো বেবি মানুষটার তো মা বাবা লাগে? তাই এমনিতে মায়েরই শরীরের মধ্যে দিয়ে বেবিটাকে পাঠান ঠাকুর, ব্যাস, হয়ে যায়। কিন্তু কখনও-কখনও আবার অন্য একটা শরীরকে ফুলের মতো শুধু ফল ফলাবার কাজটুকু দেন। পরে মানুষ-ফলটা, মানে বেবিটাকে একটা জায়গায় যত্ন করে রাখা হয় যাতে তার মা-বাবা এসে চট করে নিজেদের বেবিকে খুঁজে পায়। মা যশোদার ছেলেও তো তাঁর নিজের পেট থেকে না বেরিয়ে অন্যের পেট থেকে বেরিয়েছিল, তুমি জানো তো?' বুলান শ্রীকৃষ্ণের গল্প থেকে নিজের গল্পে টেনে আনতে চাইল অমৃতাকে, 'কেমন ক'রে খুঁজে পেলে আমায়? ঠাকুর তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছিলেন?'

সেদিন গল্পের সব ক'টি শেষ হতে রাত হয়েছিল। শিশু বুলানের অভ্যর্থনার গল্পটা সবচেয়ে বেশি উপভোগ করে ও। তারপর থেকে কত হাজার বার যে ওই গল্পটা শুনতে চেয়েছে সে। এর পর যেমন যেমন বড় হয়েছে, নতুন নতুন ভাবনা যোগ হয়েছে নিশ্চয় ঘটনাটিকে ঘিরে। সমাজের কু-সংস্কারের বাতাস তো আছেই। দেহ-জনিত আর স্বেচ্ছা-চয়িত সন্তানের প্রসঙ্গে কতই না কাল্পনিক ভেদাভেদ। কখনও প্রশ্ন করেছে সে অমৃতাকে বা সূর্যকান্তকে। কিন্তু তা কোনও নিরাপত্তাহীনতার বা অস্তিত্ব-সংকটের সৃষ্টি করেনি। অমৃতার মনে হয়, খুব নিবিড় ভালবাসায় অমৃতার সাধের নীড়ের চার সদস্য যে স্বতঃস্ফূর্ততার ঠাসবুনুনিতে বাঁধা হয়ে আছে, সেটাই এক রক্ষা-কবচের কাজ করেছে। অবশ্য

এই রক্ষা-কবচের জোর সম্বন্ধে কতটুকু প্রত্যয় ছিল সেদিন অমৃতার? সেই, বুলানের বয়ঃসন্ধির সময়টাতে? অমৃতাকে বুলান এড়িয়ে চলছে ... তার শাসনে যেন একটু গুম হয়ে থাকছে ... স্কুল থেকে ফিরলে যেন একটু বেশি গম্ভীর থাকছে, এমনই নানান লক্ষণ দেখে যেদিন এক আতঙ্কের শিরশিরানি অমৃতার মেরুদণ্ড বেয়ে নেমেছিল! স্কুলের কিছু 'ডেঁপো ছেলে' কিশোর বুলানকে প্রভাবিত করছে। বিরূপ করে তুলছে তাকে তার 'অ-জননী' মায়ের বিরুদ্ধে, এমনই সব কল্পনায় অমৃতা যেদিন বলে উঠেছিল, 'এখনও সময় আছে, আমি বুলানকে নিয়ে দার্জিলিং চলে যাব - এই পরিবেশে ওকে আর একটুও থাকতে দেব না আমি। আমার সেই মা-আঁকড়ানো ছেলেটা ...!' আজ কেমন এক সজল কৌতুক খেলা করে প্রৌঢ়া অমৃতার চোখে, কি ভুলই না হয়েছিল তাঁর! কী বিচিত্র এক সমস্যায় পড়েছিল বুলান! মায়ের ইচ্ছে মতো বিজ্ঞান নিয়ে পড়া তার একান্ত অপছন্দ, অথচ, মার কাছে সেই প্রতিবাদ জোরালো ভাবে করতে তার ভয়, পাছে মা এই ভেবে দুঃখ পান যে, 'পেটে ধরিনি ব'লে বুলান আমার ইচ্ছে অনিচ্ছের তোয়াক্কা করে না।' অমৃতা আপ্লুত হয়েছিল তার কিশোরপুত্রের সূক্ষ্ম অনুভবের ছোঁয়ায়। শিশুর মতো অভিমানে বুলান বলেছিল, 'কেন আমায় পেটে ধরলে না মা? কেন আমার মনে সব সময় তোমায় আঘাত দেবার ভয় লেগে থাকে?' সে সময়ে, ফিরে-পাওয়া প্রত্যয়ে অমৃতা বুলানকে শান্ত করে বলেছিল, 'ও ভয়টা তুই একদম ছেড়ে দিতে পারিস। আমার পেটে-ধরা আর কল্পনায় ধরা দুটো সন্তানই আমায় অঢেল সুখ দিয়েছে, এই কনফেশনটা চুপিচুপি তোর কাছে করেই ফেলি।'

আজ মাস খানেক যাবত বুলানের কোনও ফোন পাচ্ছে না অমৃতা। মাসে একবার ফোন করত ও। একবার অমৃতা করতেন। এই ভাবে পাক্ষিক যোগাযোগের একটা ব্যবস্থা বছর খানেক যাবত চলছিল কারণ চিঠিপত্র ব্যাপারটা অনিয়মিত হতে হতে শেষে একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। গত মাসে অমৃতা নিজে ফোন করার পর এবার কিছুটা অপেক্ষা তো স্বাভাবিক। তা ছাড়া ওর ছুটি শুরু হতে আর মাত্র দশ দিন বাকি, আসার সম্বন্ধেও তো জানাবে কিছু!

এদিকে, তাতুর খবরটাও বিভ্রান্তিকর। মাস দুয়েক আগে কলকাতায় এসেছিল তাতু, বুলানেরই জন্য দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে। কথা বলতে বলতে বারবার কেঁদে ফেলছিল তাতু, 'কী হবে মা, সত্যি যদি ওই বয়সে-বড় মহিলাকে ও শেষ পর্যন্ত বিয়েও করতে চায়? অমৃতার শরীরের ভেতর একটা জ্বর-ভাব শিরশিরিয়ে উঠেছিল। তাতুর এ'বছরের রাখীটা নাকি ডাকের গোলমালে ফেরত আসে, অথচ বুলানের কোনও ফোন আসে না, এটাই তাতুকে দারুণ বিচলিত করেছে। সেই বুলান, যে রাখির আগের দিন থেকে ব্যস্ত হয় এখনও এসে পৌঁছল না কেন রাখি! সে কিনা রাখীর দিনে খালি হাত রয়ে গেল, তবু ফোন করে চোটপাট করল না!

পুনের সিম্বায়োসিস কলেজে বুলানের এক অধ্যাপক আছেন যাঁর শ্বশুরবাড়ি হায়দরাবাদে। তাতুদের পাড়াতেই। সেই সুবাদে সেই অধ্যাপকের স্ত্রী মীনাক্ষীর সঙ্গে তাতুর বেশ বন্ধুত্ব হয়েছে। মীনাক্ষী অত্যন্ত ভদ্র মেয়ে। অনেক ইতস্তত করে সে বলেছিল কথাটা। শেষে বারবার বলেছে, সে পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি কথাটা, কিন্তু সে আয়েয়ীর আর তার মা'র কথা ভেবেই এই অবগতিটুকু ওদের দিতে চাইছে ... অত দূরে রয়েছে ... একটা উঠতি বয়সের ছেলে ... নবীন প্রফেসরের যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার গল্পটার মধ্যে যদি কোনও সত্যতা থেকে থাকে! ভারি একটা শ্বাস ছেড়ে অমৃতা ভাবেন, থাকলেই বা করার কী আছে তাঁর! তেইশ বছরের ছেলে সাবালক ছেলে যা ভাল বুঝবে তা করবে। চারি দিকে তাকালে কোন ছেলেকে বা মেয়েকে দেখা যায়, যে মা-বাবার কথায় নিজের সিদ্ধান্ত বদল করে? তবু, অমৃতা যেন এই ক'মাস ধরে নিজের ভিতরে স্থির হতে পারছেন না কিছুতেই। বুলান যে তাঁর 'সেই ছেলেটা'! এই কাঁটা বুকে নিয়ে তেইশটা বছর কেটেছে। 'অনলাম তোমরা অনাথাশ্রম থেকে একটা বাচ্চা এনে মানুষ করছ? ভাল, ভাল, খুব মহৎ কাজ।'

'মহৎ নয় বোধহয়, বিবেচনার কাজ মাত্র।'

'কিরে? তোর সেই ছেলেটা কেমন শেপ নিচ্ছে? হেরিডিটিকে কাটিয়ে এনভায়রনমেণ্টকে কার্যকর করতে পারছিস তো? না হেরিডিটিটাই ফুটে বেরচ্ছে?'

'ওর হেরিডিটি কী-দোষে দুষিত তা কি আপনার জানা আছে বিধুকাকা? আমার কিন্তু জানা নেই।'

'ছেলেটা এত জেদি কেন? শাসন করিস না? অন্তত দিদির স-ং-স্প-র্শ-ও তো কাজে লাগা উচিত!'

'তোমার বড় ছেলের সংস্পর্শ প্লাস হেরিডিটি নিয়েও তোমার ছোট ছেলে যে স্রেফ জোচ্চোর হয়ে গেল লিলিমাসি। আমার ছেলের জেদটুকু নিয়ে তোমার এত ভাবনা?'

না, প্রশ্নগুলোর সঙ্গে যে জবাবগুলো মনে সেজে ওঠে তার একটিও উচ্চারিত হয়নি। 'জবাব' তাদের কারও পাওনা নয়, প্রশ্নগুলোই শুধু পাওনা অমৃতার, আর তার স্বামীর-তাদের 'সেই ছে-লে-টা'র জন্য! 'ছেলেটাকে এ সত্যটা বুঝতে দেওয়া যায় না। তাই অমৃতার বুকে জমতে থাকে এক মরিয়া ভাব- কেউ আঙুল তুলতে না পারে যেন তাঁর বুলানের দিকে। তাতু অবশ্য বলে থাকে, 'কেউ আঙুল তোলা'র আগেই নাকি ছোট্ট তাতুও হোঁচট খেত তার মায়ের শীতল অননুমোদনের সামনে। ভরসা পেত না সেই লক্ষ্মণরেখা ডিঙোতে। হতে পারে। পরিণত অমৃতা ... ব্যক্তিত্বে শৈথিল্য-আসা অমৃতা ... পথের প্রান্তে পৌঁছানো



অমৃতা আজ মানতে রাজি যে সফল সন্তান-প্রতিপালনের এক উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা আত্মপ্রত্যয় হয়ত সেদিন তাঁর ছিল। কিন্তু বুলানের জন্য যে ব্যগ্রতা, তার মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয় ... আত্ম-প্রত্যয় নয় ... ছিল এক ডানা ছড়ানো ব্যাকুলতা। ওরে বুলান, তুই এমন কাজ করিস না যাতে ওরা বলতে পারে 'সেই ছেলেটা বুঝি এই বেরল!'

হাসি-মুখ সূর্যকান্তর ছবির মুখোমুখি অমৃতা, তাঁর ভেজা চোখ মুছে, টান হয়ে বসেন। দু'হাতে ঠেলে দেন সেই ভয়ের শিরশিরানি, সেই জ্বর-ভাব। 'বুলানকে আমি নিজেই ফোন করব সু। কেন আমি ভয়ে কাঁটা হ'য়ে আছি? এত দিনে এ'টুকু কি আমার দায়িত্বশীল সন্তানদের পাওনা হয়নি, যে আমরা বিশ্বাস করব ওরা যা করবে ভেবে চিন্তেই করবে? সত্যি যদি মাস্টারের স্ত্রীর প্রেমেই প'ড়ে গিয়ে থাকে আমার বুলান। কেমন সেই রশ্মি শর্মা, যার আকর্ষণ আমার বুলানের জন্য অপ্রতিরোধ্য? কোন যন্ত্রণায় সেই মেয়ের দাম্পত্যবন্ধন শ্বাসরোধক হয়েছিল, যার উপশম প্রকট হয়ে উঠেছে আমার বুলানের আন্তরিক যত্নে? আমি আজই ফোন করে পরিষ্কার জিজ্ঞাসা করব ওকে ... অভয় দেব। বাড়িয়ে দেব সাহায্যের হাত ... পরামর্শ চাইলে পরামর্শও দেব। কি বল সু?' অমৃতা বিড়বিড় করে যেন সংকল্প নেন, আর ঠিক তখনই ফোনটা বেজে ওঠে। 'মা, আমি শনিবার পৌঁছচ্ছি।'

'বুলা—ন! কেমন আছিস বাবা?'

'খুব ভাল না মা, কদিন ধ'রে জ্বর চলছে।'

'সে কি রে? ঠাণ্ডা লাগালি নাকি?'

'না, এক্সারসাইজ। ম্যারাথন টিউটোরিয়াল চলছিল ছুটির আগে। তার পর গত সপ্তাহে বিরাট এক ফেয়ারওয়েল অ্যারেঞ্জ করতে হ'ল - আমাদের শর্মা স্যার এলাহাবাদ চলে গেলেন।'

অমৃতা ভেতরে-ভেতরে একটু চমকালেন, 'শ-র্মা-স্যা-র চলে গেলেন? সত্রীক?'

'অবভিয়াসলি!'

'না, শুনেছিলাম ওঁদের ডিভোর্স হচ্ছে, তাই —।' এবার দু'সেকেন্ড নিরুত্তর রইল বুলান।

তারপর হো-হো করে হেসে বলল, 'শু-নে-ছি-লে? তা হলে তো আরও কিছু শুনেছিলে মাম্মাম? যাক্‌গে, ওঁদের গোলযোগ মিটে গেছে। চলে গেছেন ওঁরা, টু লিভ হ্যাপিলি এভার আফটার।'

বুলানের সেই ছেলেবেলার মাম্মাম ডাক ... তার গলার মৃদু বিষাদ-ভরা অমৃতার মধ্যে কি যেন করে। ব্যাকুল গলায় বলে ওঠেন, 'আর তুই? তুই কেমন আছিস বুলান?'

'আমি ঠিক আছি মা। শনিবার দেখা হবে।' ফোন রেখে দেয় বুলান। সরস্বতী ডাকতে আসে খাবার জন্য। খাবার ঘরের দিকে যেতে যেতে অমৃতা ভাবতে থাকেন, তবে কি ওটা গুজব, না সত্যি! বুলান কি ব্যথা পেয়েছে খুব? কতটা দাম দিতে হয়েছে বুলানকে বা রশ্মিকে, সেই 'বিচ্ছেদে'র দরজায় এসে দাঁড়ানো 'বিবাহ'কে মেরামত করে তুলতে? হঠাৎ, বিষাদের স্রোত ঠেলে মনের মধ্যে অন্য এক ভাবনার বুড়বুড়ি ওঠে। ভাজা ফুলকপির টুকরো দু'আঙুলে তুলে মুখে পুরতে পুরতে অমৃতা বিষণ্ণ হাসি হাসেন। আঙুল-তোলা সমাজ তবে এবারও বলার সুযোগ পেল না, 'অমৃতার সেই ছেলেটা নাকি শেষে এই বেরল!'

প্রবন্ধ

# আত্মঅভিজ্ঞানের বিবর্তন : আজকের মালয়ালাম কবিতা

## কে. সচ্চিদানন্দন

### অনুবাদ - পবিত্র মুখোপাধ্যায়

মানবজীবনের একটি প্রেরণাদায়ক প্রবণতা হল স্থান ও কালের অভিজ্ঞতা অর্জন, নিজের ও অন্যের বিষয়ে জ্ঞান আহরণ, জীবনের সম্ভাবনা ও নশ্বরতা সম্বন্ধে বোধে পৌঁছনো, এই সব ক্ষেত্রেই পৃথিবীর সমগ্র নারী পুরুষের জীবন সম্পৃক্ত। এইসব অভিজ্ঞতার স্বরূপ উপলব্ধিই 'আধুনিকতা'। তা-ই আধুনিক যার সাহায্যে আমরা নিজেকে খুঁজে পাই, সেই পরিবেশ যেখানে থাকে নানা রোমাঞ্চকর কাজের প্রতিশ্রুতি, যা প্রাণে সঞ্চার করে শক্তি ও আনন্দ, করে সমৃদ্ধ, এনে দেয় বদলে যাবার অনুপ্রেরণা, যে অভিজ্ঞতা পারে পৃথিবীকেও বদলে দিতে এবং একই সঙ্গে বা একই সময়ে আমাদের অস্তিত্বকে সন্ত্রস্ত করতে পারে। আমরা যা জানি, বা জেনেছি, সবকিছুকেই ডিঙিয়ে যেতে সাহায্য করে এই অর্জিত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, এমনকী সে পারে ভৌগোলিক সীমারেখাকেও ছিঁড়ে খুঁড়ে দিতে। আধুনিক চেতনা আমাদের জাতিসত্তার সীমাপ্রসৃতি, শ্রেণী-চেতনা, জাতীয়তাবোধ, ধর্ম ও আদর্শের গণ্ডিকেও পার করে দিতে পারে, ফলত এই চেতনা পারে মানবজাতিকে সংহতিতে বেঁধে দিতে। আবার একে বলা যায় বিপরীতের ঐক্য বা সংহতি, অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান। অনৈক্যের স্থায়ী বদ্ধ জলাভূমিতে নতুন ভাবনার স্রোত বইয়ে দিতে পারে; সংগ্রাম ও সংঘর্ষে, সন্দেহ ও ক্রোধকেও জাগিয়ে দিতে পারে। আধুনিক হওয়ার অর্থ হল সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা। মার্কস যাকে বলেছেন — all that is solid melts into air.

মার্সাল বারম্যান এ ভাবেই আধুনিকতার আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাটিকে তাঁর দিক নিরূপক সৃষ্টি 'সমস্ত সান্দ্রর দ্রবীভবন' (All that is solid melts into air – Verso, London 1983) -এ গ্রন্থিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। আধুনিক জীবনযাপনে যে বিপুল ঝঞ্ঝাবর্তের সৃষ্টি হয়েছে তার কারণগুলো বারম্যান আহরণ করেছেন নানা ক্ষেত্র থেকে।

এদের মধ্যে রয়েছে পদার্থবিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলি, যা ব্রহ্মাণ্ড ও তার প্রাণীজগতের অবস্থান সম্পর্কে যে ধারণা আমাদের ছিল, তাতে নিয়ে এসেছে আমূল পরিবর্তন। সমস্ত উৎপাদন পদ্ধতির শিল্পায়ন, যার ফলে নতুন একটি পার্শ্বিকতার সৃষ্টি হয়ে ক্ষমতা ও সংগ্রামের নবতর ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়া। এ ছাড়াও রয়েছে বিধ্বংসী নগরায়ণ, জনসংখ্যার বিস্ফোরণ, জনসংযোগের ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তির অনুপ্রবেশ যা ভিন্ন ভিন্ন সমাজকে একসূত্রে গ্রথিত করে, ক্ষমতাবান ও ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্র নির্ভর সরকারসমূহ, এক পুঁজিনির্ভর আন্তর্জাতিক বাজারের সম্প্রসারণ এবং মানুষের নিরন্তর আন্দোলন কায়েমি স্বার্থবাজদের বিরুদ্ধে যাতে তারা নিজেদের জীবনকে ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রণের কিছু অধিকার পায়।

এই আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটি স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে একইসঙ্গে ব্যক্তিগত ও বস্তুগতভাবে নানা ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্যানধারণায় উদ্‌বুদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করেছে। এই সবকেই সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে 'আধুনিকীকরণ' যা মানুষের শাশ্বত ক্রমোন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি পর্যায়। ভারতীয় জনমানসকে এই সব অভিজ্ঞতার আঘাত অনেক দেরিতে স্পর্শ করেছে। কবিতার ক্ষেত্রে এর অনুপ্রবেশ ছিল সশঙ্ক ও অবচেতন। গান্ধীযুগের সমাপ্তি, নবতর রাজনীতিতে জনগণের ক্রমবর্ধমান আশাভঙ্গ, সমস্ত দিক থেকে নৈতিকতার অধঃপতন, স্টালিন নির্দেশিত সাম্যবাদের প্রতি মানুষের আস্থার বিনষ্টি, গ্রামগুলির মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় বৃদ্ধি পাওয়া, নগরকেন্দ্রিক জীবন মানুষের কাছে দুঃসহ হয়ে ওঠা, ঔপনিবেশিক ধাঁচের শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে উত্তেজনার বাতাবরণ সৃষ্টি, ধর্ম এবং আদর্শে মানুষের আস্থার অভাব ও ফলস্বরূপ ব্যক্তিপরিচয় ক্ষয়িষ্ণু হয়ে আসার সংকেত — ইত্যাদির সম্মিলিত ফল হিসাবে কবির মনোজগতে পৃথিবী সম্পর্কে এক নতুন চেতনা রূপ পরিগ্রহণ করতে থাকে, তার সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যের চলতি হাওয়া, বিশেষত মহাযুদ্ধ মধ্যবর্তী ও পরবর্তী বছরগুলিতে, যার পরেই আসে পেপারব্যাক বিপ্লব— কবিদের উৎসাহিত করে তোলে নতুন একটি আত্মউন্মেষের যোগ্য ভাষার সন্ধানে ব্যাপৃত হতে, যা দিয়ে তারা পরিবর্তিত বৌদ্ধিক অবস্থানটিকে যথার্থভাবে প্রকাশ করতে সমর্থ হবে।

এমন নয় যে ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষার ক্ষেত্রেই ঘটনাটি একইভাবে একই সময়ে সংঘটিত হয়েছে।

ঐতিহ্যবিচ্যুত হয়ে যে-সংস্কৃতিগুলো প্রচণ্ড আঘাতে চুরমার



হয়ে গেল, সেগুলি ছিল মূলত সেই সংস্কৃতি যাদের মূল প্রোথিত ছিল জাতীয় চেতনাকেন্দ্রিক দর্শন ও মননে। এই কারণে এইসব সংস্কৃতিভুক্ত অনুভূতিপ্রবণ ব্যক্তিদের ভোগ করতে হল সবচাইতে নিষ্ঠুর আঘাত, যখন প্রযুক্তিনির্ভর সমাজ তার সভ্যতার নির্বিশেষ রূপটি দিয়ে তাদের সপ্রাণ আন্তর্জগতটিকে ধ্বংস করে দিল। আধুনিক ভারতীয় কবিতায় এই প্রথম সূচনা হল মৌলিক আত্মঅভিজ্ঞানের অনুসন্ধান, যখন থেকে আমরা আধুনিক কবিদের পূর্বসূরিদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এলাম।

১

মালয়ালাম সাহিত্যের প্রথম পর্যায়, ভারতীয় অন্যান্য ভাষার মতোই শুরু হয়েছিল ব্যক্তিসত্তার অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে। মালয়ালাম সাহিত্যের প্রধান ঐতিহ্য সেই ষোড়শ শতকের এজুথাককানের মহাকাব্য অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকে রেনেসাঁসের কবি আসান (১৮৭৩-১৯২৪) পর্যন্ত প্রসারিত। ব্যক্তি-অস্তিত্বের সমস্যা তখনও এমনভাবে দেখা দেয়নি। ব্যক্তিক সত্তাকে তখন মনে করা হত বৈশ্বিকসত্তার অংশ অথবা সমাজসত্তার অঙ্গীভূত রূপে। তখন কবিতা ছিল অধ্যাত্মবাদ বা সামাজিক ক্রিয়ার উদাহরণ। ঈশ্বর রয়েছেন স্বর্গে, কবি তাঁর প্রতিনিধি এই পৃথিবীতে। পৃথিবী জৈবপদার্থের সন্নিবেশ মাত্র, সঙ্গতিময় এবং অর্থপূর্ণ। এই ধারণা আসান-পরবর্তী কবি ভিল্লোপিল্লি এবং এডাসেরি পর্যন্ত সত্য হয়ে বিরাজ করেছে। চাঙ্গালপুজা পিল্লাইয়ের মতন কবি (১৯১১-১৯৪৮) ঈশ্বরের সৃষ্ট জগৎ নিয়ে তেমন ভাবিত ছিলেন না। তিনি অনুভব করতেন যে পৃথিবী একটা প্রহেলিকামাত্র এবং মানুষের অস্তিত্বও অর্থহীন। অমঙ্গল, বাজে বিশ্বাস, নশ্বরতা, বিযুক্তি, প্রভৃতি দ্বারা তাঁর কবিতা অশুভ সময়ের তত্ত্ববিদ্যার রূপ নিয়েছিল যা তাঁর মৃত্যুর পরের এক দশকের মধ্যেই আধুনিক মনকে আক্রমণ করেছিল। তাঁর দীর্ঘ আত্মজীবনীমূলক কবিতা 'শয়তানের সঙ্গীত' ধরতে চেয়েছিল নাস্তিক্যবাদী এবং 'স্বয়ম্ভু' মানসিকতার দ্বান্দ্বিকতাকে, অসম তালের ভঙ্গি ও নারকীয় চিত্রকল্পের সাহায্যে। প্রথম পর্যায়ের আধুনিকতার অভিজ্ঞতা অর্জিত হল, ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতনতা, এবং বেরন হল প্রকৃত আত্ম-আবিষ্কারের সন্ধানে। ওই সময়ের বেশির ভাগ কবিই পল্লিজীবনের সারল্যের দিন পার হয়ে হৃদয়হীন নাগরিক পরিবেশে পরিযায়ী পাখির মতন হয়ে রইলেন, কিন্তু শৈশবের সবুজ স্মৃতি হৃদয়ে বাঁধিয়ে রাখলেন। তাঁদের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য শহরের অসংখ্যের ভিড়ে হারিয়ে গেল। শহরের আকাশে ভাসমান মেঘের মতন অবস্থান করলেন তাঁরা, হয়ে রইলেন কেন্দ্রচ্যুত। আয়াপ্পার পানিকর, এ এন কাকাড় এবং মাধবন আয়াপ্পান, সবার কাছে বীরচরিত্রগুলি মৃত বলে পরিগণিত হল। আয়াপ্পার পানিকরের কুরুক্ষেত্রম (১৯৩০) কাব্যকে বলা হয় যে সেখানেই এই খণ্ডছিন্ন



পৃথিবীর প্রকৃত ছবি চিত্রিত হয়েছে। ওই কবিতাটি 'গীতা' থেকেই বিষয়বস্তু বেছে নিয়েছে।

গীতার শুরুতে আছে-

> হে সঞ্জয়, বলো, আমার পুত্রগণ এবং
> পাণ্ডুপুত্রগণ যুদ্ধের জন্যে কুরুক্ষেত্রে সমবেত
> হয়ে কি করছে।

এই পুরনো প্রশ্নটিই মোহমুক্ত এক অন্ধ মানুষের চিরাচরিত প্রস্তাবনার আকারে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের মানবীয় উৎকণ্ঠারূপে উপস্থাপিত হয়েছে পানিকরের এই কবিতায়।

কবিতাটির প্রথম পর্বে অর্জুনের মানসিক যন্ত্রণাই যেন আধুনিক মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করেছে। হ্যামলেটের ভয়তাড়িত চিত্ত-চাঞ্চল্য প্রকাশের মতোই এখানেও অর্জুন বলছেন, 'আমি কে? কে আমার বন্ধু, কেই বা আমার শত্রু পৃথিবীতে? আমার অদৃষ্টেই বা কী হবে?'

এই সব প্রশ্নের ভিতর, দ্বিতীয় স্তরের প্রশ্ন ইংগিত করছে যে দার্শনিক চিন্তাধারায় এর উত্তর নেই।

তৃতীয় পর্যায়টি প্রচলিত নৈতিক মানদণ্ডকে জড়তাগ্রস্ত, অবাস্তব বলে পরিত্যাগ করেছে অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনা-প্রতিভার সমন্বয়ের মাধ্যমে। চতুর্থ প্রশ্নটির প্রকাশে আমরা দেখি অস্তিত্বের ছায়াময়তাকে বুঝে নিতে অতিপ্রাকৃতের কাছে আত্মসমর্পণ, যা আমাদের অলক্ষেই থেকে যায়। পঞ্চম পর্যায়ে এমনকী বিস্ময়ের জগৎকেও ত্যাগ করার প্রয়াস দেখি। উত্তেজনায় ভরা আত্মমগ্ন গীতিকবিতাটিতে শেষ পর্যন্ত আনন্দ অনুভব করা যায় তখনই যখন আত্মমগ্ন ব্যক্তিমানসের সান্ত্বনার স্থল খুঁজে পাই। বাজারের সেই চিত্রটি যেখানে 'নিজেদের আমরা কিনছি ও বেচছি'; যেখানে 'হাড় শুষে খাচ্ছে মজ্জাও', যেখানে 'চামড়া লেগে আছে হাড়ে' ইত্যাদি মৌলকেন্দ্রস্বরূপ দেখানো হয়েছে কবিতাটিতে। এটা শুধুই কবির সেই রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে শয়তানিতে ভরা প্রকাশভঙ্গি মাত্র নয়, এটা হল ধনতান্ত্রিক পৃথিবীর নিষ্ঠুর মরীচিকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা, যেখানে মানুষ পরিণত হয় শুধু বস্তুতে, এবং মানসিক চেতনাকে উদবেগে, বুদ্ধিনাশ করে হটিয়ে দিচ্ছে। আত্মব্যবচ্ছেদের আকস্মিক তীব্র যন্ত্রণাবোধ কবির শ্রমবিযুক্ত মনের অবস্থাতে স্বাভাবিক ক্রিয়া, যার জন্ম হয়েছে বিশ্বাসের প্রগাঢ়তার বদলে পাথুরে যুগের উপস্থিতি অনুভব করে, যেখানে পুরোহিতের আদেশ অন্ধকারের পোশাকে ঢাকা।

গীতা এই চলমান সময়ের দাবি মেটাতে ব্যর্থ; চাণক্যের বুদ্ধিকে একটি কুশও উপহাস করে, ঈশ্বর যান ঘুমোতে, আদর্শগুলো যুদ্ধ আর অশ্রুর ইতর কর্কশ শব্দ বলে মনে হয়।

আয়াপপা পানিকরের পুরুরবা, প্রমিথিউসের মতন এক আর্ত আত্মা, যে চাইছে আগের মতোই স্বার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ গড়ে তুলতে,

উর্বশীর সঙ্গে সঙ্গে জাতিত্বের সাহায্যে, কিন্তু এখন সে গন্ধমাদনে হামাগুড়ি দিচ্ছে। পুরুরবা হল আধুনিক যুগের মানুষের এক বিচ্ছিন্ন সত্তার প্রতিভূ, যে তার হারানো স্বর্গ খুঁজছে, যে স্বর্গ মানুষ ও প্রকৃতিকে নির্দেশ করে। 'মৃত্যুর প্রতি কবিতা' নামক কবিতাটিতে কবি ভবিষ্যতের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন ভূতের মতন। 'মৃতরাই সাধুসন্ত, আর পৃথিবীটা একটা শূন্যগর্ভ কিংবদন্তি মাত্র।'

ইতিহাস হল 'শুধু বেড়াল আর ইঁদুরের প্রাণ বাঁচানোর খেলা।' আগ্রাসী ইতিহাসের গন্ধগোছায় শুধু শীতল মৃত্যুই আমাদের সান্ত্বনা উপহার দেয়। কবি সীতার মতোই পৃথিবীমায়ের কাছে আশ্রয় চান। কবির শুধু আশা, শেষ পর্যন্ত তাঁর বুকের উপর রাবণের নাচ, সীতাকে প্রাকৃতিক সুড়ঙ্গ থেকে তুলে আনবে।

পানিকর তাঁর 'বংশাবলী' কবিতায় আত্মপরিচয় লাভের জন্য নিজের বংশাবলীর ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। কিন্তু তিনি দেখেছেন যে তাঁর কীর্তিমান পূর্বপুরুষেরা বর্তমান প্রজন্মের জন্য সামান্য গৌরবই রেখে গেছেন। 'তারা পাশের বাড়ির ক্ষুধার্ত মেয়েটির পেট ভরাতে পারে না।' 'মানুষের আত্মাকে কতকগুলো নিরর্থক শ্লোগান দিয়ে ভাজা ভাজা করে চলেছে।' 'দিন রাত্তির' কবিতায় কবি মানুষের আত্মাকে আহবান করা 'ব্যর্থ প্রচেষ্টা' বলে এবং অতিসাধারণ কৌশল বলে মনে করেছেন।

এই ধরনের ভাঙাচোরা অনস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যাবে এন. এন পানিকরের কবিতা 'পার্কের ভিতরে' এবং '১৯৬৩' কবিতায়। 'পার্কের ভিতরে' কবিতায় কবি লক্ষ করছেন এক যক্ষ বেতালের পিঠে চড়ে তার প্রাসাদে প্রবেশ করছে যা কিছু সুন্দর তার রক্ত শুষে খেয়ে। কবি দেখতে পেলেন যে তাঁর সত্তা একটি ছিন্ন ফুলের মতন মাটিতে পড়ে আছে, আর জনতা তাকে পায়ে মাড়িয়ে যাচ্ছে, যখন শহরে সন্ধ্যা রঙিন বুদ্ধ বারাঙ্গনার মতন নেমে আসছে। '১৯৬৩' কবিতায় তিনি পেছনের দিকে চেয়ে অনুসন্ধান করতে লাগলেন স্রোতের স্বচ্ছ জলে তাঁর অস্তিত্বের মূলকে।

রবি বর্মা নিজেকে কালিদাসের 'মেঘসন্দেশ' কাব্যের নির্বাসিত যক্ষের সঙ্গে শনাক্ত করেছেন তাঁর 'শহরে এক যক্ষ' কবিতায়। 'নিজের জন্যে' কবিতায় তাঁর স্বাতন্ত্র এ ভাবে আবিষ্কার করেছেন: 'যখন সব বাড়িগুলি পশ্চিমমুখের/ আমারটা পুবের দিকে মুখ করে ;/ যখন সব ছেলেদের একজন করে চমকদার মা রয়েছে/ আমার সেখানে অন্ধকার ও অসুন্দর বিরাজ করছে/ যখন সবাই হাঁটছে দ্রুততালে/ আমি সেখানে আলস্যমন্থর/ যখন সবাই হাসিতে ফেটে পড়ছে/ আমি সেখানে নিশ্চিতভাবে দুঃখে রয়েছি।' বিষ্ণু নারায়ণ নাম্বুদিরি খুব শঙ্কিত হয়ে পড়ছেন যখন দেখতে পেলেন একটি উৎসব মিছিল তাঁর শিল্পী বন্ধু পরিচালনা করছেন, যাদের ঘাড়ে মাথাই নেই। তিনি আড়াল থেকে শুনতে পেলেন, মিছিলের নেতারা একে অন্যকে চুপিচুপি বলছেন, 'তোমার মাথাটা কোথায়?' তার পর কবি নিজেই ছুটে গেলেন আয়নার সামনে, দেখে অত্যন্ত আঘাত পেলেন যে সার্টের কলারের ওপর তাঁর মাথাটাও নেই। (মাথাটা কোথায়?)

এম. এন পালুরের কাছে ঈশ্বর হলেন সেই সুলতান যিনি হাড়গুককনা মানুষের জীবন পাইপে ঠেঁসে ধুমপান করছেন (কাপুরুষ!) তিনি নিজেকে একজন বিদঘুটে কবিরূপে শনাক্ত করলেন, যিনি ধুমকেতু আর উড়োজাহাজের এনাসিন সেবন করে জীবন কাটাচ্ছেন। (বিমানঘাটিতে একজন কবি।)

মাধবন আয়াপ্পাথ শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ভাবছেন- 'কে আমার চোখের জল চুরি করে সুদৃশ্য বাক্সে জমিয়ে রেখেছে?' (আত্মজীবনীমূলক ভাবনা)। তিনি নিজে দেদুল্যমান নিঃসঙ্গ মানুষ, যে মরাসাপের পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে ঘড়ির কাঁটাকে পেছনে ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করছেন (বিবাহবাসরে)।

ষাটের দশকের কবিরা সময়ের চরিত্র রূপ দেবার জন্য নতুন ভাষারীতি আনলেন। 'কুরুক্ষেত্রম' মিশ্র পর্বে রচিত গদ্যছন্দের কাব্য যেখানে চমকে দেবার মতন চিত্রকল্প ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন দোলনায় শব শুয়ে আছে, যেন জীবনে প্রবেশের জন্য অপেক্ষমাণ।আবার এখানে পরিহাস বা বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিকে একটা প্রধান স্টাইলের শৈল্পিক চেহারা দেওয়া হয়েছে। যেমন এই লাইনটিতে বলা হয়েছে -

'বৈদিক পাণ্ডিত্যকে কি রাঁধবে?
মশলা দিয়ে আমাদেরই কি ভাজা হচ্ছে?'

অথবা 'যে নতুন স্বপ্নের কথা ভাবি আমরা তা কি কোনও দিন সত্যে পরিণত হবে? বিশ্বব্যাঙ্ক কি আসল সত্য জানে?'

মাধবন আয়াপ্পাথ গদ্য ছন্দকে মিশ্রণে নিয়ে যানিন, গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন ইংরেজি ও সংস্কৃত উদ্ধৃতির ব্যবহারে। এম গোবিন্দন বলিষ্ঠ ছন্দ ব্যবহার করেছেন, অনুপ্রাসনির্ভর বাক্যগঠন করেছেন, মালয়ালাম সারবান সংক্ষিপ্ত প্রবাদ এবং শিশুদের ছড়ার প্রয়োগ করেছেন অর্থময় এবং অর্থহীন বিষয়ের অদ্ভুত সীমানাকে অতিক্রম করবার জন্য। একটি দৃষ্টান্ত, 'একটি ফেলে যাওয়া চিতাবাঘ এক আঁটি ঘাস খেয়েছে।' ইত্যাদি।

শব্দ নিয়ে যখন তখন খেলেছেন তাঁরা। যেমন পানিকরের 'চোর' কবিতা; তাতে রয়েছে 'আমি যখন শুধুমাত্র চোরই ছিলাম তখন তুমি কি আমাকে দস্যু বলে সম্বোধন করোনি?' অথবা 'ইন্দন' কবিতায় এ ভাবে বলা হয়েছে, 'আমাদের পিতৃব্য ইন্দন ডান পা দিয়ে বাঁ পাকে ঘষতেন, আবার বাঁ পথা দিয়ে ডান পাকে, এবং তার বীর ....।' ইন্দন হয়ত একজন ভারতীয়, যার নামের আদ্যক্ষর অবলুপ্ত বা যে পরিচয়হীন; ডান ও বাঁ পায়ের ব্যবহারের উল্লেখ হয়ত সমকালীন রাজনীতির ছায়া। কুঞ্জুন্নির লিমেরিক



জাতীয় কবিতা আমাদের সময়ের ফাঁপা মানুষকে নিয়ে হেসেছে।

আমাকে একটা দেশলাই দাও/ একটা বাক্স দাও/
একটা বিড়ি দাও, একটা আঙুল, একটা ঠোঁট
দাও/ আমি ধোঁয়া ছাড়বার আনন্দ পাই।

অথবা

আমার ছেলে ইংরেজি শিখবে জন্ম মাত্রই,
আমি ইংল্যান্ডে আমার স্ত্রীর সন্তান
প্রসবের ব্যবস্থা করব।

সত্তরের দশকে তলে তলে একটি বেগবান পরিবর্তনের ধারা বইতে লাগল। কারণ সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়ের একটি নিজস্বতা অর্জন সামনে চলে এল কিন্তু শেকড়ের অনুসন্ধান চলতে লাগল। রাজনীতিতে এল স্পর্শকাতরতা যা পরিবেশ-পরিস্থিতি গড়ে তুলল, পেছনে কাজ করল ভারতে নতুন এক বামপন্থী শক্তির উত্থান, যেমন মহারাষ্ট্রে নিচুতলার মানুষের আত্মজাগরণ, যেমন দলিত-আন্দোলন, কর্ণাটকের বান্দা আন্দোলন, ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী ও নারী জাগরণের আন্দোলন, মূলাভিমুখী রাজনৈতিক উত্থান আফ্রিকায় লাতিন আমেরিকার মতো দেশগুলোতে : তা ছাড়া কবিতায় রাজনৈতিক চেতনার সফল প্রয়োগ, বিশেষ করে আধুনিক কবিতায়। মায়াকোভস্কি, লুই আরাগঁ, পল এলুয়ার, পাবলো নেরুদা, বেরটোল্ট ব্রেখট, নাজিম হিকমত, সেজার ভালেহো, নিকোলাস গিলেন, লিওপাল্ড সেঙ্গার প্রভৃতি কবির রাজনৈতিক চেতনাপূর্ণ কবিতা মালয়ালাম ভাষায় এই দশকজুড়ে অনুবাদের জোয়ার বইয়ে দিল। আরও পরিষ্কার করে বলা ভাল, তৃতীয় দুনিয়ার কবিতা বেশি অনুপ্রাণিত করল, নিকানো পারার 'অ্যান্টি পোয়েট্রি', নেরুদার ইমপিওর পোয়েট্রির চেতনা বিশেষ ভাবে। আমেরিকার বিট্‌ল্ এবং ব্রিটেনের গুপ্ত কবির দল পরোক্ষে প্রেরণা দিল।

এটাকে কোনও দুর্ঘটনা বলে মনে করা যায় না, কবি কে.জি. শংকর পিল্লাই-এর নতুন করে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরুর কথা, বেঙ্গল (১৯৭২) কাব্য-প্রকাশ থেকে। যাকে বাতিল বলে মনে করা হত, সেই ভয়ংকর শ্রেণীসংগ্রামের প্রতীকী কবিতার আবির্ভাব হল তখন। কবিতাটি ধৃতরাষ্ট্রের স্বগত কথনের ভঙ্গিতে রচিত। অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র যিনি প্রভুত্ববাদী শ্রেণীর প্রতিনিধি স্বরূপ, একটি আসন্ন সিংহাসনচ্যুতির দুঃস্বপ্ন দেখে তার দ্বারা তাড়িত হলেন।

এই খরগ্রীষ্ম অদ্ভুত এক ভয়ে ভরে দিচ্ছে আমার মন
যদিও ঈষৎ ঠাণ্ডা বাতাসও বইছে,
শুকনো পাতারা গর্জন করবে,
ঝঞ্ঝা উঠবে অকস্মাৎ, ধ্বংস করে দেবে
সেই সব পাহাড় যারা
পথ রোধ করে আছে।

মহারাজ অত্যন্ত বিচলিত বোধ করছেন, কারণ তাঁর জ্ঞাতিকুটুম্বরা রয়েছেন বাংলায়, বাংলা এখন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে; সেখান থেকে কোনও সান্ত্বনাদায়ক খবর আসছে না। পবিত্র গঙ্গা থেকে জেলেদের জালে উঠে আসা সেই সম্রাটের কাটামুন্ডুটির মতন তার ভাগ্যও হতে পারে ভেবে তিনি ভীত। এই ভীষণ গ্রীষ্মের সূর্য যেন তার শবদাহের আয়োজন করেছে, মনে হয়।

যাকে উদ্দেশ করে এই আত্মকথন, তিনি সেই সঞ্জয়, বুদ্ধিজীবী, যিনি নতুন যুগের আগমনবার্তা অনুভব করতে পেরেছিলেন আগেভাগেই।

এই নির্মম সত্যই অন্ধরাজকে বিদ্ধ করে: আমার দৃষ্টি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে, এখন থেকে আমি কেবলমাত্র ওই কামরার অন্ধকার ভেতরটা এবং তার পাশের জানলা দিয়ে দেখা যায় যে মৃত্যু উপত্যকার হাতছানি, ক্ষীণ স্রোতস্বিনী ও ভোঁড়ার পাল, সব আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে, শুধু মৃতের বিস্ফারিত চোখ অশোক চক্রের মতো। কেবল আমার সন্তান হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে আছে, আর ওই গান্ধীটুপির বাঁকানো পিছনের অংশ। বাঁদিকের জানালা দিয়ে ওই দেখা যায় সমুদ্রের পরিত্যক্ত বেলাভূমি যার উপর ইতস্তত ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মৃতদেহ। ওই উপসাগর ও আলোকস্তম্ভ, যেখানে আর কোনও প্রহরী নেই জেগে, কেবলমাত্র সেই প্রাচীন নাবিক রয়েছে বিনিদ্র। আছে উটগুলির যন্ত্রণাদায়ক উপস্থিতি। শতাব্দীর ধুলি গহবর থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলে উঠে আসছে খোলা ঝকমকে তলোয়ার হাতে।

আগামীদিনের কবিতাকে দিশা দেখাবার রসদ রয়েছে 'বাংলায়'। কুরুক্ষেত্রের ধূ ধূ প্রান্তরে দেখছি—মৃত্যু-সহচরী এক অন্ধগায়িকা, যার গান সঞ্জয়ের কথায় বেজে উঠছে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের তরুণ কবিদের কবিতাকে বিদ্যুৎস্খলকের মতো জ্বলে উঠতে করছে অনুপ্রাণিত, পূর্বসূরিদের পেছনে ফেলে এগোচ্ছে তারা। 'বাংলা' আগামী দিনের কবিদের পথের দিশারী হবে, কারণ, কবিতাটির নাটকীয়তা, বর্ণনাধর্মিতা, ছন্দচর্চা এবং যতিপাত-রীতি, রাজনীতি ও ইতিহাসের কাব্যিক মিশ্রণ, অন্ধকারের ভীতি প্রত্যক্ষ করে তুলেছে।

শংকর পিল্লাইয়ের 'আনন্দন' কাব্যগ্রন্থ, মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছিল। 'নৈঃশব্দ' গ্রন্থে গৃহস্থ জীবনের নিঃশব্দ বিস্ময়ের প্রতিফলন ঘটেছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী প্রজন্মের যে ঘৃণা ও ক্রোধ নিষ্প্রভ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও ধিকধিক করে জ্বলছিল, তার বিরুদ্ধে প্রবল ঘৃণা ও উষ্মা প্রকাশ পেয়েছে এই কাব্যে। কবি কাদম্মনিত্তা রামকৃষ্ণকালের কবিতা, 'শেষ ছবি', কিরাতীকুরাতীর গল্প প্রভৃতি কবিতায় ভারতীয় জীবনের প্রান্তিক মানুষ, যারা উন্নয়নের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত

রয়েছে, তাদের হতাশা, ক্ষোভ ইত্যাদি ভাষা পেয়েছে। 'আমার ছেলেকে' কবিতায় কবি তাঁর সন্তানকে সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠার জন্য আবেদন জানিয়ে বলছেন, সে যেন তার বাবাকেও এই আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধনের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে চন্দন গাছের মতন পাথর ফাটিয়ে উর্ধ্বমুখে উঠতে সাহায্য করে। এ রকম আর একটি কবিতায় কবি একজন তিনি দুধের শিশুদের উদ্দেশে বলছেন, বিষাক্ত পুতনার ঘেরাটোপে যেন তারা আবদ্ধ না হয়। শাকাৎসুরা আজও বেঁচে আছে হাজার চক্রের মধ্যে, তার থেকে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে আর কালিন্দীর জল তাতে বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে।

আতুর রবিবর্মা 'transmutation-এ স্বপ্ন দেখেছে, এক মৃত পরিচারিকা ভীষণভাবে বদলে গিয়ে প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠেছে। সে ছিল একটা মাটির ঢেলার মতন, ঝাঁটার কাঠি, বা পুতিগন্ধময় ঘরপোছার ন্যাতার মতন। কবি আকুলভাবে চেয়েছেন, তাকে মুক্ত করতে ওই জীবন থেকে আর ক্ষুধার্ত বাঘের সঙ্গে তাকে বিঁধে দিতে। শিকারের চারপাশে ঘুরে বেড়ানো ক্ষুধার্ত নেকড়ের গলায়, বেঁধে দিতে চান তার মেয়ের রসনাকে।

'তার খিদে কি আমি বনের আগুনে রাখতে পারি/ যে আগুন পরিব্যপ্ত হয়ে শহর ও সম্পদকে জ্বালিয়ে দেয়, আর সেই সঙ্গে তার যন্ত্রণা/পড়ন্ত আকাশ থেকে পড়ে টপটপ করে পুঁজ আর রক্ত/আর আমি কি পারি তার অভিশাপে সূর্যকে প্রেরণা দিতে যে সে যেন উর্বরা শস্যখেতকে ঝলসে দেয়?'

যাই হোক, কবি এম. গোবিন্দন তাদের তিরস্কার করেছেন যারা 'বুদ্ধ'কে নির্বাসন দিয়ে মাও-এর রেডবুক উঁচুতে তুলে ধরেছেন। 'কুরুক্ষেত্রে ফিরে যাচ্ছি', 'জীবণে মরণে' প্রভৃতি কবিতায় তিনি স্বপ্ন দেখেছেন খাঁটি দেশীয় পদ্ধতিতে বিপ্লবের সম্ভাবনার 'গরল সঙ্গীত বিদায়' প্রভৃতি কবিতায় তিনি করেছেন বিদ্রুপে বিদ্ধ করার এক স্বদেশি শক্তিশালী প্রয়াস। 'বিদায়' কবিতায় দেশের মানুষ গান্ধীকে 'এয়ার ইন্ডিয়ার' প্যাকেটে পুরে এমন ভাবে বিদায় জানিয়েছেন, যাতে তিনি কোনওদিন শহিদ হয়ে দেশে ফিরে আসতে না পারেন।

১৯৭৫-এর জুলাই-এ আমাদের দেশে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা ঘোষিত হবার মাঝখানেই মালয়ালাম সাহিত্যের আধুনিক কবিতায় এমন এক প্রতিরোধী রচনাশৈলীর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে, যা যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে গণ্য হতে পারে। সত্তরের দশকে মালয়ালাম কবিতা যখন ব্যক্তিগত সংস্কার থেকে মুক্ত হতে যাচ্ছে, তখন থেকেই গীতিকবিতা থেকে নাটকীয় চরিত্র অর্জনের প্রবণতা প্রাধান্য পেতে শুরু করেছে। ঋজু ও স্বচ্ছ গদ্য ভঙ্গিই তখন স্বাভাবিক ও উপযুক্ত মাধ্যমরূপে গৃহীত হল। এই সময়ে কবিতা আলংকারিক রীতি ও বিদ্রুপাত্মক চরিত্র থেকে বাইবেলীয় সংলাপ ধর্মিতা ও গদ্যভঙ্গিতে চর্চিত হতে শুরু করল। ব্যাজস্তুতিতেও রাজনৈতিক বিষয় উঠে এল। সেই সময়ে বিরুদ্ধ প্রকাশের দিনগুলোতে এম. গোবিন্দন প্রার্থনা করছেন ঈশ্বরের কাছে, যদি কেউ তাকে 'শব্দ' এবং 'মাথা' এ দুটোর মধ্যে একটাকে পছন্দ করতে নির্দেশ দেয় তবে ঈশ্বর যেন তাকে নরকে স্থান দেন। কবি আয়াপ্পা পানিক্কার, সেই জরুরি দিনগুলির সময়কালীন প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন প্রকল্পগুলোকে গাছের শরীর থেকে বেরনো কটু তরল বিষের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

হে আমার প্রিয় জননী,
তুমি আমাকে মেরো না
আমি এই তরলরস পান করব
সবুজ শাদা ও লালরঙের।

তাঁর 'প্যাসেজ টু আমেরিকা' কবিতায় মহাদেশের মানচিত্রকে তুলনা করেছেন হাতের তালুর সঙ্গে, যেখানে আছে পাহাড়শ্রেণীর রেখাঙ্কন, নেই হৃদয়ের মানচিত্র। আতুর রবিবর্মা তাঁর মহাবিদ্যালয়কে দেখেছেন ক্যান্সারে ক্ষয়িষ্ণু শরীরের মতো যে শরীরকে শল্যচিকিৎসকও রোগ সংক্রমণ থেকে মুক্ত করতে পারবে না।

আধুনিক মালয়ালাম কবিতার তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে সামাজিক-রাজনৈতিক অভিন্নতার অন্বেষণ। এই পর্যায়ে কবিতা নিল একটি নতুন বাঁক, যেখানে আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্য এবং ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য রূপ পেল নতুন ভাবে। আঞ্চলিক ভাষা-রীতি হয়ে উঠল প্রভাবশালী। 'একটি লোক শহরে কাজ করবার জন্য গ্রামের আম জাম গাছ ও চাঁদের আলো ছেড়ে চলে যায়। তারপরে সে যে হোটেলে কাজ করত তার খদ্দেরদের রসনাতৃপ্ত করবার জন্য নানারকম খাবার বানিয়ে বেশ কিছু বছর কাটিয়ে দেয়। কিন্তু তার মনকে তার পল্লির সৌন্দর্য মাঝে মাঝেই টানতে থাকে, যদিও হোটেলের রান্নাঘরের বিশ্রীগন্ধ, বাসনপত্তরের ঠনঠন আওয়াজ তার আবিষ্ট-অনুভূতিকে গুলিয়ে দিতে থাকে। একদিন, সেই হোটেলের মালিক তার চেয়ারে বসে থাকা অবস্থাতেই মারা গেল। এই ঘটনায় অভ্যস্ত জগৎটা হারিয়ে ফেলল তার প্রাচীন সৌগন্ধ। পুরনো খদ্দেররা হোটেলে আসা বন্ধ করে দিল। নতুন নতুন খদ্দের আসতে লাগল, এল নতুন পাচক ও ভৃত্য, এল খাদ্যের নতুন তালিকা। ফলে, লোকটি মানাতে না পেরে, তিরিশ বছর পর ফিরে এল নিজের গ্রামে। এসে দেখল, তার পরিচিত আত্মীয়, প্রতিবেশী বা বন্ধুরা আর নেই। সেই পুরনো গাছ পালা পশুপাখি তাকে চিনতে পারল না। নির্জন পাহাড়, শুকনো নদী আর স্থির শান্ত তারাগুলি এতদিনে তাকে ভুলেই গেছে। সে তখন সে কী হারিয়ে ফেলেছে সেই সব মনে করবার চেষ্টা করে। আর তখনই সে শুনতে পায় মন্দিরের ঢাকের বাদ্যি।



সে তখন বুঝতে পারে যে সব কিছু হারিয়ে যায়নি। সে খুঁজে পায় নিজেকে।' এই কবিতায় উল্লিখিত মানুষটি কবিরই দ্বিতীয় সত্তা বলা যায়। হোটেলের পরিবর্তনগুলো কবিতায় অনুভবের পরিবর্তনকে বোঝাচ্ছে। কবিতার ইংগিত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয় যে এমন কিছু বিষয় আছে যা চিরদিন টিকে থাকে এবং নিরন্তর এগিয়ে চলতে থাকে।

আশির দশকে এসে মালয়ালাম কবিতার আধুনিক ধারা আশু-বিপ্লবের মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে এবং প্রবেশ করে অন্তর্মুখীনতার বিশেষ পর্বে। কবিরা আর আগেকার আত্মমগ্নতার তাড়নার দিনগুলোতে ফিরে যেতে চাইলেন না, বরং অঞ্চল ভিত্তিক সমবেত অবচেতনার গান শোনাতে আগ্রহী হলেন। এটা হল তাদের সংবেদনার-উপনিবেশবাদ থেকে মূলে ফিরে আসার প্রয়াস, অবশ্যই নতুন উপলব্ধির প্রয়োজনে। বর্তমান লেখকের সংকলিত কাব্য সংকলন Nervazhikal -এ ছ'জন কবির কবিতার উপস্থাপনের মাধ্যমে আধুনিক মালয়ালাম কবিতার এই আঞ্চলিক-স্বকীয়তাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলা হয়েছে যে বিশেষ অঞ্চলের সংস্কৃতির স্বকীয়তা (অভিন্নতা)-কে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। অন্যদিকে, আঞ্চলিক সংস্কৃতি হল ভারতীয় সংস্কৃতির নির্ভরযোগ্য ও জীবন্ত স্বরূপ, যা সংবাদমাধ্যমগুলিতে প্রদর্শিত এবং অপ্রামাণিক সংবাদ সংগ্রহ-দৃশ্য থেকে আলাদা চরিত্রের। এখানে আরও বলা হয়েছে যে উপনিবেশিকতার বিরোধিতা এবং জাতীয় গণসংস্কৃতির উন্নয়নই কেবলমাত্র ভারতবর্ষের আপামর জনতাকে ঐক্য-সংহতি দিতে পারে। একই সঙ্গে এ ভাবে সতর্কীকরণ করা হয়েছে যে মৌল-জাতীয়তাবাদ কখনও সাংস্কৃতিক পুনরুত্থান হতে পারে না এবং আত্ম-শনাক্তকরণ-এর সন্ধানকে অতীতের মহিমা উপলব্ধির প্রভাব ভাবাও ঠিক হবে না।

প্রকৃতিগত কারণেই কেরলের সংস্কৃতি বহুজাতিক চরিত্রের, বহুধর্মেরও বটে। তার উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত সম্পদ হল নিচুতলার সংস্কার আন্দোলন, তার অনুসারী জাতীয় এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন। আঞ্চলিক ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার করার গভীর ভাবনায় আমাদের উদ্দীপ্ত হওয়া প্রয়োজন ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির হাত থেকে বাঁচবার জন্যই। এ কালের নতুন কবিতা সমস্ত আন্তর্জাতিক ও ভারতীয় উপাদানগুলোর হাত থেকে নিজেকে ছোঁয়াচমুক্ত রাখতে পারে না এবং তার কোনও প্রয়োজনও নেই। বরং সে সব উপাদান নিজসংস্কৃতির সমৃদ্ধির জন্য দরকার। তবে তা অবশ্যই নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা ও আবিষ্কারের সম্মুখীন হবে। এর মধ্যে অবশ্যই প্রবলভাবে প্রতিফলিত হবে আমাদের জাতীয় লোকায়ত ঐতিহ্য এবং সমকালের আশা উদ্দীপনা নিজ নিজ উপলব্ধিকে প্রকাশের জন্য উপযুক্ত আঙ্গিকে বা রচনা প্রকরণের মাধ্যমে।

আশি—নববুইয়ের প্রথম দিকের কবিতায় এই সব সাধারণ ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। কেরালার বিশেষ চরিত্রসম্মত বিষয়বস্তুর অভ্যুত্থান ঘটেছে এ সময়ের কবিতায় যদিও সংকীর্ণ অর্থে তা জাতিকেন্দ্রিক হতে পারেনি। কে. জি. শংকরপিল্লাইয়ের কবিতা 'কদমবনে কদমগাছ নেই' কে উদাহরণ রূপে ধরা যেতে পারে। কবি তাঁর গ্রামের নাম বলতে বুঝিয়েছেন, 'কদম্বনাড়ু' হল কদমের দেশ। তাঁর মা তাঁকে বলছেন, যে কোষ্ঠী অনুযায়ী তাঁর বিশেষ গাছ হল কদম্বগাছ। তিনি তাঁর বিশেষ গাছটিকে খুঁজছেন, কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন কালিন্দী নদীর তীরে অবস্থিত একটি কদমগাছকে। কিন্তু তিনি নিজ গাঁয়ের কোথাও তাকে দেখতে পাচ্ছেন না। অনেক বছর পরে তিনি একবার শহরে গিয়েছেন এবং দেখতে পেলেন একটি পার্কে বিশাল নীল কদম গাছ। সে যেন নির্জীব, চিন্তাহীন এক বৃদ্ধ পুলিশের মতো দাঁড়িয়ে আছে, তার বুকে ঝুলছে নামগোত্রবিহিন একটি টিনের চাকতি। কবিতাটির চূড়ান্ত মুহূর্তের শেষে এই ইঙ্গিত পাই আমরা যে এই সময়ে আমরা আমাদের আত্মগরিমা আবিষ্কার করছি, যার ইতিমধ্যেই বিকৃতি ঘটেছে, হয়েছে নির্বাসিত এবং বার্ধক্যজর্জরিত। 'কোচিন এবং বৃক্ষরাজি' কবিতায় শংকর পিল্লাই কোচিন এবং বৃক্ষরাজির রূপান্তরের প্রতীকে কেরলের সংস্কৃতি কীভাবে খণ্ডাংশে পরিবর্তিত হয়েছে, তারই ব্যঞ্জনা দিয়েছেন, মনে হয়। রাস্তাগুলোর দু'ধারে যে গাছগুলো রাজকীয়ভাবে এতকাল দাঁড়িয়ে থেকে টিপুসুলতান, ভাস্কো ডা গামার আসবার আগে থেকেই পথচারীদের ছায়াদান করে আসছে তারা যেন কেরালার সেই বিস্মৃতপ্রায় অতীতকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, সেই অতীতকে যেখানে জীবন ছিল সরলতায় পূর্ণ, বিশ্বাসে দৃঢ় ও সামঞ্জস্যে ভরা। পরবর্তীকালে ওই গাছগুলিই, উপাস্য দেবতা, আলোকস্তম্ভ অথবা মঞ্চ রূপ ধরে বস্তুভারাক্রান্ত যুগকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল এখানে। কবির উত্তরসুরিরা হারিয়ে যাওয়া সবুজতা ও তার সুর ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু গাছগুলোর স্থানে যে কারখানার চিমনি বসেছে তার ধোঁয়ায় তাদের পদচিহ্ন যাচ্ছে হারিয়ে। কবিতাটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে ধোঁয়াশার এক ভয়াবহ চিত্রে, সে ধোঁয়া গ্রাস করছে সব কিছুকে, এমনকী কবির দৃষ্টিশক্তিকেও : নানা ছুতোনাতার জ্বালানিকাঠের জ্বলন্ত চিতায় আমাদের জীবনভর পুড়তে থাকা।

কবি ব্যাজস্তুতির মাধ্যমে শেষ পর্বে বলেন :

'উঠে দাঁড়াবার জন্য তাড়াহুড়ো করো না। তার জন্য অনেক সময় পড়ে আছে।'

তাঁর সাম্প্রতিক কবিতা, যেমন 'বিচিত্র ভঙ্গির আলোক চিত্র' দর্শক, ঘোড়াগুলো গাধার মতন আচরণ করছে পাখিদের ডেকো না, যদি পারো এই ভাবে খেলো; আবৃত আকাশ' এ তিনি কেরালার

জনজীবনকে গভীরভাবে দেখেছেন, যে জীবন বাণিজ্যমুখী সংস্কৃতি, প্রচারমাধ্যমের বিপুল আক্রমণের মাধ্যমে উত্তর আধুনিক পর্বের সমালোচনা করে চলেছে।

কবি সচ্চিদানন্দ, 'প্রত্যাবর্তন', 'বদলে যাচ্ছে সংসার', 'ধ্বংসস্তূপের ভিতর দিয়ে মহাবলী হেঁটে যাচ্ছেন' প্রভৃতি কবিতায় আবিষ্কার করতে চেয়েছেন, কী হারিয়েছে, প্রকৃতির মধ্যে অবিনশ্বর হয়ে আছে কোনগুলো, এবং কেরালার সংস্কৃতি এজুথাক্কান থেকে ভিলোপিল্লি, কেরালার মালয়ালাম ভাষা, তার কিংবদন্তির নায়ক পজ্বাশি রাজা থেকে শ্রী নারায়ণগুরু, ধান, নারকেল, লংকা জাতীয় উদ্ভিদ, কেরালার প্রকৃতির বিশেষত্ব সমূহ; ইতিহাস, সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিয়ে কাজ করে চলেছেন।

নারী কবি বিজয়লক্ষ্মী, সাবিত্রী রাজীবন, ভি. এম গিরিজয়া, অনীতা টাম্পি, গীতা হীরণ্যন, এবং অন্যান্যরা প্রকাশ করে চলেছেন সার্কাসে আবদ্ধ পশুর মতন নারীর গৃহবন্দি জীবনের পোষ মানানো অবস্থাকে ;রূপ দিয়েছেন কবিতায়। রান্নাঘরের সরঞ্জামের মতো মেয়েদের যন্ত্রে পরিণত করে দয়ার অথবা শক্তির আদর্শ হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টাকে মালয়ালাম কবিতায় তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের মাত্রা এনে দিয়েছে। এখানে লিঙ্গভিত্তিক ব্যক্তিত্ব তার স্থান করে নিয়েছে। কোনও কোনও সময় নিজেকে খুঁজতে গিয়ে পৌরাণিক কাহিনি ও রূপকথাকে ব্যবহার করেছে। বিজয়লক্ষ্মীর 'কৌশল্যা', যযাতির প্রতি, অথবা 'ছুতোরের মেয়ে', 'সাবিত্রী চন্দ্রিকা' কবিতায়, ওই চরিত্রগুলোর সম্ভাবনাকে নতুন করে অনুসন্ধান করেছেন। এমনকী ঐতিহ্যসঞ্জাত বালামনি আম্মা এবং সুগতকুমারীর ঐতিহ্যকে পেছনে ফেলে সমাজের প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধকে প্রশ্ন করতে গিয়ে তাঁরা ওই পূর্বসূরিদের পেছনে ফেলে দিয়েছেন। এবং বলপ্রয়োগ ও হিংস্রতার যুক্তি খাড়া করে পুরুষের পৃথিবীকে পুনস্থাপনও করেছেন এঁরা। এই কবিদের অনন্তের সঙ্গে সম্পৃক্ত অধিবিদ্যার অহংয়ের পুনপ্রয়োগ হল আর একটি কৌতূহল উদ্দীপক প্রবণতা। এটা অবশ্য আমাদের রকমফের আধ্যাত্মিকতা, কারণ এটা কোনও অর্থেই পুনরভ্যুত্থান নয়। এখানে বিশ্বের রহস্যের সঙ্গে আধিদৈবিকতার মিশ্রণকে বিস্মিত হয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

কবি বালাচন্দ্রনের 'মনের পরিবর্তন' কবিতায় বর্ণনার আড়ালে চরিত্র ও বিষয়বস্তুতে রয়েছে আধ্যাত্মিকতার স্বর। ডি বিজয় চন্দ্রনের কবিতায় আছে অন্তরালবর্তী প্রবল ভক্তির স্রোত, যে প্রবাহ কাদাম্মান্নিত্তা রামকৃষ্ণাণের 'ঈশ্বর স্তোত্র' কবিতাকে মনে করায়।

সচ্চিদানন্দনের কবিতায় ধরা পড়েছে ভারতের দ্রোহী মনোভাবাপন্ন সন্ত কবি, কবীর, মীরা, টুকারাম, নামদেও, আক্কামহাদেবী, বাসব, লালদেব, চৈতন্য, ত্যাগরাজ, বুলে শাহ, আন্ডাল প্রভৃতির উত্তরাধিকার। আয়াপ্পনা পানিক্করের কবিতাগুলিতে সীমা-অসীমের সম্পর্কের গভীরতা বেজে উঠেছে মনে হয়। এই প্রবণতা কোনও এক স্তরে বিশ্বের ঐকতানের পুনরাবিষ্কারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে হয়। অন্যদিকে দলিতদের ব্রাহ্মণবিরোধী জাগরণে উদ্বুদ্ধ আন্দোলনেব কথাও মনে করিয়ে দেয়। এই আধ্যাত্মিকতা এখানে যেমন অতীতের আচারধর্মিতা থেকে মুক্ত হতে চেয়েছে, তেমনই পুনরুত্থানধর্মী আদর্শকে ব্যবহার করে নতুন প্রেরণা অর্জন করে সেই শক্তিকে ভবিষ্যতের মানুষ ও পৃথিবীর দিকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছে।

গত শতকের নববুইয়ের দশকের সৃষ্ট কবিতা নিয়ে কিছু কথা বলে আমি এই প্রবন্ধ শেষ করতে চাই। মালয়ালাম ভাষার এই দশকের কবিতাকে আমি তৃতীয়প্রজন্মের এবং সমকালের কবিতার পঞ্চম প্রজন্মের বলে চিহ্নিত করতে চাই। প্রথম প্রজন্মের কবিদের প্রতিনিধিত্ব করেন, বালামনি আম্মা, যিনি দার্শনিকতা ও গভীর নৈতিকতার দিক থেকে ক্লাসিক কবিদের সমগোত্রীয়। দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রতিনিধি বলা যায় ও. এন. ভি সুগতকুমারী। যাঁরা অসাধারণ গীতিকবি রূপে সম্মানিত। এঁরা 'কাল্পনিক' আন্দোলন থেকে উঠে এসেছেন, পরবর্তী সাহিত্য-সমৃদ্ধির দ্বারা অংশত তাঁরা প্রভাবিত বলা চলে। তৃতীয় প্রজন্মের প্রতিনিধি হলেন আধুনিকদের অগ্রদূত আত্তুর রবিবর্মা, কে সচ্চিদানন্দন, এবং কে. জি. শংকর পিল্লাই-এর মতন কবি, যাঁরা 'আধুনিক' হিসাবে শুরু করে আধুনিকতার বেড়াজাল অতিক্রম করে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, আধুনিক মালয়ালাম কবিতায় কোনও একটিমাত্র কেন্দ্রীয় স্বর প্রধান নয়। এই সময়ে কবিতার জগৎ ছ'য়ের, সাতের দশকের কবিদের দ্বারা প্রভাবিত, যে কবিরা নতুন নতুন পথ খুঁজে চলেছেন, মেলে ধরতে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন।

নববুইয়ে দশকে বেশ কয়েকজন ভাল কবি এসেছেন। এই নববুইয়ে বিশিষ্ট কবিরা আদর্শগতভাবে নির্মোহ-দর্শনের স্রষ্টা, গুণগতভাবে বৈষম্যভরা, তবুও তাদের কবি-ক্ষমতা স্বীকার করতেই হবে। ষাটের সত্তরের 'কেরালার কবিতা' 'সমকালীন কবিতা' কে. আয়াপ্পা পানিকর এবং কে. জি. শংকর পিল্লাই যুগ্মভাবে সম্পাদনা করেছেন। সম্প্রতি ত্রিবান্দ্রামের কয়েকজন তরুণ কবি একটি কবিতা পত্রিকা প্রকাশ করছেন, নাম 'কবি থাক্ক অরিন্দম' (কবিতার জন্যে একটি জমি)।

আগেকার আধুনিক কবিতার সংকলনগুলোর মতো পুথুমুদ্রাকল (বিষ্ণুনারায়ণ নামবুদিরি সম্পাদিত) : হরিশ্রী ( কে. সচ্চিদানন্দন সম্পাদিত); কলিকাল-কবিতা (আত্তুর রবিবর্মা সম্পাদিত) এবং নার্ভাজিকল (সচ্চিদানন্দন সম্পাদিত), দুটো নতুন প্রজন্মের কবিদের কবিতাসংকলন প্রকাশিত হয়েছে—পুথুমজ্ঞি-



ভজ্জিফল (আত্তুর রবিবর্মা সম্পাদিত) এবং যুবকবিতাকোত্তম (কে. এম. বেনুগোপাল সম্পাদিত)। এদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ বের করেছেন। এদের মধ্যে অন্তত পনেরোজন ক্ষমতাবান কবি রয়েছেন, কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে এখানে করা যেতে পারে, যেমন পি. পি. রামচন্দ্রন, পি. রামন, টি. পি. রাজিবন, কে. আর. টনি এবং আনোয়ার আলি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই কবিবৃন্দ যখন কবিতা লিখতে শুরু করেন, তখন আধুনিকতা ও অস্তিত্ববাদ, দুটি ঢেউই স্তিমিত হয়ে আসছে। ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুনের বিরোধ, সব কালের মতোই পুরনোকে ভেঙে ফেলার প্রচেষ্টা, অবশ্য সমন্বয় ও সংহতিতেই শেষ পর্যন্ত পরিসমাপ্ত হয়।

ওই সব আলোড়ন অনুসরণ করে যে শান্ত স্থিতাবস্থায় শেষ পর্যন্ত এসেছিল, ঠিক সেই সময়ই এইসব তরুণ কবিদের আবির্ভাব ঘটে। এটা ছিল এ রকমই ঘটনা, যেন উৎসবের কাল অতিক্রান্ত, পরীক্ষা নিরীক্ষার আর কিছু বাকি নেই; সব ধরনের গদ্য ও ছন্দসিদ্ধির চর্চা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, অতীত একটা ছায়ায় পরিণত, বর্তমান যথেষ্ট উন্মাদনাকর, ভবিষ্যতের স্বপ্ন অনেকটাই বর্ণহীন মনে হচ্ছে। তাদের কবিতাগুলি সমকালীন পূর্বসূরিদের কবিতার প্রতিধ্বনি মনে হত, তাদের পক্ষে কঠিন ছিল প্রভাব অতিক্রম করে নিজেদের স্বর তুলে ধরা। সকলকে একসূত্রে বাঁধতে পারে এমন কিছু ছিল না ফলে একত্রিত হয়ে কোনও আন্দোলন তারা গড়ে তুলতে পারেনি। কোনও কারণহীন অগ্রগতির পুরোধা ছিলেন তাঁরা। এর ফলে তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বনিন্দুক হয়ে উঠলেন। উদাহরণ রূপে দেখানো যায় কে.আর. টনিকে (জ. ১৯৬৪), তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সামানিলা' যেখানে প্রতিফলিত হয়েছে নাক-উঁচু নিন্দুকের ভাব, নৈরাশ্য, সংশয় এবং নিজের প্রতি অবিশ্বাস, যা ছিল তাঁর প্রজন্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এক অর্থে তাকে বলা যায় অ-কবিতার কবি। তিনি মালয়ালাম কবিদের ঐতিহ্যকে উপহাস করে প্রশ্ন করেছেন;অন্যান্য কবিদের উক্তি বা চরণ উদ্ধৃত করেছেন, এবং ধ্বংসকামী বিদ্রোহীদের ধাঁচে অন্যান্যদের সঙ্গে নিজেকেও করেছেন অসম্মান।

তিনি প্রায়শই এঝজুথাককানকে নিয়ে প্যারোডি লিখেছেন, বিশেষত তাঁর নীতিমূলক কবিতা নিয়ে;ঠিক এঝজুথাক্কানের ছন্দ, যতি-নির্ভর কাঠামো এবং সংস্কৃতধর্মী ভাস্কর্যধর্মী প্রকাশকে অনুকরণ করে। প্রাচীনকালের কথার প্রতীকস্বরূপ বিপরীতমুখিতা তাঁর কবিতায় দেখা যায় প্রায়শই। যেমন —

সমস্ত খেলায় আমি যোগ দিই
কয়েকটিতে আমি জিতে যাই
ঠিক, সম্পাদকের কাছে কবিতা পাঠাবার মতোই
যা একবারই ছাপার মুখ দেখে। সাঙ্গি
বেশি পড়া বিপদ ঘটায়,
কখনও ঘুমের ব্যাঘাত করো না।
কাউকে টাকা ধার দিও না,
কারও সঙ্গে বিবাদ নয়, বন্ধুত্বও নয়।
তোমার উদ্‌বেগ ভুলতে
যোগাভ্যাসই ভাল।
পুটুভরসম (নতুন বছর)

টনি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন : 'ভাগ্যে, আমি স্বাধীনতা আন্দোলনের কালে জন্মাইনি! আমার মুখ আধুনিকতার রক্তবর্ণ মুখও নয়। আমি কখনও জেলে যাইনি। আমি কি দেরিতে জন্মেছি?"

পি রামন হলেন একজন নির্ভীক পরীক্ষা নিরীক্ষায় নিমগ্ন কবি। তাঁর কবিতায় ব্যক্তিগত উপস্থিতি তেমন নেই। বিমূর্ততাই তাঁর প্রকাশ বৈশিষ্ট্য। তাঁর 'কানন' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন : 'এ ভাবে কোনও আদেশ মঞ্জুর করা হলে, যা নেই তার ভার যে আছে তারই বহন করা উচিত। সারাদিন ধরে এই দীর্ঘ অবসরকালে আমি এখন কাজের ভার বুঝতে শুরু করেছি। যে দুঃখের বোঝা আমি বহন করি না তাও অনুভব করতে পারি যখন উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করি।' তাঁর কবিতা ক্রমশ সেকেলে হয়ে পড়ছে, কবি এই উদ্‌বেগ প্রকাশ করে একটি অনামী কবিতার শেষে বলছেন : 'যে তার দুঃখ ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না, তার দুঃখও কখনও অপ্রাসঙ্গিক হয় না।' এ রকম, আরও কিছু কিছু বক্তব্য রয়েছে তাঁর — 'মৃত্যু বিষয়ে কবিতা লেখা যেন গ্রানাইট পাথরকে মূক সম্বোধন করা মাত্র।' 'আমার পাত্র-ভরে নেবার জন্যে নদী চায় একটুকরো হাসি।' 'হে গভীরতা, মাছ তোর শরীর ছিঁড়ে খুঁড়ে চলেছে।'

রামন বড় অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হননি বলে তাঁর কবিতায় এক ধরনের হতাশা কাজ করছে, কারণ জনশ্রুতিই কাজ করেছে তাঁর কবিতায়। তাঁর নিজের কবিতার উপমা প্রয়োগ করে দেখানো যায় যে তিনি এমন একজন 'যে বৃষ্টিকে কেবল জেনেছে জলাশয়ে বৃষ্টি পড়ার শব্দে।'

পি. পি. রামচন্দ্রণ (জন্ম ১৯৬২) টিকে আছেন তাঁর রচনা-দক্ষতা এবং ব্যাজস্তুতি সৃষ্টির ক্ষমতার জন্য, যাঁর জন্ম স্মৃতির জগৎ এবং অভিজ্ঞতার জগতের সংঘর্ষ থেকে। টনি অথবা রামনের বিপরীতে ঐতিহ্য খুব সদর্থকভাবে তাঁর মধ্যে উপস্থিত। তাঁর তীব্র ব্যঙ্গের লক্ষ্য যতটা না অতীত এবং পূর্বপুরুষরা, যাদের তিনি পরোক্ষভাবে সম্মানও করতেন, তার চেয়ে বরং তাঁর সমকালীন কবিরা। এই সব কারণে তাঁর কবিতা সমসাময়িক কবিদের থেকে একসময় স্মৃতিভারাতুর হয়ে পড়ে, কিছুটা পুরনো মেজাজেরও। মাঝে মাঝেই তার কবিতায় দেখা গেছে পুরনো

সুন্দর পৃথিবীর জন্য আকুলতা তিনি অতিক্রম করতে চেয়েছেন। মালয়ালি পাঠকবর্গ পি. কুন্হিরামন নায়ারের এই গৃহকাতরতার পরিচয় যথেষ্ট পেয়েছেন। পি নায়ার ছিলেন একজন অননুকরণীয়, প্রকৃতি প্রেমিক কবি যিনি পাখির ভাষা সম্বন্ধে 'লালিথাম' (সরল) কবিতার মতো অলংকার, স্মৃতিকথাবর্জিত সরল কবিতা রচনা করেন—

একটি মধুর কান্না, যথেষ্ট
এখানে আমার উপস্থিতির পক্ষে যথেষ্ট
একটি পালক খসে পড়ল এইটুকুই
বলার পক্ষে যথেষ্ট : আমি এখানে
গভীর চিন্তার উষ্ণতা
যথেষ্ট প্রমাণ — আমি থাকব এইখানে
এর চাইতে সরল প্রকাশ
একটি পাখিও জানে না।

অনেক বছর পরে দুই বন্ধুর মিলন নিয়ে ব্যাজস্তুতিপূর্ণ কবিতা হল 'লোপাসন্ধি'। দুই বন্ধুই 'র‍্যাডিকাল', তাদের একজন এখন জীবনে প্রতিষ্ঠিত মানুষ; দাড়িকামানো ঝকঝকে মুখ তার, বসার ঘরে সোফা, এইসব দেখে কারও মনে পড়তে পারে সেই দিনের কথা যখন এই বন্ধুটি একমুখ দাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পাথরে বা কালভার্টের উপর বসে বিরামহীন তর্কে সে মেতে থাকত। এখন তাঁর গোফজোড়া দর্শনার্থীকে মনে পড়িয়ে দেয় চার্লি চ্যাপলিনকে, কিংবা স্মরণ করিয়ে দেয় হাসিবর্জিত হিটলারের মুখের কথা। এই আগন্তুক মানুষটির ঘরে তাদের কোনও ঠাঁই নেই জেনে দর্শনার্থীরা আজ ফিরে যায়। কবিতাটিতে উপস্থাপিত বিষয়টি অনেকটাই অতিব্যবহারে জীর্ণ, কিন্তু কণ্ঠস্বরে ধার্মিকমন্যতা রয়েছে, তবু আজও কবিতাটি পাঠযোগ্য কারণ এর ভিতরে লঘু হাস্যরস বর্তমান, ভাবমূর্তিও অনেকটা 'কথাকলি'কে মনে করায়।

টি.পি. রাজিবন (জন্ম : ১৯৫৯) হলেন নতুন প্রজন্মের আর একজন বিশিষ্ট কবি, দুটি কবিতাগ্রন্থের লেখক। তাঁর কবিতা জীবনের শান্ত কোমলভাব এড়িয়ে উলঙ্গ নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর অরু বিলাপম (একটি শোকগাথা) কবিতায় তিনি মৃত্যুসম্পর্কে নিরাবেগ স্বরে বলেছেন- 'প্রথমেই পিপড়ে আসবে মাথা নিচু করে স্মৃতির আর্দ্রতা ও মিষ্টত্বের খোঁজে, ভ্রূ, চোখের পাতা, ঠোঁট, স্তনের বোঁটা, নিতম্বের উপর দিয়ে চলাফেলা করবে। তারপর আসবে রাস্তার কুকুর, শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ চিনতে না পেরে চিৎকার করে লম্ফঝম্ফ করবে। যখন সব শেষ হয়ে যাবে তখন শকুনিরা সবেগে নীচে নামবে, তারা ডানা ঝাপটাবে, ঠোঁট দিয়ে হৃদয়যন্ত্রের শক্তি আর চোখের গভীরতা পরীক্ষা করবে। যে কোনও দিক থেকে যে কোনও সময় পোকামাকড় আসতে পারে, এদের খিদে সারাটা পৃথিবীও মেটাতে পারে না। শেষ দর্শক হবে গাছের শেকড়গুলো, তারা প্রতিটি ক্ষতের মধ্যে ঢুকে পড়বে, প্রতিটি রহস্যের গভীরেও, সমস্ত যন্ত্রণা এবং তিক্ততা শুষে নেবে এবং হাসিতে ফেটে পড়বে।' শোকগাথা রাজনীতি নামক আর একটি কবিতায় রাজিবন মালয়ালাম কবিতার পরিসমাপ্তির কথা উল্লেখ করেছেন— 'ম্যানহাটানের একটি আদালত আয়াপ্পনা পানিকরকে কবিতায় অবৈধভাবে আফিম আমদানির অভিযোগে ফাঁসি দিয়েছে। শব্দের অরণ্যে যখন আতুর রবিবর্মা লুকিয়ে ছিলেন, তখন তারই নিজের পিঠে ঝোলানো ব্যাগে রাখা বোমায় তিনি হলেন নিহত, কে. জি. শংকর পিল্লাই নিহত হলেন আদর্শের গুপ্ত আস্তানায় একটি সংঘর্ষে,' সচ্চিদানন্দন, এ আয়াপ্পানান, বালচন্দ্রান চুল্লিকাভ, কাদম্বানিত্তা রামকৃষ্ণণ এবং ঠিক কিছু আগের পূর্বসুরিরা সকলেই আলাদা আলাদা ভাবে শেষ হয়েছেন, এবং এই ঘটনাগুলি তাঁদের কবিতার বিশেষ বিশেষ স্বাতন্ত্রকেই নির্দেশ করে। কবিতাটি শেষ হয়েছে এই বলে, 'ভাষার নির্জন নৈরাজ্যের রাস্তা দিয়ে সৈন্যরা পতাকা হাতে কুচকাওয়াজ করেছিল। কারফিউ বলবৎ হবার আগে পর্যন্ত কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি'।

'অঙ্গনে পোয়াভান' (যে মানুষটি ছেড়ে গেছে এভাবে) কবিতায় তাঁর সংগ্রহশালায় অতীতকে গচ্ছিত রেখে একটি মানুষের মূর্তি কল্পনা করেছেন। এই কবিতাটি ঐতিহাসিক স্মৃতিতে ভরা যার শেষে, জাদুঘরের মূর্তিগুলো, পরস্পরের মধ্যে হতাশার সুর বিনিময় করছে, বাইরের ভীতিপ্রদ ঘটনায় এতটুকুও বিচলিত হয়নি তারা।

বেড়াল, মাছ ও কচ্ছপ নিয়ে লেখা রাজিবনের কবিতাগুলো, প্রাণী নিয়ে সাধারণ লেখা থেকে উচ্চমানের, কারণ ইতিহাসবোধ ও বাস্তববোধের মিশ্রণ রয়েছে তাতে।

আনোয়ার আলি হলেন একমাত্র তরুণ কবি যিনি বর্ণনামূলক বিষয় নিয়ে দীর্ঘ কবিতা লিখতে সাহস করেন। তাঁর কবিতাগুলো প্রায়শই কথোপকথনের ভঙ্গিতে রচিত হয়েছে, যার ফলে সেগুলিতে সৃষ্টি হয়েছে উক্তি-প্রত্যুক্তির স্বাদ এবং হালকা উদাসীনতা। তাঁর সতীর্থ কবিদের মতন তিনিও ব্যঙ্গধর্মী হয়েছেন কখনও, কিন্তু তার প্রকাশ অনেক বেশি দেশীয়, কখনও বা গ্রাম্য।

একান্ততায়ুধে আম পাথু বর্ষামঙ্গল (নিঃসঙ্গতার পঞ্চাশবছর) কবিতায় তিনি স্বাধীন ভারতবর্ষের জীবনের উপরে তিক্ত বক্তব্য রেখেছেন। একজন দেশপ্রেমিকের মায়ের সঙ্গে টেলিভিশন সাক্ষাৎকারের ভঙ্গিতে কবিতাটি লিখেছেন রাঘবন, সময়টা ভারতের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বর্ষ। কবিতাটির বুনন শিল্পটি নানা যান্ত্রিক শব্দের আওয়াজ, নির্দেশক ও ফটোগ্রাফারের নানা মন্তব্যে এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে যা মাঝে মাঝেই বিষন্ন মায়ের ব্যাখ্যাধর্মী যে মার সন্তান স্বগতোক্তিতে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে,



স্বাধীনতার দিন থেকে যিনি কোমায় আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে আছেন।

রফিক আমেদের (জন্ম-১৯৬১) আছে এক চিন্তাশীল মানসিকতা, আছে শব্দ ও ছন্দের ওপর ভাল দখল যা তাকে প্রতিশ্রুতিমান কবি রূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। পি. এন. গোপীকৃষ্ণাণ হলেন একজন প্রচলিত মত-বিরোধীদের প্রতিভূ, মামুলি এক ধরনের কবিতা লেখেন তিনি যা প্রায়শই নীরস হয়ে দাঁড়ায়।

গীতা হিরণ্যন (১৯৫৬-২০০১) তাঁর 'অর্ধনারীশ্বরণ' কবিতায় মানুষের অকৃতজ্ঞ মনোভাবকে বিদ্রূপ করেছেন — শিব তাঁর অনেক স্ত্রী, তাঁর নিজের পিতা, এমনকী তার প্রেমিকাও হতে পারে; পার্বতীকে প্রশ্ন করছেন — শিবের জটায় গঙ্গা এখন অবস্থান করছেন কি না। তাঁর 'স্বর্গারোহণ' কবিতায় দ্বিতীয়বার রামায়ণ পড়ে দেখছেন, সরযূ নদীর তীরে যা ঘটেছিল তা হল অনুতপ্ত রাজা ও নীরব থাকার জন্য দোষী মানুষদের স্বেচ্ছায় গণমৃত্যুবরণ। 'ঘর সাজানো' কবিতায় তিনি নিজেকে 'বনসাই'এর সঙ্গে তুলনা করেছেন, মনে হয়েছে তাকে জোর করে গাছের মত বাড়তে ও পুষ্ট হতে দেওয়া হয়নি। তবুও গাছটি তাকে যেন বলছে, সে একটি গাছমাত্র, একটি নীতিবৃক্ষ সে কবিকে ভালবাসে এবং তাকেই আকাঙক্ষা করে। ক্লান্তি এবং একঘেয়েমির— মুহূর্তগুলিতে অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা তাকে সান্ত্বনা দেয়।

রোজমারির কবিতা স্বপ্ন এবং আকাঙক্ষার কবিতা। রচনারীতি এবং ভাষার ওপরে এখনও দখল আসেনি যদিও। অন্যান্য কয়েকজন কবির মতোই তাঁরও সর্বনাশ হয়েছে বাগাড়ম্বরের জন্য। ভি. এম. গিরিজা হলেন একজন মৃত্যু-চেতনা, একাকিত্ববোধ ও অতৃপ্তকামনার কবি। গিরিজাকে সমাজের নিয়মাবলি ও সহজপ্রবৃত্তির মধ্যে বিরোধ হতবুদ্ধি করেছে। কালভিদু (পাথুরে বাড়ি) কবিতায় তিনি প্রকৃতিরাজ্য থেকে তাঁর চিত্রকল্প বেছে নিয়েছেন। বাতাস, সুগন্ধ, বৃষ্টি, নদী ইত্যাদি থেকে। কিন্তু মানুষের ভয়ংকর বাড়ি, পাথুরে দেওয়াল এবং প্রহরীদের উপস্থিতি তাঁকে শেষ করে দিয়েছে। এ যেন শুনতে পায় না, এমন পাথুরে মূর্তি। গিরিজার কবিতায় বন্য প্রকৃতির উপস্থিতি তাঁরই প্রকৃতিজাত সহজসত্তার রূপ, যে নৈতিক মূল্যবোধে লালিত মুক্তপ্রাণ প্রাণী।

অনিতা তাম্পির কবিতায় স্বপ্ন আছে, যা তার বৈশিষ্ট্য বা গুণ বলা যায়। তিনি নিজেকে ভাবতে থাকেন যে তিনি নিজেই একটি নৃত্যরত পথে রূপান্তরিত হয়েছেন, আর পাশের গাছগুলি রেলগাড়ির জন্য অপেক্ষায় ক্লান্ত, বিরক্ত; স্মৃতি একটি শীর্ণবালিকার মতো বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে (ওরমাকাল মারায়ান্মাথু—স্মৃতি যে পথে অদৃশ্য হয়ে যায়)। দুপুর নেমে আসে প্রচণ্ড তাপ ও বৃষ্টি সঙ্গে নিয়ে যেন একটা শয়তান, হাসি ও চিৎকারে উন্মাদ মাতালের মতো (উচা নুন); 'অন্ধকারে পিচ্ছিল রেলগাড়িতে যেন কবি বসে আছেন এবং জালে আঁটকে যাওয়া শব্দের মতো নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন' (কেকায়িল অরু থিভান্ডি)। 'মুত্তাম আদিকুমবল' কবিতাটিতে যখন তিনি সততা ও সরলতার সঙ্গে তাঁর বিষয়কে উপস্থাপন করছেন তখনই তিনি তাঁর সর্বোচ্চ মানে পৌঁছে যেতে পেরেছেন।

'যে মেয়েটি উঠোন ঝাঁট দেয় সে চলে যায় তার স্মৃতির জগতে; সে চিন্তা করতে থাকে আগের রাতের কথা; বৃষ্টি অবশ্যই হয়ে থাকবে এবং জল পেয়ে কেঁচোরা ঘুম ঝেড়ে ফেলে মাটির ঘর তৈরি করছে তখন; আর সকালে যখন সে উঠোন ঝাঁট দেবে তখন ঘরগুলো ধুলো হয়ে যাবে। যখন বাড়িটা জেগে উঠবে ঘুম থেকে; সে বিস্মিত হয়ে দেখবে যে তার পরিষ্কার উঠোনে একটিও পাতা বা পায়ের ছাপ আর নেই। ভোরবেলা যখন সংবাদপত্র দিতে কাগজওলা দরজায় টোকা মারবে, ঝাড়ুদার প্রভুর কাপের তলানিটুকুর জন্য অপেক্ষা করবে।'

কবিতাটি একটি সাধারণ জীবনের ছবি মাত্র। এখানে কোনও তারস্বরে প্রতিবাদ ঘোষিত হয়নি। বরং ঝাড়ুদারটির কাজের জন্য তার আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে কবিতাটিতে। শুধু এখানে সৃষ্টি হচ্ছে গভীর অনুভূতি যখন সে ঝাড়ুদারটির ভাগ্যের সঙ্গে ধ্বংসপ্রাপ্ত কেঁচোর ভাগ্য প্রায় একইভাবে ভাবতে পারছে।

অনেক তরুণ কবিই গত পাঁচ বছরে লিখতে এসেছেন। অনেক কাব্যসংকলনও প্রকাশ পেয়েছে। জনপ্রিয় পত্রিকার মাসিক কলমে বর্তমান লেখক অনেককে নিয়ে লিখেছেন, আবার অনেক তরুণই সাহিত্যপত্রে লিখতে শুরু করেছেন। বিজু কানহানগাড, ইন্দিরা অশোক, লক্ষ্মী দেবী, জানকী কুট্টি, রজনী মন্মাদিয়ার, দিবাকরণ বিষ্ণুমঙ্গলম, কানিমল, অসীম থানিমুড, এল. টমাসকুট্টি, এস বৈজু, শ্যামসুন্দর, এসি শ্রীহরি, এস. যোশেপ, সরযু ছাত্তানুর সি. এস জয়চন্দ্রান, মনোজকুমার, ভিরামকুট্টি তাদের মধ্যে অন্যতম।

মালয়ালাম কবিতার ধারা চলেছে বয়ে। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলা চলে যে তাতে মানুষের আশা নিরাশার স্মৃতিমেদুরতা, কল্পনাশক্তি, ক্ষত, উচ্চাকাঙক্ষা এবং মর্বিড উদ্‌বেগ, মালয়ালিদের মনস্তত্ত্বরূপ নিতে চাইছে। মালয়ালি কবিতা শুধু আনন্দদানের জন্য বাইরের দর্শক হয়ে বা ছন্দ-নির্ভরমাত্র হয়ে থাকতে চাইছে না। সমাজের বদলের জন্য যে সংগ্রাম চলছে তার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থাকতে গিয়ে দ্বন্দ্ব, উদ্‌বেগ, উচ্চাকাঙক্ষা প্রভৃতিকে তা ব্যক্তি বা শ্রেণীগত রূপ দিতে বদ্ধপরিকর।

# থিয়েটার এখন, তখন

## বিষ্ণু বসু

থিয়েটারের পত্রিকার সঙ্গে আমার পরিচয় গন্ধর্বের আমলে— মানে ১৯৬২-৬৩ সালে। সে সময় ইন্দো-চিন সম্পর্ক নিয়ে বাম আন্দোলন কিছুটা বিপর্যস্ত হয়ে আছে, তখন থেকেই আমার গন্ধর্বের সঙ্গে যোগাযোগ। তখন নাটকের পত্রিকা হিসাবে গন্ধর্ব খুব ভাল পত্রিকা ছিল। আর কোনও তেমন নাট্যপত্র ছিল না। বহুরূপী বেরত — তাও বছরে দুটো কি তিনটে সংখ্যা। গণনাট্য প্রকাশ পায়-১৯৬৪তে। আমি তখন নাটক নিয়ে পড়াশোনা করি। সম্পাদকের অনুরোধে তখন গন্ধর্বে লিখতে থাকি। ওটা যে তখন খুব পলিটিকালাইজড পত্রিকা ছিল তা নয়। তখন সৎনাট্য বা নবনাট্য নিয়েই মূলত নাড়াচাড়া হত এ পত্রিকায়। তার সঙ্গে কিছুটা বামপন্থী ভাবনাও থাকত — অনেক উদারতার চিহ্ন। আমি সেখানে অন্যান্য লেখার সঙ্গে ব্রেখটের 'মাদার কারেজ' ও রোমাঁ রোঁলার '১৪ই জুলাই' অনুবাদ করেছিলাম। ইতিমধ্যে আমি চাকরি নিয়ে মেদিনীপুরে চলে যাই। তারপরও মাঝে মাঝে লিখেছি। কিন্তু ভৌগোলিক কারণেই গন্ধর্বের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে ৬৬র খাদ্য আন্দোলন, ৬৭তে প্রথম যুক্তফ্রন্টের ব্যর্থতা, ৬৯এ বিপুল জয় নিয়েও ব্যর্থতা এল। ধীরে ধীরে কংগ্রেসি অত্যাচার বাড়তে লাগল। কিছুকাল পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামও শুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে এখানে ততদিনে ৬৪তে কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হয়ে গেছে। ৬৫তে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস ভাগ হল। — এক ধরনের রাজনৈতিক মেরুকরণ ঘটেছিল পশ্চিমবঙ্গে, তার ফলে আমাদের সমাজমুখী নাট্য আন্দোলনও পক্ষে কিংবা বিপক্ষে এই দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল, বরাবরই বাংলা নাটক বিশেষ করে গণনাট্য সংঘ (১৯৪৩) প্রতিষ্ঠা হবার পর থেকে নাটক চালানোর ভারটা বামপন্থীদের হাতেই ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় প্রগতিশীল আন্দোলনের সাংস্কৃতিক শাখা হিসাবে তার আত্মপ্রকাশ। অবশ্য দেশভাগের পর ৪৭-৪৮'এ শম্ভু মিত্র বেরিয়ে গেলেন গণনাট্য থেকে। এর পর এলেন উৎপল দত্ত — তিনিও অল্পদিনের মধ্যে বেরিয়ে যান। প্রথম দিককার গণনাট্য আন্দোলনে যাঁরা ছিলেন তাঁরা অনেকেই ছেড়ে চলে যান। কিন্তু যে যেখানেই যান না কেন শেষ পর্যন্ত তাঁদের একটা বাম দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যার সঙ্গে নান্দনিকতা মিশিয়ে বহু নাট্যদল তৈরি হয়েছিল। এখানেই গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন শুরু হল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব কায়দায় পেশাদার মঞ্চের সমান্তরাল ভাবে কাজ করেছিলেন, কিন্তু সেটা বেশি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে যায়নি। এই গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন সেই কাজটা করল। এটাই আমাদের স্বাধীনতা পরবর্তী অর্জন যার উৎস গণনাট্য সংঘ। এর সহায়ক শক্তি হিসাবে তখন কিছু নাট্য পত্রিকা বেরোয় — গণনাট্য, গন্ধর্ব, বহুরূপী — ৫০ এর দশকে, উৎপল বাবু বার করলেন পাদপ্রদীপ, কিন্তু কেউই বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। ব্যতিক্রম বহুরূপী ও গন্ধর্ব। ৬০ এর দশকে এসে গণনাট্য পত্রিকা নতুন করে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথমে ব্যক্তি উদ্যোগে চিত্তরঞ্জন দাস কাজটা করেছিলেন, পরে সেটা গণনাট্য সংঘের হাতে চলে আসে। ক্রমে গন্ধর্ব উঠে যায়। ওদের মধ্যেও রাজনৈতিক মেরুকরণ ঘটেছিল। সবাই আমার বন্ধু। পরে দেবকুমার ভট্টাচার্য কিছুদিন চালিয়েছেন — বছরে বেরত একটা কি দুটো সংখ্যা। ৭০ এর দশকে গন্ধর্ব বন্ধ হয়ে গেল। অবশ্য বহুরূপী বছরে দুটো বেরত। আরও পত্রিকা-বেরত। ৭০ এর দশক বাংলার উত্তাল দশক। বামপন্থীদের খুন করা হচ্ছে, দল ভেঙে দিচ্ছে। তখন গণনাট্যের দপ্তর ভেঙেছিল। নকশাল ও কংগ্রেসের মিলিত আক্রমণে এগুলো হচ্ছিল। রাজনৈতিক ডামাডোলে বামপন্থীদের বিশেষ করে সি পি আই (এম) যারা করে তাদের পেটাতে বিরোধী দলগুলো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ফলে থিয়েটারের নেতৃত্ব কিছুটা বসে যেতে বাধ্য হয়। বহু নাট্যকর্মী এই ৭০ এর দশকে নিহত হয়েছিলেন। প্রবীর দত্তের কথা সকলের জানা, তবু তাঁর নাম এখন কেউ কেউ করে, কিন্তু আমার যেটুকু জানা — আরও বেশ কিছু নাট্যকর্মী খুন হয়েছিলেন। তাঁদের কথা এখন আর সেভাবে কেউ বলে না — খুবই দুঃখজনক। যেমন বালির সত্যেন চক্রবর্তী।

এই অবস্থায় ৭৭ য়ে যে একটা পরিবর্তন হবে — ভাবা যায়নি। ৭২ এর নির্বাচনে আনন্দবাজার হেডলাইন করেছিল — 'কবর দিবার রাজনীতি কবরস্থ।' — মেশিনগানের ডগায়, বন্দুকের ডগায়, হিংস্রতার ডগায়, সন্ত্রাসের ডগায় সি পি এম-কে হটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আসলে এখন মনে হয় এতটা বাড়াবাড়ি না করলেও ওরা পারত — বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইন্দিরার যে ইমেজ দাঁড়িয়েছিল তার ফলে ওরা এমনিতেই হয়ত জিতত। কিন্তু ঝুঁকি না নিয়ে ওরা সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে দিয়ে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস





তৈরি করেছিল — এখনকার প্রজন্ম সে কথা তেমন জানে না, তাদেরকে সেভাবে জানানোও হয় না — আসলে সময়ের ব্যবধানে ব্যাপারটা অনেক ফিকে হয়ে গেছে। ৭৫ এর জুনে জরুরি অবস্থায় কণ্ঠরোধ করা হল। এই যে মানুষের রুদ্ধ রোষ, প্রতিবাদ, এইটা, যখন ইন্দিরা গান্ধী বাধ্য হয়ে ৭৭এ লোকসভা নির্বাচন ডাকলেন একটা বিস্ফোরণ ঘটল। গোয়েন্দারা বলেছিল যে ইন্দিরা জিতবেন — কিন্তু শোচনীয়ভাবে তিনি ব্যর্থ হলেন। এরপর জুন মাসে হল বিধানসভা নির্বাচন — জনতা দল জোট করতে এত বেশি সিট চাইল যে জোট হল না, তখন বামফ্রন্ট সি পি আই এম-এর নেতৃত্বে লড়ল। সি পি আই তখন কংগ্রেসের সঙ্গে ছিল, ফলে সি পি এম মূলত একা লড়ল এবং ফলাফল যা হল তাতে সি পি এম নিজেও বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। অভাবনীয় জয় হল। জনতা দল, বাংলা কংগ্রেস খুব ধাক্কা খেল। কাজেই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। একটা নতুন সময় শুরু হল। ৪৭-৭৭ তিরিশ বছর একরকম, আবার ৭৭ থেকে এই পঁচিশ বছর আরেক রকম। দুটো সময় যেন স্পষ্ট ভাগ করতে পারা যায়। তা যদি পারি তা হলে দুটো থিয়েটার আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি কেন না সময়ের সঙ্গে থিয়েটারটা পাল্টায়। শিল্পকলার সবকিছুই পাল্টায়, মানুষের চেতনা পাল্টায়, বোধ পাল্টায় — সে ক্ষেত্রে মানুষের রাজনৈতিক চেতনা পাল্টাতে বাধ্য।

কাজেই সেই হিসাবে ৭৭ থেকে মানুষের মধ্যে কি প্রাপ্তি, কি উৎসাহ, কি কর্তব্য, কি দায়িত্ববোধ — সব মিলিয়ে আমরা এক নতুন জায়গায় চলে যেতে চেষ্টা করছি। জ্যোতিবাবুর তখন ৬৪ বছর বয়স, তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী করা হল। — যেটা তাঁর ৬৭ তে কিংবা ৬৯ এ হবার কথা, কিন্তু সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক কিংবা বাংলা কংগ্রেসের ষড়যন্ত্রে হতে পারেননি। ৭৭-এও সি পি আই কংগ্রেসের সঙ্গে। পরে ১৯৮০তে বোধহয় বামফ্রন্টে যোগ দেয়। এ সব অপ্রীতিকর মন্তব্যের মধ্যে আর যাব না। ৭৭ এর পরবর্তী সময়ে বামফ্রন্টে সাংস্কৃতিক অস্ত্রগুলোকে গুছিয়ে নতুন কিছু করার চেষ্টা হল।

নন্দন ৬০ এর দশক থেকে বেরতে শুরু করে। অসুবিধা করেই বেরত। কারণ সি পি এম করা তখন একটা কঠিন ব্যাপার ছিল। প্রচার সংখ্যা খুব কম। তার অনেক সংখ্যা আমার কাছে এখনও আছে। তারপর ৭০ এ বোধহয় বন্ধও হয়ে গিয়েছিল। গণনাট্যও সে সময় অনিয়মিত বেরত। আমার কাছে দ্বিতীয় সংখ্যা থেকেই আছে। বহুরূপী, গন্ধর্ব এ সব পুরনো সংখ্যা যখন নাড়াচাড়া করি তখন ভাবি বাঙালির নাট্যচেতনা কত ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়েছে।

৭৮-এ গন্ধর্বের প্রাক্তন সম্পাদক নৃপেন্দ্র সাহা বাঙ্গুরে আমাদের বাড়িতে একদিন এলেন। বললেন, আমরা একটা পত্রিকা বার করতে যাচ্ছি, আপনাকে সঙ্গে পেতে চাই। আমি বললাম নাটকের পত্রিকা, থিয়েটারের পত্রিকা বেরবে আর আমাকে পাওয়া যাবে না কেন? এ তো খুব ভাল কথা যে আমাদের থিয়েটারের একটা নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম হবে। বলল — পত্রিকার নাম হবে গ্রুপ থিয়েটার এবং পোষকতা করবেন রমন মাহেশ্বরী। রমনের সঙ্গে আমার গন্ধর্বের আমল থেকেই ঘনিষ্ঠতা।

আমার পারিবারিক অসুবিধার জন্য গন্ধর্বের দপ্তরে বেশি যেতে পারতাম না, মাঝে মাঝে যেতাম কিন্তু রমনকে আমার বরাবরই ভাল লাগে। নৃপেনের কথায় প্রথম সংখ্যা থেকেই গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলাম। প্রথম সংখ্যায় গ্রুপ থিয়েটারের সংজ্ঞা অর্থাৎ গ্রুপ থিয়েটার কাকে বলে সে বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখলাম। তারপর ধীরে ধীরে নিয়মিত দপ্তরে যেতে শুরু করি। তখন দপ্তর ছিল রমনের পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে। এর বছরখানেক বা বছর দু'য়েক পরে আমাকে নৃপেন্দ্র এবং রমন বললেন, 'আপনাকে আমরা সম্পাদকমন্ডলীতে চাই'। আমি রাজি হয়ে গেলাম। রমন সম্পাদকমণ্ডলীর একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। নৃপেন সম্পাদক। যুগ্মসম্পাদক আমি আর নিখিল। কিছুদিন চলার পর পত্রিকার পরিচালনায় রাজনৈতিক থিয়েটার নিয়ে একটা সেমিনার হল। প্রমোদ দাসগুপ্ত থেকে শুরু করে বহু রাজনীতির মানুষ, থিয়েটারের মানুষ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এ সেমিনার হয়েছিল ৮০ সালের জুন মাসে কলামন্দিরে। সেমিনারের সমস্তটাই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। নৃপেন্দ্র সাহার অনুরোধে সেমিনারের প্রতিপাদ্য বিষয়টা আমিই লিখে দিয়েছিলাম। — তারপর যে জিনিসটা দেখলাম সেটা আমার রাগের, দুঃখের, ক্ষোভের এবং বিস্ময়ের কারণ — ৮৪ সালে বোধহয় — আমাকে ধীরে ধীরে ব্ল্যাক আউট করা হচ্ছে পত্রিকা সম্পাদক মণ্ডলী থেকে। প্রথমে নামটা নীচের দিকে নামিয়ে দেওয়া হল, তারপর দেখলাম আমার নামটা নিখিলের পরে দেওয়া হল। কারণ যাই হোক আমি তো নিখিলের থেকে সিনিয়র। ওরা আমার থেকে ভাল কর্মী হলেও আমিই সিনিয়র। তখন আমি নৃপেন্দ্র বাবুকে বললাম কী ব্যাপার? উনি বললেন আপনি তো বেশি আসেন না দপ্তরে। আমি বললাম সে তো রবীন ভট্টাচার্যও আসেন না। এগুলো ব্যক্তিগত কথা বলছি এবং ইচ্ছা করেই বলছি। নৃপেনের একটা বৈশিষ্ট্য আছে যে যখন কোনও বিতর্কিত কথা হয় তখন তিনি চুপ করে থাকেন। তখন আমি বুঝলাম 'সামথিং রং....'। আমি বললাম আমার নামটা বাদ দিয়ে দেবেন। নৃপেন্দ্র তাতে রাজি হয়ে গেলেন। তখন আমি বললাম, আমি যে নিজে থেকে বাদ যাচ্ছি এটা কিন্তু বলে দিতে হবে। কিন্তু দেখলাম আমাকে বাদ দিল কিন্তু ওই ঘোষণাটি ছিল না। আমি গ্রুপ থিয়েটারে লেখা

বন্ধ করে দিলাম। তারপর বছর তিনেক পর নানারকম অনুরোধে আবার লিখতে শুরু করলাম। কয়েকটা রিভিউ লিখলাম, প্রবন্ধও লিখলাম। এরও বহুদিন পরে যখন নৃপেন্দ্র সাহা বাধ্য হলেন গ্রুপ থিয়েটার ছেড়ে চলে যেতে, তখন জানতে পারলাম আমি নাকি সি পি আই, তার জন্য আমাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শুনে আশ্চর্য হলাম, কারণ নৃপেনের সঙ্গে আমার অত ঘনিষ্ঠতা, উনি আমাকে বলতেই পারতেন যে আমি সি পি আই। যাই হোক, এতে দুটো অসুবিধে হল। এক, আমি যে লেখাগুলো গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকা বা অন্যত্র লিখতাম, রাজনৈতিক যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমি লিখেছি সেই প্রবন্ধগুলো কেউ পড়েনি বা পড়ে না। একাধিক লেখাতে প্রত্যক্ষভাবে সি. পি. আই, বাংলা কংগ্রেসের সমালোচনা করা আছে। আর দু'নম্বর হচ্ছে সি. পি. আই যদি বামফ্রন্টে চলে আসতে পারে ৮০ সালে এবং তর্কের খাতিরে যদি ধরেওনি আমি সি. পি. আই, তা হলেও তো আমি বাদ যেতে পারি না। তা হলে, আমাকে না জানিয়ে আমার বন্ধুবান্ধব, বিশেষ করে নৃপেন্দ্র সাহা কেন এই কাণ্ডটা করলেন। সেটা আজও আমার কাছে রহস্য। এ ঘটনা আমি জানতে পারলাম ৬/৭ বছর পর, যখন নৃপেন্দ্র সাহা বেরিয়ে গেলেন গ্রুপ থিয়েটার থেকে তখন। সেই গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকা নিয়ে আমার আর মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করেনি।

বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছে অথচ এ ধরনের সংকীর্ণতা যা কখনওই কাম্য নয় তাই দেখা যেতে লাগল। তা হলে কী লাভ? হয়ত কিছু লোক ব্যঙ্গ করবেন—এটা বুদ্ধিজীবীদের রোগ। এরা অল্পে ক্ষুব্ধ হয়, ওদের অভিমান বেশি। কিন্তু সেগুলো তো বাস্তব এবং যুক্তিসঙ্গত। আজ ২৫ বছর পরে যদি আমি ব্যক্তিগত ক্ষোভের জায়গাগুলো, বিস্ময়ের জায়গাগুলো দুঃখের জায়গাগুলো না বলি তবে থিয়েটার নিয়ে আমার যে বাস্তব ভাবনা চিন্তার ওঠাপড়া, সে ওঠাপড়া তো সত্য হবে না। যেমন, আমি নাট্য আকাদেমির সদস্য হয়েছি ১৯৯০ সাল থেকে। তবে নাট্য আকাদেমির যাঁরা সভ্য তাঁদের অনেকেই বামপন্থী বা সি. পি. এম-এর রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন বলে সভ্য নন। সি. পি. এম মতাদর্শে যাঁরা বিশ্বাস করেন বা অনেক পার্টি মেম্বারও এখানে যেমন সভ্য আছেন, তেমনই, যাঁরা বামপন্থায় বিশ্বাস করেন না বা বিরোধী তাঁরাও আছেন। এটা গত ১০ বছর ধরে মজার সঙ্গে লক্ষ করা যাচ্ছে যাঁরা ঘোষিত বিরোধী ছিলেন তাঁদের ধীরে ধীরে সব সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাথায় যাতে বসিয়ে দেওয়া যায় তার জন্য চেষ্টা চলছে। সি. পি. আই বা সি.পি.এম কেউই নন অনেক উদারপন্থী হয়ত—তাদের যাতে মাথায় বসানো যায় সেটা সি পি এম থেকেই চেষ্টা করা হচ্ছে। আনন্দবাজারে লিখে খ্যাতি পেলে সাংস্কৃতিক জগতে সি পি এম-এ তারা খাতির বেশি পাচ্ছে। এখন ধরে ধরে নাম বলতে গেলে জিনিসটা খুব খারাপ দেখাবে। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, আমরা কি এখন বলব সি পি এম একদিন যে মতাদর্শ, রাজনীতি এবং সংস্কৃতি নিয়ে চলেছিল তার কোনও বদল ঘটেছে? বদল ঘটানোর অনেকগুলো পদ্ধতি থাকতে পারে, কারণ থাকতে পারে। কারণগুলো হল, এক, সি পি এমের মধ্যে আদর্শগত বদল ঘটছে। তাদের সমাজ ব্যাখ্যার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেছে, সমাজ দেখার এই দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের জন্যই কিন্তু সি পি এম—সি পি আই ভাগাভাগি হয়েছিল।

সি পি এম কি সি পি আই-এর পথে চলে যাচ্ছে। তাদের ভাগাভাগি তো হয়েছিল মূলত ১৯৫৬ তে সোভিয়েতের বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসের জন্য। ক্রুশ্চেভ যখন ডি-স্ট্যালিনাইজেশন করলেন। ১৯২৭-৫৪য়ে স্টালিনের মতো অত সমর্থ নেতাই তো একটা অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া অর্থনীতিকে দাঁড় করিয়েছিলেন। সোভিয়েত রাশিয়াকে প্রথম সারির শক্তিতে পরিণত করেছিলেন। একেবারে হাতে কলমে। এত বড় নেতা হয় না, ব্যক্তিগতভাবে আমার স্টালিনকে ভাল লাগে। প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করি তাঁকে। ক্রুশ্চেভ তো তাঁকে খুব গালি দিলেন। এরপর কমিউনিজমের ব্যাখ্যা, সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা, সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রয়োগপদ্ধতি সব পাল্টে যেতে লাগল। ইনার পার্টি স্ট্রাগেল—একটা চিনের ও একটা সোভিয়েতের লাইন। অবশ্য এ অভিব্যক্তি একটু সরল। এই অবস্থায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও বিভাজন দেখা গেল ৫০-দশকের শেষ দিকে। ১৯৬২তে চিন ভারতের সংঘর্ষ পার্টিকে আলাদা করে দিল। দুটো কমিউনিস্ট পার্টি হল। অর্থাৎ পার্টিটা ভাগ হয়েছিল একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের উপর—সমাজব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে। দুটোর পার্থক্য ছিল। তো আজকে এসে সেই পার্থক্যটা কি মুছে গেছে? পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাস কি পাল্টে গেছে? তাই যদি হবে তবে ওই রাজনীতিকে, স্টালিনের রাজনীতিকে, ক্রুশ্চেভ থেকে গর্বাচভ—পর পর—তার মধ্যে অবশ্য অনেক ইতিবাচক কাজ হয়েছে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সোভিয়েতটাকে তুলে দিল। এটা তো সংশোধনবাদের ফল। তা হলে আজকে যে মতাদর্শগত বিরোধটা আছে—যেটাকে কিছুতেই থিয়েটার কর্মীরা ওড়াতে পারেন না—সেটা অন্তত অবচেতনেও থাকবে—সেই বিরোধ কেন সে প্রশ্নের উত্তর কি খোঁজা হয়? এটাই আমাদের থিয়েটার আন্দোলনের দুর্বলতা বলে আমার মনে হয়। তা বলে কি আমরা শুধু সি পি আই—সি পি এম দ্বন্দ্ব নিয়েই চলব? কিছুতেই না। এটা মূল কথা না, মূল কথা হল এটার মধ্য দিয়ে কি আদর্শটা প্রতিফলিত হচ্ছে। এই আদর্শ কীভাবে থিয়েটারে প্রতিফলিত হল সেটাও তো দেখা দরকার। আমরা কোনটাকে ধরব? কোন মতাদর্শের বীজের দিকে যাব?

অনেকে বলেন আমাদের আদর্শ ব্রেখট। আমরা জানি এতবড় নাট্যকার বিশ্বে শতাব্দীতে বিশ্বে আর জন্মায়নি। যদিও চেখভ



আমার প্রিয়। আরও অনেকে আছেন। তাঁদের লেখা পড়েছি, কিন্তু ব্রেখট কখনও কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার ছিলেন না। অথচ তিনি বিশ্বাস করতেন ক্যাপিটাল পড়া ছাড়া, কার্ল মার্কস ছাড়া কোনও উপায় নেই। কারণ এটা না করলে সমাজকে ব্যাখ্যা করা যায় না। শুধু তত্ত্বটা জানলে হবে না, জীবনে প্রয়োগ করার পদ্ধতিটাও জানতে হবে। তত্ত্ব এবং প্রয়োগ এই ব্যাখ্যাগুলো নিয়ে বোধহয় আমাদের কোথাও একটা দুর্বলতা আছে। যার জন্য আজ প্রায় ১২ বছর হল সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত বাংলায় একটা ভাল বই বের হল না। এমনকী রাশিয়া থেকেও কর্তাভজার দল যে বইগুলো বার করছে তাতে শুধুই প্রাক্তন সোভিয়েতকে গালাগালি। আবার উৎপল দত্ত যখন 'প্রতিবিপ্লব' বইটি লেখেন তখন এমন একটা একপেশে সরল সমীকরণ করেন যে আসল জিনিসটা পাই না। তা হলে আমাদের এখানে দরকার যে, সোভিয়েতের বিপর্যয়টা যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করার, যাতে আমরা জানতে পারি, বিচার করতে পারি, আলোচনা করতে পারি। এগুলো না জানলে আমাদের থিয়েটার আন্দোলনের ক্ষতি হচ্ছে। অর্থাৎ আমার অবস্থান পরিষ্কার হচ্ছেনা। যার ফলে সমাজকে ব্যাখ্যা করতে পারছি না। সমাজকে ব্যাখ্যা করলেই তো হবে না, ওটাকে ভেতরে নিতে হবে, জীবনের মধ্যে নিতে হবে। সেটা না করে নাটক লিখলে তা ম্যাচমেড্ হতে বাধ্য।

আজ যখন দেখি থিয়েটারের নেতৃত্বে চলে আসছেন তাঁরা, যাঁদের সঙ্গে এক সময় এই মতাদর্শের বিরোধ ছিল, বা যাঁরা ৭০ দশকে পথে ঘাটে সি পি এম ঘৃণা হওয়াটাকে সমর্থন করতেন। কেউ কেউ হয়ত সক্রিয়ভাবে সি পি এম খতমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা নেতৃত্বে চলে আসছেন। আমি যে সব খবর রাখি তার সবটা ভুল নয়। তাঁরা আজ ভীষণ ভাবে বামপন্থীদের সঙ্গে এসে গেছেন। এবং আমাদের নেতৃত্ব তাঁদের সমর্থন করছে। তাহলে আমাদের নাট্য আন্দোলনের কী হবে? গোড়াতেই কোথাও একটা গলদ বা অসত্য আছে, চেতনার বিপর্যয় আছে, নইলে এরা কী করে নেতৃত্বে চলে আসেন?

সি পি এমের সংস্কৃতি কর্মীরা কাজের দিক থেকে চিন্তার দিক থেকে এতই কি অপটু যে তাঁদের জায়গাটা ধীরে ধীরে বিরোধীরা দখল করে নিচ্ছেন? ওরা কি অনেক বুদ্ধিমান? ইদানীং যেসব নাটক নিয়ে মাতামাতি করা হচ্ছে তাদের আপাতভাবে একটা প্রগতিশীল চেহারা আছে। আড়ালে আড়ালে ওরা আমাদের প্রকৃত রাজনীতির দিকে নিয়ে যেতে চায় না। চেতনাকে গুলিয়ে দিতে চায়। কারোর নাম বলতে পারব না কারণ এখন আমার অসুবিধা হয়েছে যে আমার ছেলে থিয়েটার করে। যাই বলব অন্যেরা ছেলের রেফারেন্স টানবে। আমি তো জগাদাথের সম্বন্ধেই লিখেছিলাম যে নাটকটা আমাদের চেতনাকে অস্বচ্ছ করে দিচ্ছে। এটা গেল একটা দিক। এতক্ষণ যা বললাম তা হল গ্রুপ থিয়েটার আমাদের কমিটমেন্টের জায়গা। গণনাট্যের যে ছিল Peoples' Theatre Stars the people অর্থাৎ চেতনাকে জাগিয়ে শিল্পসম্মত ভাবে তার পরিবেশন—সেটাই গ্রুপথিয়েটারের কাজ। তা কেন দূরে সরে যাচ্ছে?

এখন, 'দায়বদ্ধতা' শব্দটা ব্যবহার করতে করতে হয়ত কিছুটা বিবর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু করার কিছু নেই, কারণ 'প্রেম' শব্দটাও তো এতদিন ব্যবহার করতে করতে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে কিন্তু প্রেম বোঝাতে গেলে ওর বিকল্প শব্দও কিছু নেই। এই দায়বদ্ধ থিয়েটারটারের দায়িত্ব কি? — সুস্থ ভবিষ্যৎ। শিল্পী সাহিত্যিকরা কিন্তু চিরকাল এটাই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এই সুস্থ ভবিষ্যতে পৌঁছাতে গেলে থিয়েটারকে যে পথে চলতে হয়, সেটা ঠিক করা দরকার অর্থাৎ রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি — তার ইতিহাস পারম্পর্য জানতে হয়। আমাদের প্রদেশের, সারা দেশের, সারা পৃথিবীর পরিস্থিতিকে জানতে হয়। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কী পরিবর্তন এসেছে পৃথিবীতে সেটাও যৌথভাবে জানতে হবে। কারণ, থিয়েটারের ক্ষেত্রে একজনকেই যে জানতে হবে তার কোনও মানে নেই। সকলে মিলে করতে হবে, থিয়েটার তো একটা যৌথ শিল্প। তাই যদি করতে হয়, তা হলে আমরা কি সেভাবে নিজেদের তৈরি করি? গ্রুপ থিয়েটারের কি সে ভাবে চেষ্টা আছে? সেভাবে আমরা হারমোনিটা আনতে পারি না, সংঘবদ্ধ হতে পারি না, সংঘবদ্ধ ভাবে কাজটা করতে পারি না। এটা আমাদের ত্রুটি। কাজেই আমরা যে দায়বদ্ধতার কথা বলি সেটা মুখের কথা বলি, মনের ভিতর থেকে উঠে আসে কি? আমার সন্দেহ আছে। এখনকার থিয়েটারের মধ্যে এটা উঠে আসছে না, এর কারণ কিন্তু এই নয় যে তারা কম সচেতন। আসলে পরিবেশটা বদলে গেছে গত পঁচিশ বছরে। সেটা কীভাবে? আমাদের কতকগুলো সিদ্ধান্ত যেন রাজনৈতিক ভাবে নেওয়া হয়েই গেছে। যে শ্লোগান তৈরি হয়েছে তার পিছনে যে কতটা স্বার্থত্যাগ, কৃচ্ছ্রসাধন ছিল সেগুলোর কথা মনে থাকছে না। তার ফলে শ্লোগানটাই মুখ্য হয়। স্বার্থত্যাগ, কৃচ্ছ্রসাধন বিযুক্ত হয়ে পড়ে।

দু'নম্বর হল যে, আমাকে অনেক দিন আগে একজন বিখ্যাত নাট্যকর্মী বলেছিলেন — এখনকার ছেলেমেয়েদের সিনসিয়ারিটি কম, টি ভির দিকে যায়। আমি বললাম, এটা আমি বিশ্বাস করি না, আমাদের আর ওদের সময়ের অনেক পার্থক্য আছে। প্রথম পার্থক্য হল অর্থনৈতিক। আমাদের সময় অর্থাৎ পাঁচের দশক ছয়ের দশকে যে কোনও একটা কোয়ালিফিকেশন থাকলে একটা চাকরি বাঁধা থাকত। আমি নিজে পাঁচ বা ছয়ের দশকে কতবার চাকরি পাল্টেছি। বি.এ. পাশ করার পরে এক সপ্তাহের মধ্যে

শিক্ষা দপ্তরে চাকরিতে যোগদান করেছিলাম। এখন এটা কল্পনা করা যায়? ওরপর আমার বন্ধু গণনাট্যের দিলীপ ঘোষালের ব্যবস্থাপনায় আড়িয়াদহ স্কুলে যোগ দিলাম, রাইটার্স ছেড়ে। আজকের ছেলেরা অনেক সিরিয়াস, কিন্তু ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভিতটা নষ্ট হয়ে গেছে। বিশেষ করে বাজার অর্থনীতি আসার পর। লক আউট, লে-অফ, ছাঁটাই, রেল বিভাজন এ সবই বাইরের অসুখের চেহারা কিন্তু মূল অসুখ ওই বাজার অর্থনীতি অর্থাৎ আমাদের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে আমেরিকার নিয়োজিত অর্থনীতিকে ঢোকানো হচ্ছে। যার ফলে সমস্ত জায়গায় এমনকী পশ্চিমবঙ্গ সরকারেও এমপ্লয়মেন্টের সুযোগ কমে গেছে। আজ, স্কুল কলেজে মাইনে হচ্ছে না, নিয়োগ বন্ধ হয়ে আছে। আগে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ছিল চল্লিশ-এক এমন সেটা আশি-এক হচ্ছে।—এরপর শোনা যাচ্ছে, চুক্তি ভিত্তিতে চাকুরি হবে। এ সবের মধ্য দিয়ে কেউ কি কখনও সিরিয়াস থাকতে পারে? জীবনের কোনও নিরাপত্তা নেই, অর্থনীতির কোনও নিরাপত্তা নেই। ছেলেমেয়েগুলোর বয়স হয়ে যাচ্ছে। বয়স হয়ে গেলে কতকগুলো জৈবিক চাহিদা থাকে, শুধু খাওয়া পরা নয়। এরা সংসার করতে পারছেনা। ক্রমাগত উৎকেন্দ্রিকতা বাড়ছে। আমরা কি চেষ্টা করছি কেউ মূলে পৌঁছতে? কোনও ব্যবস্থা কি আমরা নিতে পারছি অর্থনৈতিকভাবে? তা হলে তারা কমিটেড থাকবে কী করে? তা হলে কেউ যদি টি ভি র দিকে যায়, এতগুলো চ্যানেল হয়েছে, ফলে তার যদি কিছু রোজগার হয়, তা হলে কি তাকে আমি অন্যায় বলব? তার তো সৎ ভাবে কিছু রোজগার করার প্রয়োজন আছে। তা হলে তাকে আমি কী করে বলব যে তার সিনসিয়ারিটি নেই। কাজেই ওটা ঠিক নয়, বরং এত নাটকের দল বেড়েছে, এই সমস্ত অসুবিধে সত্ত্বেও কত ছেলেমেয়ে, তারা ভাল খেতে পায় না, টিফিন পায় না অথচ সেই নাটকের দলগুলোতে ভিড় করছে। ঘন্টার পর ঘন্টা রিহার্সাল করছে—অনেক ঘরে ভাল ডেস্টিলেশন নেই, সেখানে তারা দিনের পর দিন রিহার্সাল দিচ্ছে, নাটক করছে গাদা গাদা—দর্শক হয় না। কেন করছে? কখন একটা সরকারি স্বীকৃতি পাবে বলে? না, তা নয়। অত ছোট করে দেখলে হবে না। নিশ্চয় কোথাও একটা খিদে আছে, শুধু কিছু করার নেই বলে নাটক করছে, তা নয়। তাদের লগু করে দেখলে হবে না। টেকনলজির কল্যাণে তো আমরা দেখছি কুচবিহার, বা জলপাইগুড়ি বা মেদিনীপুর কোথায় কী কাজ হচ্ছে তার মোটামুটি একটা খবর আমরা রাখতে পারছি। এদের মধ্যে বেশ কিছু কাজ খুবই ভাল। সেগুলিকে আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না। এটাই হচ্ছে কমিটমেন্টের সুফল। অসুবিধাটা কোথায় হচ্ছে তা হলে? আমাদের কমিটমেন্টটা সুস্থ প্রকাশের জায়গা পাচ্ছে না।



মাথায় ইচ্ছাগুলো আছে। ইচ্ছাগুলোকে প্রবাহিত করতে হয়। হিমালয়ের মাথায় বরফ জমে আছে, সেই বরফটা নদী হয়ে বেরিয়ে এলে তারপর তো প্রবাহিত হয়ে দেশকে উর্বরা করবে। আমাদের বরফ শুধু জমেই আছে। প্রবাহিত হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? তার প্রথম কারণ হল দর্শক কমে গেছে। পেশাদার মঞ্চ উঠে গেছে প্রায়। কারণ আমাদের পেশাদার মঞ্চের দর্শক ছিল আধা সামন্ততান্ত্রিক। এবং ওই ধরনের নাটকগুলোই তাদের খুশি করার জন্য লেখা হত। গত পঁচিশ বছরে সেই আধাসামন্ততান্ত্রিক দর্শকের মনস্তত্ত্ব পাল্টে গেছে। বাম রাজনীতি, বিশেষ করে পঞ্চায়েতের কাজের ফল এইটা। সমাজবাদী একটা দৃষ্টিভঙ্গি এসেছে। এবং যৌথ পরিবারের সেই স্যাঁতসেঁতে পারিবারিক ভঙ্গিটা নাটকে আর প্রতিফলিত হলে চলবে না। ওইসব ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটক আর চলে না। দেবনারায়ণ গুপ্ত শরৎচন্দ্রের অনেক কাহিনিকে নাটক করে চালাতে চেষ্টা করেছিলেন। শেষ দুর্গন্ত চেষ্টা করেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নানা ধরনের নাটক করে কিন্তু ফেরা বা নামজীবন বা নীলকণ্ঠের মতো নাটক যিনি করেছেন তাকে শেষ পর্যন্ত খটকবিদায়-এর মতো নাটক করতে হল। তিনিও অবশ্যেষে পেশাদার মঞ্চ ছেড়ে গেলেন। কেন না ততদিনে দর্শকদের মেজাজ পাল্টে গেছে। পেশাদার মঞ্চের দর্শকের সামাজিক পরিকাঠামোটাও পাল্টে গেছে। সেটা ফেরানো যাবে না। কারণ সমাজটা ওভাবে পাল্টানো যায় না, ফিরিয়ে আনতে পারবে বলে যতই চেষ্টা করুক, স্টার থিয়েটার খুলুক—হবে না। আসলে আমাদের দরকার দর্শক কীভাবে কমছে, কেন কমছে সেটা দেখা। না হলে থিয়েটার বাঁচবে না। থিয়েটারও তো একটা কমোডিটি, আর তাই যদি হয়, তবে একটা বিপণনের ব্যাপার থাকেই। ঠিক হলে তুমি যে নাটক দেবে দর্শক তাই নেবে, এবং সেই দর্শকের মন মেজাজটা যদি গুলিয়ে থাকে, তা হলে সেই দর্শককে মানসিকতায় যে নাটক দেওয়া হবে সে কী করে তা নেবে। এখানেই আমাদের একটা দ্বন্দ্ব চলছে। সেই দ্বন্দ্ব থেকে উত্তীর্ণ হয়ে এখনও বেরিয়ে আসতে পারিনি আমরা। হয়ত পারব আরও কিছু পরে।

তার ফলে হচ্ছে কি, আজকে এত দল, অথচ কটা দলের নাটকে দর্শক হয়? মাঝখানে সায়ক কয়েকটা নাটক করে পর পর খুব সফল হয়েছে। অসিত মুখোপাধ্যায় কয়েকটা পর পর কাজ করলেন শেষের দিকে—তখন বিকল, আকরিক, জন্মদিন, অসিতবাবু তো চলে গেলেন। অরুণ মুখোপাধ্যায় প্রায় কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন, তাঁর ছেলে সুমন অবশ্য ভাল কাজ করছে। তারপর বিভাস, সে তো নিজের দলে আর প্রায় নাটক করেই না। আর করলেও তেমন সাড়া জাগায় না। শেষ ভাল নাটক করেছেন সেই হিসাবে ১৯৮৬ তে মাধব মালঞ্চী কইন্যা। অথচ বিভাসের মতো শক্তিশালী পরিচালক কমই হয়। বহুরূপীর





ক্ষেত্রেও তাই, নিন্দাপন্দই বোধহয় শেষ ভাল নাটক। তাও দর্শকরা কাকাতুয়া বা মুচ্ছকটিকের মতো নাটক নেয়নি। মুচ্ছকটিক পরিচালনা করেন কুমার রায় ১৯৭৯তে। তার মানে বামফ্রন্ট আসার পরে। বামফ্রন্ট আসার পর থেকে যে ভাল ভাল নাটক হয়েছে, লোকে নিয়েছে, আজকে তার মধ্যে একটা ভাঁটা দেখা যাচ্ছে কেন? কারণ সামাজিক হতাশা বেড়ে গেছে। আমরা আমাদের সময়টাকে ঠিকমত ধরতে পারছি না, ব্যাখ্যা করতে পারছি না। তার ফলে সমস্ত নামী নাট্যকারের নাটক হয়ে যাচ্ছে দেবীমূর্তির মতো। সবগুলো মুখ এক রকম। যেমন ভাদু মূর্তি তৈরি হয় সব একইরকম। তাঁরা অনেক নাটক লেখেন, প্রযোজনা হয় কিন্তু সবগুলো প্রায় একই রকম। তারপর আরেকটা অসুবিধা আছে, সেটা হচ্ছে প্রযোজনা ব্যয়। বড্ড বেড়ে গেছে। কারণ প্রতিযোগিতা বেড়েছে। প্রতিযোগিতা বাড়লে উপস্থাপনার ব্যয় বাড়বেই—বিপণন তো, বিপণন থাকলে খরচ বাড়বেই। আমার কাছে রক্তকরবীর হ্যান্ড বিল আছে, উৎপল দত্তর সুন্দর প্রযোজনা অঙ্গারের আছে। বহুরূপীর ইদিপাসের আছে। তখন তো বহুরূপীর খুব রমরমা যাচ্ছিল। আরও অনেক আছে। এখন অত ম্যাড়মেড়ে হ্যান্ডবিল সাধারণভাবে বিশেষ কেউ করে না। কারণ মার্কেটিং। তখন এখনকার মতো স্পনসরশিপ ছিল না। এত দৌড়াদৌড়ি ছিল না। কেন না প্রযোজনাব্যয় বেড়েছে, হলের ভাড়া বেড়েছে, একটা নাটকের প্রযোজনার প্রাথমিক ব্যয় এখন মোটামুটিভাবে পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা। কটা দলের সামর্থ আছে? একটা ছোট দল যদি এই টাকাটা কোনও মতে খরচা করেও, তারপর প্রত্যেকটা শো পিছু খরচা বারো থেকে পনেরো হাজার টাকা। কি করে টানবে? কল শো ছাড়া শুধু হল শো-তে দল বাঁচে না। কিন্তু কটা দল কল শো পায়? অভিনেতা অভিনেত্রীরা তো প্রায়ই কোনও পয়সা পায় না। কিন্তু টেকনিক্যাল হ্যান্ডসদের তো দিতেই হবে। তা হলে বিজ্ঞাপন দিতে, হলকে, অন্যান্যদের সবাইকে টাকা দিতে হবে অথচ নাট্যকার বা অভিনেতা—অভিনেত্রী যাদের ওপর ভিত্তি করে নাটক গড়ে উঠছে, তাদের বেলায় কিছু নেই। এ ভাবে কি খুব বেশি দূর যাওয়া যায়?

আগে এই খরচগুলো কম ছিল এবং এতটা প্রতিযোগিতাও ছিল না। তার মধ্যেও চলেছে। উৎপল দত্ত চাকরি করতেন, সেটা ছেড়ে দিলেন। শুধু থিয়েটার করেছেন। পরে প্রচণ্ড ক্ষমতা ও প্রতিভার বলে ফিল্মেও অভিনয় করেছেন। ছায়ানট বা নীচের মহল ব্যর্থ হয়, অঙ্গার থেকেই তার থিয়েটার সব দিক থেকে একটা স্টেডি থিয়েটারের জায়গায় চলে এল। স্টেডি না হলে কুশীলবদের জীবনযাপনের উপযোগী হতে পারে না। আগে এটা সম্ভব ছিল কারণ সকলেই প্রায় চাকরি বাকরি করতেন। বহুরূপী বা লিটল থিয়েটারের প্রায় সবাই চাকরি করতেন। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় একমাত্র যিনি থিয়েটারে কোনও দল বদল করেননি—তিনি চাকরি করতেন। আজকে কটা ছেলে বলতে পারে যে আমি চাকরি করে নাটক করছি। এখন তরুণ বয়সের ছেলেমেয়ে চাকরি পেয়ে এ সব করছে এটা খুবই কম। কাজেই তারা সমাজের দিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, শিল্পের দিক থেকেও অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। এরা কী করে এত বঞ্চনা নিয়ে সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তুলবে?

এখন স্পনসরশিপের জন্য বড় বড় কোম্পানিগুলোর কাছে যেতে হয়। তারা হয় বিজ্ঞাপন দেয় বা অন্য ভাবে টাকা পয়সা দেয়। আবার কটা কোম্পানিই বা সেটা দেয়। এ তো শুধু বিজ্ঞাপন দেওয়া বা টিকিট ছাপিয়ে দেওয়া নয়। যে বড় কোম্পানিগুলো ভাল পরিমাণ টাকা দেয় তাদের মালিক কারা? সেই মালিকরা কখনওই চাইবেন সমাজের পরিবর্তন হোক বা এক্সপ্লয়টেশনটাই বজায় থাক। চাইবে, এটা চাইবে আবার দায়বদ্ধ থিয়েটারকে স্পনসর করবে—একটা বৈপরীত্য আছে না? তবু তারা করে, কারণ তারা আসলে স্পনসরশিপের মধ্য দিয়ে একটা পরিকাঠামো তৈরি করে এই ভাবে যে—তোমরা যারা পাচ্ছ তারা আমাদের মতো বিগ হাউসদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকো। তারা যে কাজকর্ম করবে তার প্রতিবাদ করো না, মঞ্চে এনো না। সেটা ধীরে ধীরে ইনজেক্ট করতে করতে আজকে বাংলা থিয়েটারের দশা কী জায়গায় এসেছে। ভাল নাটক মানেই কিন্তু রাজনৈতিক নাটক সেটা কতটা ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে দিয়েই প্রতিফলিত হোক না কেন। ডলস হাউস রাজনৈতিক নাটক। চেরি অর্চার্ড রাজনৈতিক নাটক। কিন্তু সোচ্চার ভাবে রাজনীতি আসেনি। ব্রেখটের মাদার কারেজ বা গালিলিওর মতো অত ভাল রাজনৈতিক নাটক খুব কম হয়েছে। কাজেই ব্যক্তিগত বা সামাজিক বা রাজনৈতিক যে সম্পর্কের ভিতর দিয়ে আসুক না কেন, যদি সেটা ভাল নাটক হয় তবে সেটা রাজনৈতিক নাটক হবেই। এ রাজনীতিটাকে ব্যাখ্যা করার মতো অবশ্য তার যোগ্যতা থাকা দরকার। কাজেই স্পনসররা তো চাইবেই যাতে বিগ হাউসগুলো আক্রান্ত না হয়, সুস্থ থিয়েটার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এটাও কি সম্ভব? মাঝামাঝি আপোস করতে হবে।

এটা কি করে কেউ, আর করলেও কতদূর এগুনো যাবে? ওরা খানিকটা সুতো ছাড়ে। তারপর যখন থিয়েটারের পরিকাঠামোটা ধ্বসে হয়ে যায় তখন নিজেদের গুটিয়ে নেয়। এটা ওরা করে অত্যন্ত পরিকল্পনা মাফিক। এখন যে স্পনসরশিপ কমে আসছে ধীরে ধীরে। তার বিকল্পটা কী? না, নাট্য আকাদেমি। নাট্য আকাদেমি গত ১০ বছরে বহু টাকা খরচ করেছে। এই তো ২০০২ সালে নাট্যমেলাই করেছে প্রায় ১৪ লাখ টাকা খরচ করে। তার আউটপুট কতটা হয়েছে এ নিয়ে আমরা প্রশ্ন তুলতে পারি।

তবে এটা ঠিক একটা আলোড়ন তোলা গেছে। ২০০২-এ বোধহয় কথা যাবে না, যদি না পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়। যদি উন্নতি হয় তা হলে হয়ত করা যাবে। তা হলে স্পনসরশিপের বদলে যে বিকল্প বন্দোবস্ত, সেটাকে গড়ে তুলতে হবে। তার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু সরকারি ব্যবস্থার মধ্যেও নানা চোরা স্রোত আছে। ফলে নাটকের দলগুলো হয়ে যাচ্ছে কিছুটা যেন সুবিধাবাদী। একটা অদ্ভুত বিষয়, কিছু বলার নেই।

আমার মনে আছে উত্তরবঙ্গের একটা দল, নাম করছি না, বাংলা রঙ্গমঞ্চের দুশো বছরে নাট্য আকাদেমির পক্ষ থেকে কিছু কিছু পরিচালককে বেশ ভাল পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়েছিল— এ দলটিও টাকা পেয়েছিল। তার পরিচালক এল। মীর মোশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' নাটকটা খুঁজে পাচ্ছেনা। আমার কাছে এল। আমার কাছে ছিল, আমি জেরক্স করে দিলাম। তারপর বলল এটা কেন করছি আপনি লিখে দিন। কোনও দিন পড়েনি তো, অথচ করতে হবে একটা প্রগতিশীল নাটক। অনেক নাম শুনেছে। সেটাও দিলাম। তারপর কী কী বই পড়ব বলুন, কারণ ওটা উনিশ শতকের বাংলা দেশের কৃষক সমস্যা নিয়ে। কয়েকটা বইয়ের নাম লিখে দিলাম। এর পরও উত্তরবঙ্গ থেকে মাঝে মাঝে ফোন করে কী করবে না করবে জানতে চেয়ে। তাও বললাম। তারপর এক সুপ্রভাতে জানতে পারলাম ওরা কলকাতায় এসে নাটকটা করে গেছে। আমাকে জানায়নি। অর্থাৎ যতটুকু সময় পর্যন্ত আমাকে দরকার হয়েছে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। এই ধরনের ইনসিনসিয়ারিটি গ্রো করেছে। এমন উদাহরণ আরও আছে। অন্য দিকে সুবিধাবাদের যেন একটা বিশাল টানাপোড়েন চলেছে। এই নৈরাজ্যকে স্বীকরণ করে নিয়েই হয়ত আমাদের থিয়েটার ভবিষ্যতে বাঁক নেবে।

তা ছাড়া যেটা হয় তা হল অ্যাকাডেমিতে নাটক হচ্ছে হয়ত। যারা থিয়েটারের লোক তারা পরিচিত তাই কমপ্লিমেন্টরি নিয়ে নাটক দেখছে, এটা অনেকেই দেখেন। তাতে আর যাই হোক থিয়েটারের খরচা তো ওঠে না। তবে এই জিনিসটার একটা ইতিবাচক দিক আছে— যদি বেশি লোক দেখে, তবে লোকে বুঝবে এত লোক যখন ভিড় করছে তা হলে নাটকটা ভাল হয়েছে। একটা হুইসপারিং ক্যাম্পেন হয় এতে। ভাল নাটক হলে ভাল আর যদি ড্যামেজ করার ইচ্ছা থাকে তাও করে দেয়। সেটা অনেক সময় খাঁটি ভাবে বলে, কখনও কখনও অসৎ ভাবে বলে। তাতে কিন্তু থিয়েটারের অর্থনীতির উন্নতি হচ্ছেনা। এটা না হলে জীবনযাপনের পদ্ধতি সুস্থ হচ্ছেনা। আর জীবনযাপনের পদ্ধতি সুস্থ না হলে সুস্থ জীবনবোধ আসবে কী করে।

এই পরিস্থিতিতে আজকে আমরা ২০০২ সালের এই সময়টাতে এসে পৌঁছেছি। জানি না এর পর আমাদের কাঠামো কী হবে। রাজনীতি যে ভাবে পাল্টে গেছে, ২৫ বছর আগেকার রাজনৈতিক চিন্তাধারা, অর্থনৈতিক চিন্তাধারা এগুলো পাল্টে গেছে। পাল্টাতে বাধ্য কারণ পশ্চিমবঙ্গ তো দেশছাড়া নয়। সারা দেশে যে ধরনের সুবিধাবাদ ও মৌলবাদ রয়েছে, জাতপাত নিয়ে যেভাবে রাজনীতি হচ্ছে, ভারতবর্ষ পঞ্চাশটা রাজ্যে বিভক্ত হবে কি না, রেল বিভাজন হবে কি না এ সব নিয়ে কুৎসিৎ রাজনীতি হচ্ছে। গুজরাতের মতো ঘটনা ঘটছে। এটা এনকাউন্টার করার জন্য নাট্যকর্মীদের যা করার দরকার আমরা কি সেটা করছি? রাজনৈতিকভাবেও যেটা করা দরকার সেটাও কি আমাদের করা হচ্ছে? এই যে হচ্ছে না এটা কিন্তু উদ্বেগের ব্যাপার। আমরা কোন দিকে যাচ্ছি? সমাজ যদি না বাঁচে, তার অর্থনীতি যদি না বাঁচে, মানুষগুলো যদি না বাঁচে তাহলে থিয়েটার কি বাঁচবে? অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?

তবু আমার মনে হয় গ্রুপথিয়েটার বা গণনাট্য পত্রিকা সকলের সঙ্গেই আমার বন্ধু সম্পর্ক, তারা এক সঙ্গেই চলছে তবু এদের আমার মনে হয় রুগ্ন। কারণ ওই যে বললাম সুস্থ সংস্কৃতি করতে গেলে যে ধরনের সমাজকে ব্যাখ্যা করা দরকার, সেই ব্যাখ্যা করে জিনিসটাকে শিল্পে রূপান্তরিত করা দরকার সে রকম গঠন মূলক তেমন কিছু হচ্ছে না। নাটক বা প্রবন্ধ হয় খুব ম্যাড়মেড়ে। কিছু দিন আগে দেখলাম গণনাট্য পত্রিকায় একজনের লেখা, তাঁকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি। তাঁর একটা সাক্ষাৎকারে তিনি বলছেন বহুরূপী রাজা অয়দিপাউস করেছিল ওটা ভুল ছিল। ৬৪ তে যখন নাটকটা শুরু হয় তখনও এ প্রশ্ন উঠেছিল। — কিন্তু 'এটাতো ভারতীয় আদর্শের পরিপন্থী—' এ কথা তিনি কেন বললেন? ভারতীয় আদর্শ বলতে কী বোঝায়? যেহেতু না জেনে এক মহিলা তার সন্তানকে বিবাহ করেছিলেন, সন্তান উৎপাদন করেছিলেন সেহেতু ভারতীয় আদর্শের পরিপন্থী। তা হলে ভারতীয় আদর্শ কি এক নারীর পাঁচটা স্বামী থাকা? বা রমণীদের নদীতে নগ্ন করে তাদের পোশাক নিয়ে গাছে উঠে যাওয়া? তার চেয়েও বড় কথা বোধিসত্ত্ববাদান কল্পলতা বলে একটা বই আছে দশম শতাব্দীতে লেখা। জাতকের গল্প— এক রমণী তার যৌন তাড়নায় কোনও পুরুষ না পেয়ে পরিচারিকার সাহায্যে নিজের যুবক ছেলের সঙ্গে অন্ধকারে মিলিত হয়। — এটাই কি ভারতীয় আদর্শ? অর্থাৎ আমাদের নাটকের বোধ এখনও তেমন জন্মায়নি, আমরা কতকগুলো ছাঁচে ফেলে নাটক দেখি। অত ছাঁচে ফেলে শিল্প হয় না। তখন ইডিপাস নিয়ে এই মন্তব্য কি ঠিক? যে নাটকটা আড়াই হাজার বছর ধরে টিকে আছে তাকে কি ওভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায়? এটা তো বোধের অভাব। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছিলেন মহাকাব্য পড়তে হয় না, না পড়েই মন্তব্য করা যায় কারণ সবার মনে তা ভাসছে। রামায়ণ মহাভারত ভাল কিন্তু কেন ভাল সেটা তো আমরা বিচার করে দেখিনি বিশেষ।



একটা সময় ছিল যখন বঙ্কিমচন্দ্রকে বলা হত প্রগতি বিরোধী, রবীন্দ্রনাথকে কম আক্রমণ করা হয়েছে? যখন আমরা আড়িয়াদহ গণনাট্যে রক্তকরবী, ফাল্গুনী এগুলো করেছি তখন কিন্তু অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় নেতা বলেছিলেন গণনাট্যের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তারা রবীন্দ্রনাথ করছে। আজ রবীন্দ্রনাথ বলতে আমাদের জিভে জল ঝরে যায়। রবীন্দ্রনাথকে উচ্চারণ করার যোগ্যতা তৈরি হয় এমন কিছু কি সত্যিই আমরা ভেবেছি? কাজেই শিল্পের বোধটা আগে জন্মাতে হবে। শিল্পের বোধ এমনি হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'লেজই বল আর কবিত্বই বল ভিতর হইতে বাহির না হইলে টানিয়া বাহির করা যায় না।' কাজেই বোধ কিসের থেকে হতে পারে এ নিয়ে প্রচুর আলোচনার দরকার। এই আলোচনার অভাব আছে আমাদের। পত্রিকাতে কিছু ক্লাসিক নাটক, যা এখনও পৃথিবীতে প্রযোজিত হয়, তাদের অনুবাদ করে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। অর্থাৎ বোঝানো কেন এটা ভাল নাটক। সে কাজটা গ্রুপ থিয়েটার বা গণনাট্য কটা করেছে? তারপর ঠিকঠাক ক্লাস করা। ওই নাট্য আকাদেমিতে যেভাবে ক্লাস হয়— ওই ওয়ার্কশপ, ওয়ার্কশপ মানে কারখানা। তার মধ্য দিয়ে নাট্যপ্রয়োগ শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। বিজ্ঞান ও শিল্পকে মেলানোর চেষ্টা চলে। এটা নিয়ে আরও পরিকল্পনা নেওয়া দরকার, গ্রুপ থিয়েটার ও গণনাট্যও এক সঙ্গে বা আলাদা ভাবে দুজনেই একাজ করতে পারে। লোকজন ডেকে ভাল ভাবে আলোচনা করে দেখানো যেতে পারে কোথায় দুর্বলতা। প্রসঙ্গত আরও কিছু তথ্যের কথা উল্লেখ করা যায়। ষাটের দশকে নান্দীকার অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় পিরানদেল্লোর একাধিক নাটক মঞ্চস্থ করেছিল। বামপন্থীদের কোনও কোনও মহলে তা নিয়ে কম আলোড়ন হয়নি। পিরানদেল্লো মুসোলিনির সমর্থক, তাই তাঁর নাটক নাকি প্রতিক্রিয়াশীল। বহু পরে যখন গ্রামশির রচনা আমাদের হাতে এল, দেখা গেল তাঁর বহু লেখায় পিরানদেল্লোর নাটকের প্রশংসা। মার্কসীয় তাত্ত্বিক হিসাবে গ্রামশির খ্যাতি জগৎজোড়া। তাই আমরা ঢোক গিলতে বাধ্য হলাম। এ ধরনের বোধকে আমরা কী বলব? কিছু দিন আগে একজন আলোচকের লেখায় দেখা গেল অদ্ভুত এক তত্ত্ব। সত্তরের দশকে কলকাতার মঞ্চে যখন ব্রেখটের কিছু নাটক বাংলা চেহারায় প্রযোজিত হয়েছিল সেটা নাকি ছিল সমকাল থেকে পলায়ন। আবার এখন যাঁরা ব্রেখট করছেন তাঁরা অত্যন্ত প্রগতিশীল। সত্তরের দশক কিন্তু অনেক কঠিন ছিল। তা ছাড়া এ যুক্তি যদি স্বীকার করতে হয় তা হলে বলতে হবে ব্রেখট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে যে সব নাটক জার্মানিতে থাকার সময় লিখেছিলেন সেগুলো আমেরিকায় বাসকালে লিখিত নাটকগুলোর থেকে শক্তিশালী। অথবা সবগুলো নাটকই খারাপ। কেন না ফ্যাসিস্ট জার্মানি অথবা সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার মধ্যে ফারাক কতটুকু? ব্রেখটকে এমন যান্ত্রিকভাবে বিচার কেন করা হবে?

যাই হোক ভাল নাটক অনুবাদ করে এবং পুরনো নাটক ছাপিয়ে এবং তার বিশ্লেষণ করতে হবে কেন এটা ভাল নাটক— এবং সেটাকে বোঝাতে হবে। সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছোট বড় মাঝারি দেশি বা বিদেশি নাটক অনুবাদের অথবা পুনর্মুদ্রণের প্রচুর প্রয়োজন আছে, পৃথিবীটা এখন ওয়েবসাইটের যুগে ছোট্ট হয়ে গেছে, কাজেই আমাদের তো খোঁজ নিতে হবে কোথায় কী হচ্ছে। আজকে তো আফ্রিকা জেগে উঠেছে, লাতিন আমেরিকা জেগে উঠেছে সেখানে বা অন্যান্য দূরবর্তী জায়গায় কত মারাত্মক মারাত্মক নাটক হচ্ছে। আমরা সমগ্র পৃথিবীর নাট্য আন্দোলন থেকে কেন পিছিয়ে যাব? সেই নাটকগুলো ও তার তথ্যগুলো আমাদের দরকার, সেটা তো একজনে পারে না। তার জন্য একটা টিম ওয়ার্ক দরকার। এই তো বার্টল্ট ব্রেখটের সব নাটক অনুবাদ হয়নি এখনও। এ ছাড়া কাইজার, পিটার ভাইস, দারিও ফো প্রভৃতির নাটক তো আছে। এ রকম বহু নাটক আছে। আমেরিকান বা লাতিন আমেরিকান নাটক আছে। সোভিয়েত রাশিয়ারও নাটক আছে। একটা টিম তৈরি করে সিলেক্শন করতে হবে নাটকগুলো। এর সঙ্গে দরকার কিছু প্রবন্ধও। রোমা রঁলাঁর পিপলস থিয়েটার অনুদিত হয়েছে কিন্তু পিইসকাটোরের পলিটিক্যাল থিয়েটার বা ব্রেখটের অনেক প্রবন্ধের এখনও অনুবাদ হয়নি। কেন হয়নি? এটা করা তো দরকার। আমরা রবীন্দ্রনাথকেই বা কতটুকু আবিষ্কার করতে পেরেছি। এই আবিষ্কার তো থিয়েটারের পত্রিকারই করা দরকার। চেতনা বৃদ্ধির জন্য স্পষ্টতার প্রয়োজন এবং স্পষ্টতা আনার জন্য নিরবচ্ছিন্ন আলোচনার প্রয়োজন। এখন হয় কি না জানি না, আগে হত, রমনের বাড়িতে সপ্তাহে একটা দিন বসে খোলাখুলি আলোচনা হত। এগুলো হলে ভাল হয়। এসব কাজ প্রচুর করা যায়। কেউ কেউ অন্ধবিশ্বাস থেকে বলে এটা ওই হয়েছে ওটা নাটক হয়নি ইত্যাদি। বিশ্বাসটা যাই হোক অন্ধতা কিন্তু অন্ধতাই।

# স্বর্ণকুমারী দেবীর ছোটগল্পে সমকালীন সমাজভাবনা

নাজিমুল হক

সমাজ ও সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা সচেতন পাঠকের অবিদিত নয়। সাহিত্যিক সামাজিক জীব হিসাবে যেমন সমাজসচেতন হয়ে থাকেন, তেমনই তাঁর সৃজনশীল সত্তা বিশেষ সমাজকালের পরিপ্রেক্ষিতে লালিত হয়।

স্বাভাবিকভাবে সমাজ চেতনে কিংবা অবচেতনে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে প্রভাব ফেলে। কিন্তু তা বলে ওই বিশেষ সমাজ-কালের মধ্যে আবদ্ধ থাকলে সাহিত্যের চলে না। সমকালীন সমাজ চেতনাকে বুকে নিয়ে কালান্তরের সহৃদয়ে তার চিরপ্রতিষ্ঠা। আসলে সমাজ-সচেতন সাহিত্যিক সমকালীন সমাজজীবন থেকে আহৃত বিষয়গুলিকে প্রতিভাগুণে চিরন্তন অনুভূতির উদ্দীপক করে তোলেন। তাই পরবর্তীকালে ওই সমাজ-রূপের পরিবর্তন ঘটলেও তার সাহিত্যটি কিন্তু পুরাতন হয় না। প্রধানত দুটি কারণে—

১. পরিবর্তিত বিষয়টি তখন সমাজ-ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে পড়ে। আর পুরাতনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে চিরকালের ভাবুক মন।
২. পরিবর্তিত বিষয়টির মধ্যেও শাশ্বতকালের মানবহৃদয়ের অনুভূতি বর্তমান থাকে।

যেমন সতীদাহ কিংবা বাল্যবিবাহ ইত্যাদি বিষয়গুলি আজকের সমাজ থেকে প্রায় অপসৃত। তাই সেগুলি আজ আমাদের সমাজ-ইতিহাসের বিষয়। আর সাহিত্য হল সে ইতিহাসের জীবন্তরূপ। এ ছাড়া থাকে তার নান্দনিক দিক। রীতি কিংবা প্রথা অবশ্যই পুরাতন হয়। কিন্তু তা থেকে সৃষ্ট অনুভূতিগুলি কখনও পুরনো হয় না। তাই সতীদাহ কিংবা বাল্যবিবাহের বিষয় নিয়ে রচিত সেকালের অথবা পরবর্তীকালের কোনও করুণ সাহিত্য আজও আমাদের সমানভাবে ব্যথাতুর করে তোলে। তখন দুঃখের অনুভূতিটিই বড় হয়ে ওঠে, অনুভূতির কারণটি নয়। তবে একইকালের বিভিন্ন শিল্পীর সাহিত্যে প্রতিফলিত সমাজের রূপ একই রকম নাও হতে পারে। এখানেই জড়িত থাকে শিল্পীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টি।

সাহিত্যিক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমকালীন সমাজকে দেখেন এবং ওই সমাজ আহৃত বিষয়ের সঙ্গে নিজস্ব কল্পনার সুসমন্বয়ে তাকে সাহিত্যে তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে আমরা ঊনবিংশ-বিংশশতাব্দীর লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর ছোটগল্পে তাঁর সমকালীন সমাজকে অনুসন্ধান করতে চাই। অনুধাবন করতে চাই লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপটিও। প্রসঙ্গত আমাদের মনে রাখতে হবে, সাধারণ আয়তনের ক্ষুদ্রতা এবং ব্যঞ্জনাধর্মীতার কারণে ছোটগল্পে সমাজের বিস্তৃত পরিচয় সম্ভব নয়। আভাস-ইঙ্গিতের মাধ্যমেই এখানে সমাজের রূপটি ব্যঞ্জিত হয়।

স্বর্ণকুমারী দেবীর গল্প রচনার কালসীমা মোটামুটি ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রসারিত। সে সময়ে এ দেশের সমাজে নানা ভাঙন-গড়ন চলছিল। পুরাতনের ভাঙন আর নতুনের গড়ন।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ মহাত্মাগণের নেতৃত্বে সমাজ সংস্কারের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তা এ সময়ে আরও বেগবান হয়, ব্যাপক রূপ পায়। বিশেষত ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিরোধ, বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন, স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ও নারীস্বাধীনতার স্বীকৃতি ইত্যাদি বিষয়গুলি সমাজ-জীবনে বিরাট আলোড়ন তোলে। সে সব সামাজিক আলোড়নের অনুরণন সমকালের অনেক শিল্পীর সাহিত্যে বিচিত্রভাবে ধ্বনিত হয়েছে।

স্বর্ণকুমারী দেবীর সামাজিক গল্পগুলিতে ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর সামন্ততান্ত্রিক সমাজজীবনই প্রতিফলিত হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত রুগ্ন কিংবা স্ফীত পরিবারগুলির হাসি-কান্নার জীবন এখানে গল্প হয়ে ধরা পড়েছে। সমকালীন বাল্যবিবাহ, বালিকাবধূর নানা দুঃখ-যন্ত্রণা, নারীর শিক্ষালাভ ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ, নারী-পুরুষের দাম্পত্যজীবনের স্বরূপ, বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ সমস্যা ইত্যাদি এ সব গল্পের বিষয়। এমনকী সেকালের স্বদেশি আন্দোলনের তরঙ্গ-বিক্ষোভও কোনও কোনও গল্পে পরিলক্ষিত হয়। আর এ সবের মধ্যে বিধৃত হয়েছে লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়।

বাল্যবিবাহের প্রতিফলন অনেক গল্পেই ঘটেছে। বলাই বাহুল্য, এ বিবাহে পাত্র-পাত্রীর নিজস্ব মতামতের কোনও প্রশ্নই ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে মহিলারা নিজেদের ঘনিষ্ঠ সখিত্বের সূত্রে





অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র-কন্যার বিয়ে নিজেরাই ঠিক করে ফেলেছে। যেমন —

১. 'মালতী' গল্পে রমেশের মা তার মৃতা সখির কন্যা মালতীর সঙ্গে পুত্রের বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।
২. 'গহনা' গল্পে 'ভাবিনী ও নলিনের মা তাদের পুত্র-কন্যার বিয়ে স্থির করেছে।
৩. 'বিজয়ার আশীর্বাদ' গল্পে সাগর ও বারুণীর বিয়ে তাদের মায়েরা ঠিক করেছে।

এরূপ সরলভাবেই সেদিনের সমাজ বালিকাকে বধূ হিসাবে বরণ করেছে। তাই স্বর্ণকুমারী দেবীর গল্পের নারীরা প্রায় সকলেই সরলবালিকা বধূ। যেমন —

১. 'লজ্জাবতী' গল্পের লজ্জাবতী ও তার ননদ ফুলকুমারী।
২. 'যমুনা' গল্পের যমুনা
৩. 'পূজার তত্ত্ব' গল্পের সুশীলা
৪. 'স্বপ্ন না কি?' গল্পের নায়িকা
৫. 'কান্তিবাবুর খোসনাম' গল্পের শান্তি
৬. 'তিনটি দৃশ্য' গল্পের ধনিষ্ঠা ইত্যাদি

এই সরলা বধূদের অনেকেই কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে নির্যাতিতা, লাঞ্ছিতা। লজ্জাবতী শিশুসুলভ সরল লজ্জার আড়ষ্টতায় সদা সঙ্কুচিত। এই স্বভাবের জন্য সে বাবা-মার কাছে আদৃতা হলেও স্বামীর ভর্ৎসনা, এমনকী ঝিয়ের বিরূপতাও তাকে সহ্য করতে হয়। দুঃখই যার নিত্যসঙ্গী সুখ তার কপালে বুঝি সয় না। তাই ননদ ফুলকুমারীর উষ্ণভালবাসা যখন তার ভাগ্যে জুটেছে, তখন মৃত্যুও তার অমোঘবার্তা নিয়ে হাজির হয়েছে — অকালেই ঝরে যেতে হয়েছে লজ্জাবতীকে। ফুলকুমারী লজ্জাবতীর মতো অত্যাচারিতা বধূ নয়। বরং সে বড়লোকের আদরের বৌমা। কিন্তু বিয়ের পর অবস্থাপন্ন শ্বশুরের আভিজাত্য রক্ষার্থে সে অপেক্ষাকৃত অবস্থাহীন পিত্রালয়ে চোদ্দ বছর আসতে পায়নি। নারীজীবনে এও কম লাঞ্ছনা নয়। যমুনার জীবন দুঃখ-বেদনার কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত। বঞ্চনাই তার ললাটলিখন। পিতৃ-মাতৃহীন অসহায় যমুনাকে জনৈক বিবাহিত পুরুষ ছলনা করে বিয়ে করেছে এবং বিয়ে করেও ছলনা করেছে। স্বামীর কাছে যমুনা স্ত্রীর মর্যাদার বদলে পেয়েছে দাসির পরিচয়। তাই সে প্রতিবাদ করে ফিরে এসেছে। কিন্তু এই প্রতিবাদের শক্তিতেও সে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। অবশেষে জীবন্ত শ্মশানবাসিনী হয়ে তাকে শেয়াল-কুকুরের খাদ্যে পরিণত হতে হয়েছে। বাপের বাড়ির পাঠানো পূজার তত্ত্ব স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেদের পছন্দ না হওয়ায় সুশীলার লাঞ্ছিতা-অপমানিতা হবার চিত্রটি বর্তমান সমাজেও মোটেই পুরাতন হয়নি। বরং আজকের সমাজ সযত্নেই সে ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। নির্দয় পিতার মুখে শ্বশুরকুলের বদনাম শুনে যেভাবে সুশীলার চোখদুটি অশ্রুসজল হয়েছে, তাতে বাঙালি কন্যার সামাজিক সত্যরূপটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিলাসী-ধনবান স্বামীর উপেক্ষা ও অপমানের জ্বালা ধনিষ্ঠাকেও কম সহ্য করতে হয়নি। তবে শেষপর্যন্ত সে তার 'দেবী-সদৃশ তেজস্বিনী আভা'য় পাষণ্ড স্বামীকে পর্যুদস্ত করেছে। অনুতপ্ত স্বামী তার কাছে ক্ষমা ও আশ্রয় প্রার্থনা করেছে। কিন্তু সুশীলার এই 'তেজস্বিনী জ্যোতির্ময়ী মূর্তি' তেমন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি।

বরং নারীব্যক্তিত্বের সাবলীল বিকাশ দেখা যায় 'কান্তিবাবুর খোসনাম' গল্পের শান্তির মধ্যে। পিতার অকাল মৃত্যুতে মায়ের সঙ্গে সে মামার বাড়িতে লালিত। প্রায় সমবয়সী মামাতো দাদা কান্তি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় কোনওক্রমে পাশ করলেও শান্তি প্রথম বিভাগে পাশ করে। এরপর বিয়ে হয়ে যাবার কারণে তার পরবর্তী পড়াশুনায় ছেদ পড়লেও সাহিত্যচর্চায় সে কৃতিত্বের সাক্ষর রাখে। তবে এ ধরনের প্রতিভাময়ী নারীর শিক্ষালাভ ও ব্যক্তিত্বের বিকাশকে মেনে নিতে সেকালের অনেক পুরুষ যে বড় অপ্রস্তুত ছিল, তা কান্তির আচরণে ধরা পড়েছে। শান্তির প্রথম বিভাগে পাশ করা কিংবা সাহিত্য রচনায় তার কৃতিত্ব ইত্যাদিতে দাদা কান্তি নারীজাতির কাছে নিজের পরাজয়ের অপমানকে অনুভব করেছে। তাই সে সবান্ধব নারীর প্রতি উদারপুরুষের পক্ষপাতের অহেতুক অভিযোগ তুলে শান্তির মেধা ও প্রতিভাকে খাটো করতে চেয়েছে। এমনকী বোনের লেখা গল্প গোপনে চুরি করে নিজের নামে ছাপিয়ে সে খেতাবও অর্জন করেছে। স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদনায় 'ভারতী' পত্রিকায় সে সময়ে নারী-পুরুষের সামাজিক গুরুত্ব বিষয়ে উভয়পক্ষের যে তীব্র বাদ-প্রতিবাদ চলেছিল, তার প্রতিফলন শান্তি ও কান্তির কথোপকথনে দেখা যায়। এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়, সাহিত্যরচনার অর্জিত অর্থ দিয়ে শান্তি তার বিলেতে অধ্যয়নরত স্বামীর অর্থাভাব দূর করতে প্রয়াসী হয়েছে। নারীর নিজস্ব উপার্জন এবং তা দিয়ে স্বামীর সহযোগী হবার ব্যাপারটি নিছক কল্পকথার গল্পমাত্র নয়। এমন ঘটনা সেকালে খুব সুলভ না হলেও একেবারে দুর্লভও ছিল না। স্বর্ণকুমারী দেবী, ইন্দিরা দেবী, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী প্রমুখ প্রতিভাময়ী নারীদের উপস্থিতি তেমনই সাক্ষ্য দেয়। লক্ষ করার মতো আরও একটি বিষয় হল, আত্মবিকাশ ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শান্তি কোনও পুরুষের সহায়তা পায়নি, সে প্রত্যাশার মনোভাবও তার নেই। আত্মশক্তিতেই সে আত্মপ্রতিষ্ঠা পেতে চেয়েছে।

দাম্পত্যজীবনেও পুরুষকে নারীর ঘনিষ্ঠসঙ্গী হিসাবে তেমন চোখে পড়ে না। বরং সংসার-বন্ধনের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের শিথিলতাই পরিলক্ষিত হয়। সেখানে নারীকেই নারীর যথার্থ সহমর্মী সঙ্গীরূপে দেখা যায়। তাই স্বামী থাকা সত্ত্বেও লজ্জাবতী অনেকখানি নিঃসঙ্গ। তার স্বামী মায়ের কথায় নির্দোষ স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করে। পরে যদিও লজ্জাবতী তার অনুতপ্ত স্বামীকে

ক্ষণিকের জন্য ঘনিষ্ঠভাবে কাছে পেয়েছে কিন্তু তাতে রয়েছে নন্দ ফুলকুমারীর আন্তরিক সহায়তা। এখানে ফুলকুমারীই তার যথার্থ সহমর্মীসঙ্গী। 'কেন?' গল্পের বধূটি স্বামীপ্রেম বঞ্চিতা। দুশ্চরিত্র স্বামী অন্য নারীতে আসক্ত। সর্বংসহা সে বধূটিও শেষপর্যন্ত তার পতিকে অনুতপ্তাবস্থায় ফিরে পেয়েছে। কিন্তু তাও সম্ভব হয়েছে স্বামীর গোপন প্রণয়িনী ওই 'অন্যনারী'টির শুভবোধের জাগরণে, তার গোপন সহযোগিতায়। তা ছাড়া এখানে শাশুড়ি পুত্রের পক্ষ না নিয়ে বরং বৌমার পাশেই থেকেছেন, পাশে থেকেছে উমি দাসিও। 'যমুনা' গল্পের পুরুষটি ঘরে স্ত্রী-সন্তান থাকা সত্ত্বেও যেভাবে গোপনে যমুনাকে বিয়ে করেছে, তাতে তার সংসারবিচ্ছিন্ন বর্বর মানসিকতাই স্পষ্ট হয়েছে। বঞ্চিতা বধূ যমুনার প্রতি গল্পের বক্তা বধূটি সহানুভূতিশীল থেকেছে আদ্যন্ত। দাম্পত্য ব্যবধানের চিত্র আরও প্রকট দেখা যায় 'পূজার তত্ত্ব' গল্পে সুশীলার বাবা-মা'র মধ্যে। পূজার তত্ত্বকে কেন্দ্র করে আষ্টাসুখসর্বস্ব গৃহকর্তা যেভাবে স্ত্রী ও কন্যাকে রূঢ় কথা শুনিয়েছে, তাতে তাকে পত্নী কন্যার মানসসঙ্গী কিছুতেই বলা যায় না। সুশীলার জীবনে স্বামী নয়, দুঃখই তার নিত্যসঙ্গী। তাই মাতা-কন্যা পরস্পরের অবলম্বন হয়ে সুস্থ প্রজন্ম পালনের মধ্যে নারীজীবনের সার্থকতা সন্ধান করেছে।'তিনটি দৃশ্য' গল্পের ধনিষ্ঠার মা বিরাজের দাম্পত্যজীবনে স্বামীর উপস্থিতি তেমন অনুভূত হয় না। বরং গল্পের বক্তা রমণীটিকে স্নেহ-ভালবাসার সখি হিসাবে বিরাজের দুঃখময় জীবনে সদা বিরাজিত দেখি।

তবে দাম্পত্য জীবনের কেবল শৈথিল্যই নয়, দু'একটি গল্পে স্বামী-স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতার কথাও আছে। যেমন—'স্বপ্ন না কি'? গল্পের জীবন সরকার যথার্থই তার স্ত্রীর জীবনসঙ্গী। এ গল্পের নায়ক বিপন্না নায়িকাকে উদ্ধারও করেছে। কিন্তু সেখানে সামাজিক দায়িত্ব কিংবা পুরুষোচিত উদারতার চেয়ে রোমান্টিক আবেগই বেশি। কেননা বনভোজনে গিয়ে দিদির রান্নার তৎপরতা দেখে তার মনে হয়েছে—'ভাগ্যিস মেয়েজাতটা এখনও নিছক মেয়েমানুষই আছে, তাই তবু এখনও একটু-আধটু সেবাশুশ্রূষা পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু আজকাল মেয়েদের যে রকম পুরুষ গড়ে তোলার প্রস্তাব হচ্ছে, তাহাতে ভবিষ্যৎটা একেবারেই তিমিরাচ্ছন্ন, পুরুষবংশটা তা হ'লে একেবারেই নির্বংশ হবার বিশেষ আশঙ্কা আছে।' বরং কন্যার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিতা মিত্রানীর পাশে নায়কের দিদি যেভাবে স্নেহের সঙ্গে দাঁড়িয়েছেন, তাতে নারীর সহমর্মী হিসাবে নারী-ই বড় হয়ে উঠেছে।'গহনা' গল্পে সংসারের অভাব-অনটনে, সুখ-দুঃখে বিহারীবাবু ও তাঁর স্ত্রী ঘনিষ্ঠসঙ্গী হিসাবে কাছাকাছি থেকেছেন। পুত্রকে বিলাতে পড়াতে গিয়ে অর্থসংকটের অস্থিরতা, অর্থাভাবের কারণে বিনাচিকিৎসায় কন্যার মৃত্যু, আত্মীয়-পরিজনের অকৃতজ্ঞ আচরণ, পুত্রের গোপনে বিলাতে বিবাহ ইত্যাদির মাধ্যমে বিহারীবাবুর সংসার সমাজজীবনের এক জীবন্তরূপ।

বিধবাবিবাহ এবং বহুবিবাহর মতো সমস্যা দুটি-একটি গল্পে ছায়া ফেলেছে। 'অমরগুচ্ছ' গল্পের নায়িকা বালবিধবা। স্বামীকে তার ভালভাবে মনে পড়ে না। মৃত স্বামীর ছবিকে পূজা করার মধ্যেই সে স্বামীর নৈকট্য অনুভব করে। কিন্তু ঘটনাক্রমে একদিন সে দাদার বন্ধুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেকালে বিধবাবিবাহ আইন সিদ্ধ হলে কি হবে, সমাজের সর্বত্র তা গৃহীত হয়নি। তাই ওই যুবক আচার পালনের মধ্যে নায়িকার বিধবা পরিচয় পেয়ে গম্ভীরভাবে বিদায় নিয়েছে। তা ছাড়া 'অন্তত বিশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত খুব কম লেখিকাই প্রবন্ধ রচনাতেও বাল্যবিধবার পুনর্বিবাহ, কিংবা বৈধব্য-আচারের বিরোধিতার কথা সাহস করে লিখেছেন।' তাই এখানে দেখা যায়, শেষ পর্যন্ত মৃতস্বামীর ছবির মধ্যেই বিধবাকে সান্ত্বনা সন্ধান করতে হয়েছে। নিষিদ্ধ বহুবিবাহে অনেক পুরুষের উৎসাহ দেখা গেছে। যেমন —

১. 'যমুনা' গল্পের পুরুষটি বিবাহিত হয়েও ছলনা করে যমুনাকে বিয়ে করেছে এবং স্ত্রীর কাছে দাসি বলে ও অপরের নিকট " —" বলে যমুনার পরিচয় দিয়েছে। এই ছলনার পেছনে বহু বিবাহের নিষিদ্ধতার কারণটি থাকা স্বাভাবিক। তেমনই "—" পরিচয়ধারী কোনও নারীর সঙ্গে সম্পর্ক থাকার বিষয়টি নিশ্চয়ই অপরের কাছে আপত্তিকর ছিল না। তা হলে এখানে কেবল ওই পুরুষটিরই নয়, সেকালের পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ছলনাসিদ্ধ নগ্নরূপটি উদঘাটিত হয়েছে, যা ভূদেব চৌধুরীর ভাষায় 'পৌরুষের বর্বরতা'। পাশাপাশি তৎকালীন সমাজে অসবর্ণ বিবাহ অপ্রচলিত থাকার ইঙ্গিতও যমুনার কথায় স্পষ্ট হয়েছে।

২. 'চাবিচুরি' গল্পে বৃদ্ধ শ্রীমন্তের স্ত্রী-সন্তান বর্তমান থাকা সত্ত্বেও বালিকা সত্যবালাকে তার বিয়ে করার ইচ্ছার কথা জানা যায়।

৩. 'স্বপ্ন না কি?' গল্পে প্রৌঢ় ঘনশ্যাম ঘোষ মৃতবন্ধু হরনাথ মিত্রের বালিকা কন্যাকে বিয়ে করার জন্য নানা যড়যন্ত্র করেছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে তার সম্পত্তির লোভটিও কাজ করেছে। তা ছাড়া সদ্য তার স্ত্রীবিয়োগও হয়েছে।

সেকালের সাহিত্যে অর্থনীতির দিকটি যখন প্রায় উপেক্ষিত থেকেছে, তখন স্বর্ণকুমারী দেবী বিস্ময়করভাবে সেদিকে অল্প-বিস্তর আলোকপাত করেছেন। সমকালীন সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিতে ক্ষয়িষ্ণু, রুগ্ন কিংবা স্ফীত অনেক পরিবারের কথাই তিনি বলেছেন। আর সে অর্থব্যবস্থাতেও পুরুষের প্রভুত্বের দিকটি বিশ্বস্তরূপে অনাবৃত করেছেন কোনও কোনও গল্পে। যেমন —

১. 'কেন?' গল্পের পরিবারটি আর্থিকভাবে ক্ষয়িষ্ণু, "এককালে ছিল ভাল, এখন ভেঙ্গে পড়েছে—" পরিবারের পুরুষটির



লাম্পট্য ও বিলাসিতাই এই ক্ষয় কিংবা ভেঙে পড়ার অন্যতম কারণ।

২. 'লজ্জাবতী' গল্পে লজ্জাবতীর শ্বশুরবাড়ির চিত্রেও ওই ক্ষয়িষ্ণুতার চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে। অন্যদিকে ফুলকুমারীর শ্বশুর ধনীব্যক্তি। এই ধনগর্বেতিনি বৌমাকে দরিদ্র পিত্রালয়ে পাঠিতে অপমানিতবোধ করেছেন।

৩. 'বিজয়ার আশীর্বাদ' গল্পে বনমালীর পরিবারের আর্থিক অবস্থান চিত্রণে লেখিকা আরও চমক সৃষ্টি করেছেন।'গ্রামের মধ্যে সে (বনমালী) ছিল একজন সম্পন্নলোক। জমি জমা, গরু-বাছুর, ধানের মরাই, কৃষাণ, ভৃত্য এ সবই তাহার ছিল, ইহা ছাড়া সে মহাজনী কারবারও চালাইত। ইহার দৌলতে গ্রামভরা চালাঘরের মধ্যে তাহারই ছিল একখানি কোটাবাড়ী।' কিন্তু শিশুপুত্রকে বিসর্জন দেওয়ার অনুতাপে তার স্ত্রী পাগল হয়ে যায় আর সে গাঁজার টানে ভণ্ড সাধু-সন্ন্যাসীদের ডেকে আড্ডা বসায়। শুধু তাই নয়, 'তিনি এখন চেলা নহেন, স্বয়ং গুরু।' ফলে 'চেলাদের রসদ যোগাইতে ক্রমশঃ বনমালী যথাসর্বস্ব খোয়াইলেন। জমী-জমা, ধান-চাল, গরু-বাছুর, গহনাপত্র সমস্তই দেনার দায়ে বিকাইল, বাড়ীটিও ক্রমে নীলামে চড়িল। চেলার দল বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িল। বনমালী স্ত্রী-কন্যা লইয়া নদীতীরের শ্মশানে আশ্রয় গ্রহণ করিল। গ্রামের লোক চাঁদা করিয়া সেইখানেই একখানি খড়ো-ঘর তাহাদের জন্য বাঁধিয়া দিল। আহার্যও তাহারাই যোগান দিতে লাগিল। আমাদের দেশে সাধু-সন্ন্যাসীর অন্নকষ্ট কখনও ঘটেনা।'

৪. 'পূজার তত্ত্ব' গল্পে সুশীলার লাঞ্ছনা এবং তার স্বামী ও বাবার মানসিক ব্যবধানের কারণ মূলত অর্থনৈতিক। সুশীলার প্রতি তার স্বামীর আচরণে কিংবা লক্ষ্মীমণির প্রতি পঞ্চানন দাসের আচরণে সামন্তপ্রভুর দাপটই যেন ফুটে উঠেছে।

৫. 'গহনা' গল্পে বিহারীলাল সেন অবস্থার দায়ে পড়ে ব্যবসায় 'কেরানীগিরি অর্থাৎ খোসামুদির' কাজ ধরেছেন। কিন্তু পুত্রকে ইংলন্ডে পড়াতে গিয়ে তাঁর জমানো টাকাকড়ি সব নিঃশেষ হয়েছে। পুত্রের প্রয়োজনে আরও একহাজার টাকা জোগাড়ের প্রয়াসের মাধ্যমে বিহারীবাবুর আর্থিক দৈন্যদশা প্রকটরূপে উদঘাটিত হয়েছে।এমনকী অর্থভাবের জন্য তাঁর অসুস্থ কন্যাকে বিনা চিকিৎসায় মরতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে, আরও পরবর্তীকালের লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'পাশফেল' গল্পের বিমলদের পরিবারের সকরুণ চিত্রটি।

৬. 'তিনটি দৃশ্য' গল্পে ধনিষ্ঠার শ্বশুরবাড়ি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুষ্ট রাজবংশীয় জমিদার পরিবার। তাদের সাজ-সজ্জায়, বিবাহযাত্রায়, মণি-মাণিক্যের বিপুলতায় সে আভিজাত্যই বিচ্ছুরিত হয়েছে।

৭. 'যমুনা' গল্পের বালিকা যমুনা ও তার বিধবা মা সামন্ততান্ত্রিক পুরুষ-প্রধান সমাজের লাঞ্ছনার শিকার। যমুনার বাবা ধনবান ছিলেন।'কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর একটি বিধবা আর একটি বালিকা— এই দুই মাতা-পুত্রীকে কেবল অসহায় নারী বলেই বঞ্চিত করতে বাধে নি তাদের আত্মীয় পুরুষদের।'

৮. 'স্বপ্ন না কি?' গল্পে জমিদার হরনাথ মিত্র শারীরিক অসুস্থতার কারণে এবং পুত্রের বিলাতে থাকার কারণে বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনার ভার দেন তাঁর প্রিয়বন্ধু ঘনশ্যাম ঘোষকে। কিন্তু মৃত্যুকালে হরনাথ বাবু কন্যাকে যে সম্পত্তি দিয়ে যান, তাতে ঘনশ্যাম ঘোষ লোভাতুর হয়ে ওঠে। তাই বন্ধুকন্যাকে বিয়ে করার জন্য সে নানা ঘৃণ্য যড়যন্ত্রও করেছে।

সমকালীন স্বদেশি আন্দোলনের ঢেউ কোনও কোনও কাহিনিতে আছড়ে পড়েছে।'চাবিচুরি' গল্পে দুই সুকুমারের একজন স্বদেশি আন্দোলনকারী। তার আচারে-আচরণে স্বদেশি হুজুগের একটা উগ্র মনোভাব বাক্ত হয়েছে। অন্য সুকুমার জড়িত না থেকেও স্বদেশিয়ানার দায়ে গ্রেপ্তার হয়েছে। ঘটে গেছে তার জীবনের সর্বনাশ। আর এ কারণেই 'কান্তিবাবুর খোসনাম' গল্পে কান্তি স্বদেশিদের দিকে ঝুঁকলে তার বাবা চিন্তিত হয়েছে। স্বদেশিদের আরও উগ্র ও ভ্রান্তরূপ চিত্রিত হয়েছে'নব ডাকাতের ডায়েরি' গল্পে। হেয়ার স্কুলের ছাত্র নবকুমার জীবনের স্বাভাবিক পথ ছেড়ে দিয়ে বিপ্লবী স্বদেশিদের দলে মিশেছে। স্বদেশের মুক্তির জন্য তারা স্বদেশীয়দের বাড়িতে ডাকাতি করেছে। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার বিপদ থেকে বাঁচার জন্য দলের সর্দার গুলিবিদ্ধ সঙ্গীর মস্তকচ্ছেদন করেছে, আর সে ছিন্নমস্তক বহন করেছে নিরীহ নবকুমার। অবশেষে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এবং কেমিক্যাল সাহেবের সাহায্যে মুক্ত হয়ে নবকুমার উপলব্ধি করেছে যে, ইংরেজমাত্রেই খারাপ নয়। তার উদ্দেশে কেমিক্যাল সাহেবের উপদেশ : " ও পথ ছাড় নবকুমার, ওতে দেশেরও মঙ্গল নেই, তোমারও মঙ্গল নেই, প্রকৃত বন্ধুর উপদেশ শোন, ওপথ ছাড়। আবার — পড়াশুনা ধর।" এ জন্য তিনি নবকুমারকে নানারকমভাবে সাহায্যও করেছেন। স্পষ্টতই, সহিংস আন্দোলনের প্রতি লেখিকার সমর্থন নেই। পরোক্ষে এখানে 'বড় ইংরেজের' মহানুভবতার কথাই তুলে ধরা হয়েছে। তাই কেমিক্যাল সাহেবকে দেখে নবকুমারের মনে পড়েছে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিউম সাহেবের কথা। তা ছাড়া স্বদেশীয় বাঙালি বাড়িতে বিনাপ্রতিবাদে ডাকাতি করার পর নবকুমারের গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি : "বাঙ্গালী জাতি যে কিরূপ শান্তিপ্রিয় নিরীহ প্রকৃতির লোক— ইহা হইতে তাহাই বুঝা যায়। হায় হায়! কত

শৌর্য্যবীর্য্য মনুষ্যত্বের বিনিময়ে এই শান্তিটুকু আমরা কিনিয়াছি।" বলাই বাহুল্য, সমাজবীক্ষণের এ উপলব্ধি লেখিকারই।

স্বর্ণকুমারী দেবী সমকালীন সমাজকে দেখেছেন সরলদৃষ্টিতে। তাই তাঁর গল্পগুলিতে সমাজের রূপ খুব বেশি জটিল নয়। সে সমাজে সমস্যা অবশ্যই আছে, তবে তার রূপায়ণে কিংবা সমাধানে জটিলতার মনোভাব নেই। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর দুর্গতির চিত্রণে নারীর প্রতি তাঁর পক্ষপাত নয়, গভীর সহানুভূতি ও মমতা প্রকাশিত হয়েছে। নারীর প্রতিবাদী উগ্রমূর্তির চেয়ে সহনশীল প্রেমময়ীরূপেই তিনি বেশি আগ্রহী। 'পূজার তত্ত্ব' গল্পে লেখিকার এ মনোভাব স্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে সুশীলার মায়ের কণ্ঠে। স্বামীগৃহে লাঞ্ছিতা কন্যাকে তিনি বলেছেন, 'সহ্য করে কর্তব্যপালনেই মনুষ্যত্ব। স্ত্রীলোকেরও জীবনের উদ্দেশ্য আছে। তুমি যখন তোমার ছেলেগুলিকে মানুষ করে — প্রকৃত মানুষ করে তুলবে—তখন তোমার জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।' এ বক্তব্যে কেউ লেখিকার 'দীর্ঘদিনের সংস্কারের পিছুটানকে' লক্ষ করতে পারেন। তবে আমাদের মনে হয়, এখানে সমাজ সম্পর্কে স্বর্ণকুমারী দেবীর গভীর ও উদার চিন্তাই প্রকাশিত হয়েছে। কারণ —

১. অত্যাচারী পুরুষেরা সমাজদেহের বিপজ্জনক কীট, সন্দেহ নেই। তাদের সৃষ্ট ক্ষত নিয়েও যে সে সমাজ জীবন্ত রয়েছে, তা অনেকটাই নারীর মহানুভবতায়। কিন্তু তা বলে তো চিরকাল এভাবে চলতে পারে না। প্রয়োজন প্রতিকার। কিন্তু সেজন্য নারীর প্রতিবাদী ব্যক্তিত্বের উগ্র তেজস্বিতায় এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। বর্তমানকালের সমাজই তার প্রমাণ। তাতে অত্যাচারী পুরুষের সংখ্যা মোটেও কমেনি। 'পুরুষতন্ত্রের পরিবর্তে যদি কোনোদিন নারীতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হলে হয়তো এরকম হতে পারে—নারীর পরিবর্তে পুরুষই হতে পারে ভোগ্যবস্তু। কিন্তু সেও কি কোনো কাম্য সভ্যতা? তাই বরং অত্যাচারিতা মায়ের 'ছেলেগুলি' ভবিষ্যতে 'প্রকৃত মানুষ' হয়ে উঠলে সমাজ সুস্থ-সুন্দর-সমৃদ্ধ হতে বাধ্য। নারীর ত্যাগ-তিতিক্ষায়, দায়িত্বে-কর্তব্যে ভবিষ্যতের যথার্থ মনুষ্যসমাজ গড়ে উঠবে—এতে নারীর অগৌরবের বা 'সংস্কারের পিছুটানে'র কি আছে? 'পুরুষতন্ত্রের পরিবর্তে নারীতন্ত্র নয়; প্রতিষ্ঠিত হোক মানবতন্ত্র— এই কি আমাদের একান্ত অভীপ্সা নয়?' কিন্তু শুধু নারীর কর্তব্যপালনে নয়, নারী-পুরুষ—উভয়ের সঠিক বোঝাপড়ায় তা সম্ভব। তার জন্য পুরুষের উদার ও দায়িত্ববান হবার প্রয়োজন আছে বইকি। কিন্তু পুরুষ সাহিত্যিকগণের সাহিত্যে নারীর প্রতি করুণা প্রকাশ ছাড়া পুরুষের দায়িত্ব সচেতনার কথা কতটুকু পাই?

২. কেবল মাতৃত্বের মধ্যেই লেখিকা নারীজীবনের উদ্দেশ্যকে সীমায়িত করেননি। শিক্ষাগ্রহণ ও প্রতিভার স্ফুরণের মাধ্যমে নারীব্যক্তিত্বের বিকাশের কথাও তিনি বলেছেন। 'কান্তিবাবুর



খোসনাম' গল্পের লেখিকার এ মনোভাবের প্রতিনিধি। এখানে নারীকে উপার্জনক্ষমও দেখানো হয়েছে। আর এই সচেতন নারীসমাজ গড়ে তোলার জন্য তিনি নারীদের মধ্যে সখিত্বের বন্ধনকে প্রয়োজন মনে করেছেন। পৃথক গোষ্ঠী নয়, সমাজের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সমান ও সহযোগী হয়ে ওঠাই এ নারীসমাজের উদ্দেশ্য। এ জন্য তিনি সমকালে 'সখিসমিতি' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

গল্পগুলির মধ্যে কোথাও পুরুষের প্রতি স্বর্ণকুমারী দেবীর বিদ্বেষ বা বিরূপতা প্রকাশিত হয়নি। ভাল-মন্দে পুরুষ স্বস্থানেই থেকেছে। 'নারীর অনুভব ও চেতনা নিয়ে সমাজ, পরিবার এবং জীবনকে দেখতে পারার ব্যক্তিত্বস্পৃষ্ট' কৃতিত্ব গল্পগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু সমাজবীক্ষায় লেখিকার কিছু সীমাবদ্ধতার কথাও স্বীকার করতে হয়। সমাজজীবন পর্যবেক্ষণে কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব ধরা পড়েছে। তবে এই সীমাবদ্ধতার কতগুলি অনিবার্য কারণও রয়েছে—

১. ঠাকুর পরিবারের রক্ষণশীলতার মধ্যে তিনি প্রতিপালিত হয়েছেন। সেখানে সংস্কৃতিচর্চার বিপুল আয়োজন থাকলেও সাধারণ সমাজজীবনের সঙ্গে মেলামেশার বিশেষ সুযোগ তাঁর হয়নি।

২. অল্প বয়সেই সংসারী হবার ফলে সমাজের সর্বত্র বিচরণের অবকাশ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কম ছিল।

৩. সর্বোপরি সেকালের সমাজ নারী স্বাধীনতাকে ততটা স্বীকৃতি দেয়নি।

এ ছাড়া সমাজের সাধারণ স্তরের জীবন সেকালের সাহিত্যে তেমন ঠাঁইও পায়নি।

পরিশেষে বলতে হয়, সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও স্বর্ণকুমারী দেবীর ছোটগল্পগুলিতে সেকালের যে সমাজজীবন প্রতিফলিত হয়েছে, তা সাহিত্যানুরাগী ভাবুক মনের সামগ্রী হতে পেরেছে। আজ সমাজরূপের অনেক পরিবর্তন হলেও গল্পগুলিতে বিধৃত সেকালের সমাজরূপটি কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। তা ছাড়া সে সমাজজীবনকথা সমকালের সীমায় আবদ্ধ না থেকেও কালোত্তীর্ণ হয়েছে। সে জীবনের কান্না-হাসি চিরন্তন অনুভবে গভীর আবেদন রাখে।

সহায়ক গ্রন্থ :


১. সাহিত্য ও পাঠক — শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য
২. স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা সংকলন— দে'জ পাবলিশিং
৩. বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার — শ্রী ভূদেব চৌধুরী
৪. মেয়েলি পাঠ — সুতপা ভট্টাচার্য
৫. ভারতের ইতিহাস — ড. অতুলচন্দ্র রায়
৬. স্বর্ণকুমারী ও বাংলাসাহিত্য—ড. পশুপতি শাসমল


গ্রন্থসমালোচনা

# বঙ্গবিভাগ এবং সমসাময়িক ঘটনাবলির রূপরেখা

অমিতাভ রায়

বঙ্গ বিভাগের অর্ধ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে। ..... এই প্রজন্মের লোকেদের কাছে অবিভক্ত বঙ্গের কোনও স্বাদ নেই, বিস্বাদও নেই। এই লোকেদের নয়নের কোলে কোনও একটি জলবিন্দুও ঝরে পড়ার জন্য আকুল হয় না। ভিড় করে না কোনও স্মৃতি। কোনও আবেগ, কোনও অনুভূতি তাদের ভারাক্রান্ত করবে না' (পৃষ্ঠা - ৬৮, বঙ্গসংহার এবং - সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত)। তবুও বিগত শতাব্দীতে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের স্বভূমিকে ভৌগোলিক ভাবে দ্বিধাবিভক্ত করার কারণ অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বহু দিন বহাল থাকবে। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কারণ অনুসন্ধান, তৎকালীন আর্থিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন, তথ্য বিশ্লেষণ, সামাজিক অবস্থার নিরীক্ষা ইত্যাদি নিয়ে নিরন্তর গবেষণা-বিচার-বিবেচনা নিঃসন্দেহে অবশ্যকর্তব্য। আবেগমথিত না হয়ে বিষয়টি নিয়ে নিরপেক্ষ ভঙ্গি তে চর্চা করা কিন্তু আজকের প্রজন্মের পক্ষেই অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত।

বাংলা ভাগের বিষয়টি বিশে শতাব্দীর ইতিহাসে বাড়তি গুরুত্ব ও মাত্রা পাওয়ার অন্য কারণ,- একই শতাব্দীতে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের বাসভূমিকে দু' দু'বার ভাগের উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রথম বার (১৯০৫) বিফল হলেও দ্বিতীয় বার (১৯৪৭) কিন্তু নিশ্চিত ভাবে সফল। এই সুবাদে একটি প্রশ্ন অবধারিত ভাবেই উপস্থিত হয়। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আইন রদ করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষ এগিয়ে এলেও ১৯৪৭-এর ভাগাভাগির সময় অনেকেই কেন এড়িয়ে থাকলেন অথবা দেশ ভাগকে কেন করলেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন? বাংলা ভাগের সিদ্ধান্তটি বাস্তবে রূপায়ণের তৎপরতা আরও আশ্চর্য করে। ১৯৪৭-এর ৩-রা জুন ব্রিটিশ সরকার বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগভাগির আনুষ্ঠানিক নির্দেশ দেওয়ার মাত্র সতেরো দিন বাদেই (২০-শে জুন) তৎকালীন বঙ্গীয় বিধানসভা বাংলা ভাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। তার চেয়েও অনেক দ্রুততায় ব্রিটেন থেকে সদ্য আগত আইনবিদ সিরিল র‍্যাডক্লিফ অন্য চার জন ভারতীয় আইনজ্ঞের সহায়তায় বঙ্গভূমি দ্বি-খণ্ডিত করার কাজটি সম্পন্ন করলেন। না, কোনও ব্যক্তি বিশেষের 'মৃতদেহ' নয় হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুকে সাক্ষী রেখে হয়ে গেল বঙ্গভঙ্গ। লক্ষ লক্ষ লোকের মান-সম্মান-ধন-সম্পদ-পরিবার-পরিজন চিরতরে হারিয়ে গেল। 'স্বাধীন ভারতবর্ষ ও আজাদ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য সেদিন, সেই ১৯৪৭-এর আগস্ট মাসে ছয় লক্ষ নরনারীকে দাঙ্গাকারী উন্মত্ত জনতার হাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিল। এক কোটি চল্লিশ লক্ষ মানুষ হয়েছিল বাস্তুহারা।' দ্য লাস্ট ডেজ অফ্ দি ব্রিটিশ রাজ পুস্তকে লিওনার্ড মোসলে অন্তত এই রকম লিখেছিলেন।

লিওনার্ড মোসলের বইকে বাধ্য হয়েই উল্লেখ করতে হল। কারণ, এই বইটির কোনও এক অংশেরও বক্তব্যের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে দেখা দেওয়া সংশয় নিরসনেই সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয়ের অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার সূচনা। এবং তারই ফলাফল — বঙ্গসংহার এবং।

বাংলা ভাগ নিয়ে গবেষণা-বিশ্লেষণ-অনুসন্ধান দীর্ঘ দিন ধরেই ধারাবাহিকভাবে দেশে-বিদেশে হয়ে চলেছে। সেই ধারাবাহিকতায় সাম্প্রতিকতম সংযোজন - বঙ্গসংহার এবং। প্রবীণ সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয় গত কয়েক বছর ধরে চতুরঙ্গ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে একই শিরোনামে লেখা শুরু করার পর থেকেই পাঠকের মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়েছিল। বাংলা ভাগ হওয়ার পঞ্চাশ বছর পূর্তির প্রাক্কালে 'নয়া উদ্যোগ' সংস্থা দুই মলাটের মোড়কে বঙ্গসংহার এবং-কে সুগ্রথিত করে বাংলা ভাষা তথা বাংলা ভাষাভাষী মানুষের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করেছেন। লেখক এবং প্রকাশক উভয়কেই ধন্যবাদ।

'বঙ্গসংহার এবং' কোনও পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্তে পৌঁছয়নি। প্রায় আড়াই শো পৃষ্ঠার পুস্তকটিতে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার পরিবর্তে স্থান পেয়েছেকালানুক্রমিক ঘটনার বিবরণ। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটা রূপরেখা তুলে ধরার জন্যই লেখক পালন করেছেন এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব। রূপরেখাটি সুচারুভাবে প্রণয়নের উদ্দেশ্যে লেখক এমন কিছু দলিল-নথি পাঠকের দরবারে পেশ করেছেন যা সচরাচর নজরে পড়ে না। তবে আরও কিছু দরকার ছিল।

যেমন ৩৫ পৃষ্ঠার প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনাটি। আগের অনুচ্ছেদে লেখক লিখছেন, - 'এই সময় ১৯৪২ সালের শেষ থেকে ১৯৪৩ সালের প্রথম দু'মাসের মধ্যে পর পর কয়েকটি

বড় ঘটনা ঘটল। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মেদিনীপুরের বিপ্লবীদের এবং তাঁদের সমর্থকদের উপর কর্নেল জন হান্টের (পরবর্তীকালের এভারেস্ট বিজয়ী) নেতৃত্বে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসের বর্বর অত্যাচারের অভিযোগ পেয়ে (ফজলুল) হকসাহেব তাঁর অর্থমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে মেদিনীপুর পাঠালেন।' পরবর্তী অনুচ্ছেদেই সুখরঞ্জনবাবু উল্লেখ করছেন, - 'এর কয়েকদিন পর নোয়াখালি জেলার উপকূলবর্তী গ্রাম সানোয়ারে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর একদল আফ্রিকান উপকূলরক্ষী ভোর রাতে হানা দিল। .... খবরের কাগজে এই খবর বের হল না।' ইতিপূর্বে সাধারণভাবে অনুল্লেখিত এমন একটি ঘটনার স্বপক্ষে অন্তত একটি সরকারি দলিল উপস্থাপন করলে বক্তব্যটি জোরালো হত। কারণ নিরপেক্ষ পাঠক প্রশ্ন করতেই পারেন যে নোয়াখালির কুখ্যাত দাঙ্গা কিন্তু ১৯৪২-৪৩-এর অনেক পরেই ঘটেছিল। বয়োজ্যেষ্ঠ সাংবাদিকের কাছে পাঠকের এমন দাবি করা অসমীচীন হবে না।

বাংলা ভাগ নিয়ে রামমনোহর লোহিয়া এবং পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডনের হেরে যাওয়া ভূমিকাকে বহুদিন বাদে আবার এই বইতে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজধানীর একটি সরকারি হাসপাতালের দৌলতে রামমনোহর লোহিয়া তবুও আর. এম. এল বলে মাঝে-মধ্যে উচ্চারিত হন। কিন্তু পুরষোত্তমদাস ট্যান্ডন?

স্বাধীনতার পরবর্তীকালের বাংলার রাজনীতিতে শিল্পোদ্যোগী-ব্যবসায়ীদের ভূমিকার খবর উল্লেখ করে লেখক বর্তমান প্রজন্মকে ঋদ্ধ করেছেন (পৃষ্ঠা-৯৪)। তবে অন্য অনেক খবরের মতো এ ক্ষেত্রেও তাঁর একমাত্র তথ্যসূত্র ড. প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের লেখা 'জীবনস্মৃতি'। সরোজ চক্রবর্তী লিখিত 'মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে' বইটির সাহায্যও তিনি নিয়েছেন। তবে যে লেখকের হাতে এত দুর্লভ তথ্য-ভাণ্ডার আছে (যেমন, - Confidential Official Report about the Condition of Noakhali in in May 1947, ১৯৫৮-য় সৈয়দ বদরুদ্দোজার সঙ্গে কথোপকথন, কবি অমিয় চক্রবর্তীর গান্ধী আশ্রমে উপস্থিতির খবর, মনসুর হবিবুল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ১৯৪৯-এর ২৬-শে ফেব্রুয়ারি ঘটে যাওয়া দমদম-বসিরহাট হামলার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ইত্যাদি আরও অনেক) তিনি কেন মাত্র দুটি বইকে এত বেশি গুরুত্ব দিলেন?

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত একটি বিশেষ সময়ের প্রেক্ষাপটে বাংলার রাজনীতির নৈর্ব্যক্তিক বিবরণ দেওয়ার সময় যথার্থ অর্থে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। দু'-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণভাবে তিনি স্মৃতিচারণা পরিহার করেছেন। ফলে, বইটির মূল বৈশিষ্ট্য, 'রূপরেখা' বা 'চালচিত্র' প্রণয়নের কাজটি যথাযথ মর্যাদা পেয়েছে। বইটির পরবর্তী সংস্করণে পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৯ ও ৪২-এর কিঞ্চিৎ সম্পাদনা প্রয়োজন। মনে হয়, দু'-একটি শব্দ অথবা পংক্তি বাদ পড়ে গেছে। গবেষক-অনুসন্ধানকারী ছাড়াও বাংলার ইতিহাসের পাঠকের কাছে বইটি নিশ্চয়ই আগ্রহ সৃষ্টি করবে।

**বঙ্গসংহার এবং-সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত**/নয়া উদ্যোগ-কলকাতা-৬/১৫০.০০।

# যে দেশে শস্যের চেয়ে টুপি বেশি

## শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

একজন ঔপন্যাসিক, কুড়ি বছর সময়, সাকুল্যে তিনটি উপন্যাস — 'লালসালু (১৯৪৮), 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪), 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮)। ঔপন্যাসিককের নাম সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২, ১০ সেপ্টেম্বর — ১৯৭১, ১০ অক্টোবর) জন্ম চট্টগ্রামে, শিক্ষা ঢাকা ইন্টারমিডিয়েটে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিবাহ ফরাসি-রমণী অ্যান তিবোর সঙ্গে, কর্মসূত্রে দূতাবাসকর্মী হিসাবে এশিয়া, আমেরিকা, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রবাসীজীবন, প্রথম গল্প প্রকাশ 'নয়নচারা' কলকাতার "পূর্বাশা" (১৯৪৫) পত্রিকায়। হাসান আজিজুল হক লিখেছিলেন, "লালসালু' উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের উপন্যাস আধুনিক কথা সাহিত্যে প্রবেশ করে।' উপন্যাসটি ফরাসি ও ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়। ১৯৬১ সালে এই গ্রন্থটির জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কারও পান।

'কিন্তু পরিতাপের বিষয় বাংলা কথা সাহিত্যের সামগ্রিক আলোচনায় এই মননশীল লেখক কচিৎ বিবেচিত হয়েছেন, আর হলেও তা হয়েছেন এতটাই ঊনতায় যা অন্তত সম্ভ্রমজনক নয়। বিপ্রদুষ্ট এই সাহিত্যবিচারের রেশ কাটিয়ে উঠতে আমাদের সারস্বত সমাজের সময় লেগেছে অর্ধশতক।' — এমন মন্তব্য দিয়েই পৃথ্বীশ সাহা শুরু করেছেন ২০০০ সালে নয়া উদ্যোগ, থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাস : পাঠ-পরিক্রমা।' এ আমাদের এক সাংস্কৃতিক দুর্ভাগ্য। উনিশ শতকের রেনেসাঁস থেকেই এর সূচনা। সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে।



দুই বঙ্গের দ্বিভঙ্গ নিয়তি। সাহিত্য ও সাহিত্যের ইতিহাসে পরস্পরের দেখা ও সমাদর বিনিময় হতে তাই কেবলই দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সুখের কথা, ইদানীং ওয়ালীউল্লাহকে নিয়ে সমাদৃতিমূলক আলোচনা নজরে পড়ছে। কিছুদিন আগে পার্থপ্রতিম গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : উপন্যাসের অন্তর্স্বর'। তা নিয়ে মননশীল আলোচনা করেছেন তপোধীর ভট্টাচার্য। পৃথ্বীশ সাহার বইটি তার সঙ্গে যুক্ত হল। পাঠক এবং লেখকের মাঝখানে একটি সংযোজক সেতুর দরকার হয়। শত অপছন্দ সত্ত্বেও সমালোচকই সেই সেতু। আমার মতে সমালোচক ত্রিবিধ। তিনি লেখকের কাছের লোক হতে পারেন, তিনি পাঠকের লোক হতে পারেন কিন্তু এমনও হতে পারে তিনি কারও লোক নন। সে ক্ষেত্রে তাঁর উপস্থিতি সেতুর মতো না হয়ে দেওয়ালের মতো হতে পারে। সুখের কথা পৃথ্বীশ সাহা লেখক ও পাঠকের মাঝখানে দেওয়াল হয়ে দাঁড়াননি। বইটি পড়ে মনে হয়েছে তিনি বিশেষ অর্থে পাঠকেরই লোক। পাঠকের লোক নন পাঠকই। উপন্যাস তিনটির আলোচনায় উপন্যাসের কথাবস্তু ও ঔপন্যাসিককে তিনি খুঁজে চলেছেন পাঠকের ঔৎসুক্যে। ফলে পৃথ্বীশ সাহার হাত ধরে পাঠক অনায়াসেই ওয়ালীউল্লাহ'র উপন্যাস পরিক্রমা করতে পারবেন। বইটি এতটাই বান্ধবপ্রকৃতির।

'যে দেশে শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি। ভোরবেলায় এত মক্তবে আর্তনাদ ওঠে মনে হয় এটা খোদা তালার বিশেষ দেশ। ন্যাংটো ছেলেও আমসি পাড়া পড়ে.... গোঁফ উঠতে না উঠতেই কোরাণ হাফিজ সারা' — 'লাল সালু' সেই দেশের বিধি ব্যবস্থা, পীড়ন-নিপীড়নের উপন্যাস। 'চাঁদের অমাবস্যা' তিনি লিখেছিলেন ফ্রান্সের আল্পস পর্বত অঞ্চলে পাইন ফার পরিবেষ্টিত ইউরিয়াজ নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে। কিন্তু এর কাহিনির বাস্তবে আছে বাঁশঝাড়, মাঠঘাট, গ্রাম, আইল, বকরি কুকুর লাঙল দেয়া মাটি সমেত গ্রামবাংলার দৃশ্যচিত্র। একটি মেয়েলোকের নগ্ন মৃতদেহের দৃশ্য থেকে উৎসারিত অদ্ভুত টানাপোড়েনে হত্যাকারী কাদের আর বিপন্ন আরেফ আলীর গল্প তৈরি হয়। তৃতীয় উপন্যাস 'কাঁদো নদী কাঁদো' চিন্তনপ্রবাহে বিধৃত এক জীবনসংকটের প্রতীকী চিত্রণ। সাকিনা খাতুন এক স্কুলের মাস্টারনি। সে শুনতে পায়— কোথায় একটি নারী কাঁদছে। কে কাঁদে? ক্রমশ সেই ব্যঞ্জনাময় কান্নার আওয়াজ কুকুর ডাঙার অনেকেই শুনতে শুরু করে। অশুভ আশঙ্কা ঘনীভূত হয়। 'মোক্তার মছলেউদ্দীনের মেয়ে ঠিকই বলে কে আর কাঁদবে, নদীই কাঁদে।' অনেক দিন আগে আত্মহত্যা করা খোদেজাই কি নদীর রূপকে কাঁদতে থাকে? 'লালসালু'র মজিদ, 'চাঁদের অমাবস্যা'র আরেফ আলী আর 'কাঁদো নদী কাঁদো'র মুস্তাফা — এঁদের আশ্রয় করে ঔপন্যাসিক দ্রৌপদীর বস্ত্রের মতো খুলতে খুলতে চলেছেন জীবনের অনির্ণীত রহস্যলোক। পাঠকের হয়ে সমালোচক তাকিয়ে আছেন সেই রহস্যলোকের দিকে। কেউ কেউ বলবেন রচনাই লেখকের ভাষ্য। তার জন্য সমালোচকের প্রয়োজন নেই। একেবারে নেই বলি কী করে? আনন্দবর্ধনের ধ্বনির আলোক দেখানোর জন্য অভিনবগুপ্তকে রচনা করতে হয় লোচন — অভিনব রসভাষ্য। কালিদাস ও পাঠকের মাঝখানে এসে দাঁড়ান মল্লিনাথ। অন্যমনস্ক ও নিরাসক্ত সহস্র পাঠকের মাঝখান থেকে পৃথ্বীশ গেছেন ওয়ালীউল্লাহর কাছে মনস্ক, সংবেদনশীল, অগ্রণী পাঠকের দায় গ্রহণ করে। সে জন্য পাঠকপক্ষ থেকে সহৃদয় ধন্যবাদ তাঁর অবশ্যপ্রাপ্য।

শান্তনু কায়সার 'বাংলা কথা সাহিত্য : ভিন্ন মাত্রা' (ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০১) গ্রন্থে বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। এক সঙ্গে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়েই এতদিন আলোচনা হত (বিভূতিভূষণ, মানিক ও তারাশঙ্কর)। শান্তনু সেখানে ওয়ালীউল্লাহকে টেনে এনে আলোচনায় নতুন মাত্রা এনেছেন মানতেই হবে। বইটিতে আছে চারটি নিবন্ধ। বাংলা সাহিত্য : ভিন্নমাত্রা, দেবযান : স্বর্গ ও পৃথিবীর দ্বন্দ্ব, মাণিকের স্বর্ণবর্ণ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পুনর্বিবেচনা। প্রথম প্রবন্ধটিতে আছে বিভূতিভূষণ, মানিক ও ওয়ালীউল্লাহ'র অবস্থানভূমি, জীবনবীক্ষা ও তাঁদের সাহিত্যিক রূপায়ণের সমত্বসন্ধান। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রবন্ধে বিভূতিভূষণ, মানিক ও ওয়ালীউল্লাহকে নিয়ে আলাদা আলাদা বিশ্লেষণ বা বিচার।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল শান্তনু কিন্তু সমালোচক হিসাবে পৃথ্বীশের মতো পাঠকের লোক নন। তাঁকে সেই অর্থে লেখকের লোক বলাও সমীচীন নয়। আসলে তিনি হচ্ছেন চিন্তা স্বাতন্ত্র্যে, আলোচনা প্রক্রিয়ায় এবং উচ্চারণ বৈগুণ্যে এতটাই অন্য রকম যাঁর সঙ্গে লেখক ও পাঠকের দূরত্ব প্রায় সমান সমান। নয় নয় করে যাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা সাতাশ, 'প্রত্যাশা', 'আলাওল' ও 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ পুরস্কারের' মুকুট যাঁর মাথায় তিনি ছেঁদো পাঠকের লোক হতে যাবেন কেন? লেখক বিশেষের নিজস্ব লোক হওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় কারণ তিনি নিজেই একজন লেখক। বলা বাহুল্য তিনি হচ্ছেন সেই জাতের সমালোচক যিনি নিজের মতো করে আলোচ্য বিষয়ের উপর অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের আলো ফেলেন কৌণিক অবস্থান থেকে। যা আছে ফ্লাড লাইটের আলোয় তা দেখা ও দেখানো তাঁর কাজ নয়। কী তিনি দেখতে ও দেখাতে চান তা আগে থেকে ঠিক করে নিয়ে সেই ভাবে ফেলেন তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি, নির্দিষ্ট করেন আলোর প্রক্ষেপণ বিন্দু। ফলে সমগ্রের পরিবর্তে বিশেষ, রূপের বিকল্পে উপরূপ, দৈর্ঘ্যের পরিকল্পে প্রস্থ বা বেধ দৃশ্য হয়ে ওঠে। চেনা লেখক দেখা দেন

অচেনা রূপে। এ আলোচনায় শুধু বিষয় থাকে না বিষয়ীও থাকেন। লেখকের সঙ্গে আর এক লেখক, রচনার সঙ্গে আর এক রচনা মিলে যায়। তখন 'মায়াবী আলোয় ভাসে কলকাতা শহর'। বিস্মিত বা তিরস্কৃত হওয়া ছাড়া পাঠকের এখানে কিছু করার থাকে না। সেই কবে বঙ্কিমচন্দ্র শকুন্তলা, মিরান্দা, দেসদিমনার আলোচনা এক সঙ্গে করে তুলনামূলক সাহিত্য আলোচনার চিরঅনতিক্রম্য শোভন সূত্রপাত করে গিয়েছিলেন সেই তৌলন আলোচনা নানা বিসর্পিত পথে তুলনামূলক সাহিত্যিকের আলোচনায় পৌঁছেছে— তার উৎকর্ষ অপকর্ষ নিয়ে প্রশ্ন তোলা সমীচীনও নয় সৌজন্যসম্মতও নয় — সে প্রশ্ন তুলছিও না। শান্তনু কায়সার প্রথম প্রবন্ধটিতে গ্রহণ করেছেন তৌলন আলোচনার একটি সাহসী প্রকল্প। এই আলোচনা প্রকল্পে এসেছেন বিভূতিভূষণ, মানিক ও ওয়ালীউল্লাহ। প্রবন্ধটি আমাদের অনেক তথ্য দেয়, ইতিহাসের একটি ঐকিক সমভূমির সন্ধান দেয়, ত্রয়ী লেখকের উপজীব্য বিষয়ের সমত্ব নিয়ে কিছু উপাদানের সংবাদও দেয় কিন্তু একই মাটি থেকে রস সংগ্রহ করেও গাছ কেন আলাদা আলাদা, একই সূর্য থেকে আলো নিয়েও ফুলের বর্ণ কেন পরস্পর স্বতন্ত্র তার হদিশ জমি ও মাটি আঁচড়ে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ আছে। সমালোচকের সাহসী উদ্যোগ সাধুবাদের যোগ্য কিন্তু কিছু তথ্যগত প্রাপ্তি সত্ত্বেও কোনও মৌলিক অভিজ্ঞতার প্রতীতি বা তার যথার্থ রসরহস্যে তিনি পাঠককে পৌঁছে দিতে পেরেছেন কি না সে বিষয়ে আমি অন্তত সন্দেহমুক্ত নই।

'দেবযান : স্বর্গ ও পৃথিবীর দ্বন্দ্ব' — বিভূতিভূষণ সম্পর্কে একটি বৈশেষিক আলোচনা। 'দেবযান' উপন্যাসটি আশ্রয় করে বিভূতিভূষণের দ্বান্দ্বিক লেখক সত্তাটিকে ভেদ করার চেষ্টা বিভূতি বীক্ষণে অবশ্যই একটি নতুন সংযোজন। এই ভাবেই ধীরে ধীরে একজন লেখকের পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র আঁকা হয়। 'সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ'। সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে এ পথেই লেখকের (পৃথিবীর) ক্রমমুক্তি হবে।

'মানিকের স্বর্ণবর্ণ' সেই অর্থে কোনও বিশেষ রচনা ধরে লেখকের মূলসত্তা আবিষ্কারের প্রবন্ধ নয়। এখানে তল্লাশি চালানো হয়েছে ঘরদোর জুড়ে। ১৯৬২ তে মানিক এক চিঠিতে লিখেছিলেন 'তখন কল্লোলযুগের সমারোহ কিন্তু আমি টের পেয়েছিলাম সাহিত্য যে মোড় ঘুরছে কল্লোলী সাহিত্য তার লক্ষণ মাত্র, আসল পরিবর্তন আসবে অন্যরূপে'— এই অনিবার্যতাই পরিণতিতে মানিকের অনন্যতা হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে স্বর্ণবর্ণ। শান্তনু মানিকের রচনার পর রচনায়, নানা অভিজ্ঞতা ও অধ্যয়নে উন্মোচিত (বিশেষ করে মার্কসবাদ ও ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব) নানা



টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত সেই অনন্য হয়ে ওঠার কাহিনি ধরতে চেয়েছেন। ঔপনিবেশিক বাস্তবতা, শ্রেণীগত সমাজবিন্যাস মানুষকে ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করেছে কিন্তু তার বাইরে রয়েছে বৃহৎ মানুষের বিশাল সম্ভাবনা, তার আস্থা ও সৌন্দর্য'— এই প্রতীতিকে কীভাবে লেখক রূপায়ণ করে গেছেন রচনা থেকে রচনান্তরে শান্তনু তারই একটি মনোজ্ঞ মানচিত্র রচনা করেছেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহকে 'নেতি ও নিয়তি'র লেখক হিসাবে চিহ্নিত করার কাজ এতাবৎ কাল সমালোকরা যে ভাবে করে এসেছেন শান্তনু তার পাল্টা একটা বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, পুনর্বিবেচনা' প্রবন্ধটিতে। শিবনারায়ণ রায় ওয়ালীউল্লাহকে 'পারক্য চেতনা'র লেখক, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 'অন্তর্জীবনের জটিলতা ও গ্রন্থিমোচনের' রূপকার, রশীদ করিম 'অর্ধসত্য ও অর্ধবাস্তবে'র ঔপন্যাসিক নামে অভিহিত করেছেন। অনেকেই বলেছেন, দেশের সঙ্গে যোগাযোগহীন 'বিলাতি লেখক'। ওয়ালীউল্লাহ কিন্তু বার বার বলতে চেয়েছেন 'বিদেশে থাকলেও দেশান্তর ঘটেনি, মানে ইমিগ্রেন্টের দলে ঢুকিনি' (পৃ. ১৬৪); 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো এই কঠিন মর্তোই আমার বাস, এই মর্ত্যকেই আমি চিনি।' শুধু দাবি করলেই হয় না তাঁর লেখার মধ্যে তা সত্যি হয়ে উঠেছে কি না সেটাই দেখার বিষয়। শান্তনু বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছেন তাঁর সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছে 'বাঙালী মুসলমান কর্তৃক আত্মজিজ্ঞাসার অগ্নিপরীক্ষায় আবিদ্ধৃত বাংলাদেশ।' তাঁর রচনায় আছে পাকিস্তানোত্তর বিবেকী বাঙালি মধ্যবিত্তের অবস্থান ও ভূমিকা। মনস্তত্ত্ব অনুসরণ করতে গিয়ে প্রস্ত বা জয়েসের মতো মানবব্যক্তিত্বকে খণ্ডিত বা বিচ্ছিন্ন করে ফেলেননি। সর্বাধুনিক আঙ্গিক ও বর্ণনাভঙ্গি ব্যবহার করেও তিনি সামাজিক সত্যকেই প্রকাশ করেছেন। 'কাঁদো নদী কাঁদো'তে মানবিক অপচয়ের দুঃখ ও বেদনাই প্রকাশিত। সুতরাং বলা যায় সমালোচক হিসাবে শান্তনু অন্যান্য প্রবন্ধে লেখক ও পাঠকের চোখে সমদূরত্বে অবস্থান করলেও অন্তত শেষ প্রবন্ধটিতে তিনি হয়ে উঠতে পেরেছেন লেখকের লোক। লেখক যা বলতে চেয়েছিলেন সমালোচক হিসাবে শান্তনু তাকেই প্রমাণসিদ্ধ রূপ দান করেছেন। অন্য সমালোকদের চোখে তিনি বিবাদী হলে লেখক ও পাঠকের কাছে তিনি সহৃদয়হৃদয়সংবাদী।

**সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাস : পাঠ পরিক্রমা — পৃথ্বীশ সাহা**/নয়া উদ্যোগ কলকাতা — ৬/৩৫.০০

**বাংলা কথা সাহিত্য : ভিন্ন মাত্রা — শান্তনু কায়সার**/ঐতিহ্য, বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০/১৪০.০০



# বাংলা সাহিত্যে একটি উৎকৃষ্ট সংযোজন

## অতনুশাসন মুখোপাধ্যায়

এ বইয়ের মুখবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সঠিক মন্তব্যই করেছেন — লেখিকা শ্রীমতী শিপ্রা রক্ষিত দস্তিদারের আগ্রহ ও অধ্যয়নের ক্ষেত্র বহুবিস্তৃত। যে যে বিষয় বা গ্রন্থের আলোচনা এ বইতে স্থান পেয়েছে সেই সব বিষয় বা গ্রন্থ পাঠকমনে আগ্রহ সঞ্চারিত করবে। জ্ঞাত বিষয় বা পঠিত গ্রন্থ হলে আগ্রহী ব্যক্তি দ্বিতীয়বার সেগুলি নিয়ে চিন্তা করবেন এবং বিষয় বা গ্রন্থ নতুন ঠেকলে তা আগ্রহী ব্যক্তির মনে কৌতূহলের উদ্রেক করবে। আলবিরুনির ভারততত্ত্বের সমীক্ষায় লেখিকা আলবিরুনির পাণ্ডিত্য, ঔদার্য, ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানবিকতার নানা উদাহরণ তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি হিন্দু মানসের মুসলমান রীতিনীতির প্রতি অজ্ঞতা হিন্দুদের মানসিক বৈপরীত্য ও রুচিবিকৃতির ফল—আলবিরুনির এ হেন উপসংহার যে তাঁর চিন্তার দৈন্য প্রকাশ করে এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে লেখিকা Edward Sachau এর মন্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। সব মিলিয়ে একটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাহ্কিক মা-লিল-হিন্দ খ্যাত আলবিরুনির যথার্থ মূল্যায়ন করার প্রয়াস প্রশংসনীয়।

অধ্যাপক মমতাজুর রহমান তরফদার বাংলার ইতিহাস নির্মাণে কীভাবে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন লেখিকা তার মূল্যায়ন করে পাঠককে এ বিষয়ে কৌতূহলী করেছেন। ইতিহাসের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত ও সাহিত্য বিষয়ে লেখিকার সুচিন্তিত মতামত এ বইতে স্থান পেয়েছে। বাঙালির সঙ্গীত-সংস্কৃতি পরিচ্ছেদে সামবেদী আর্চিক ও গান থেকে শুরু করে পরিক্রমা শেষ হয়েছে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের গানে। এই পরিচ্ছেদটি পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে পরিক্রমা একটু দ্রুত গতিতে সম্পূর্ণ হয়েছে এবং সেই কারণে কোনও কোনও বিষয়ের আলোচনা হয় একেবারে বাদ পড়েছে নয় লক্ষণীয়ভাবে সংক্ষেপ করা হয়েছে। বাংলার সঙ্গীতের শ্রীক্ষেত্র বিষ্ণুপুর আলোচিত না হলে মনে হয় বাঙালির সঙ্গীত প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। লোকসঙ্গীতের আলোচনা প্রসঙ্গে ভাটিয়ালির নামোল্লেখ করা হলেও বাংলার নিজস্ব অথবা বহিরাগত সঙ্গীত যা বাঙালির সংস্কৃতিতে আদ্যোপান্ত জড়িয়ে রয়েছে যেমন—পূর্ব বাংলার সারিগান ও জারিগান, উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া, চট্‌কা, মালদা জেলার প্রচলিত গম্ভীরা, রাঢ়বাংলার ঝুমুর, ভাদু গান ইত্যাদি আলোচিত না হলে অবশ্যই পাঠকের মন অতৃপ্ত থেকে যায়।

এ গ্রন্থের অন্যতম সুখপাঠ্য পরিচ্ছেদ—বাংলাদেশে চর্যাপদ চর্চা। চর্যাপদের গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গকে পিছনে ফেলে বাংলাদেশ অনেকটাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, অসংখ্য দৃষ্টান্তসহ রচনা থেকে তা সহজেই অনুমেয়। চর্যাপদের ছন্দের চুলচেরা বিশ্লেষণ, ভাষার বিচিত্র প্রয়োগে শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের বিশেষ দ্যোতনা, কারক-বিভক্তি, কাল, পুরুষ, লিঙ্গ ইত্যাদি ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য নিরূপণের বহু দৃষ্টান্ত মনোমুগ্ধকর। এই পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় ভাগে লেখিকা উল্লেখ করেছেন— চর্যাপদের কালবিচারে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মত ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৬৫০— ১১০০ খ্রিস্টাব্দের ভাষা চর্যাপদে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই মত ও সিদ্ধান্তকে প্রমাণ বলে উল্লেখ করে লেখিকা পাঠককে খানিকটা ধন্দে ফেলেছেন বলে মনে হয়। চর্যাপদ সৃষ্টির কাল প্রমাণিত হবার বিষয়টি বাংলাদেশে চর্যাপদ চর্চার বিষয়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না অবশ্যই। সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (আনন্দ পাবলিশার্স — ষষ্ঠ সংস্করণ — প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫) থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া গেল —

> "সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়দের মতে সিদ্ধাচার্যদের কাল মোটামুটি দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে পড়ে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ দুই তিন অথবা ততোধিক শতাব্দী পিছাইয়া লইতে চান। নানা কারণে সুনীতিবাবুর মতই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। গোরক্ষনাথের ও মৎস্যেন্দ্রনাথের গাথাকে ইতিহাস মনে করিয়া তিব্বতী ও নেপালী গল্প ঘাঁটিলে এ মতদ্বৈধের মীমাংসা হইবে না। ঐতিহাসিক প্রমাণে সিদ্ধাচার্যদের আবির্ভাবকালের নিম্নতম সীমা খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী, কেননা ঐ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত মৈথিল পণ্ডিত জ্যোতিরীশ্বরের বর্ণনরত্নাকরে চৌরাশী সিদ্ধের তালিকায় বাঙ্গালী সিদ্ধাচার্যদের অনেকেরই নাম রহিয়াছে। উর্ধসীমা একাদশ শতাব্দী।"

উদ্ধৃতিটি এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন হল কারণ, চর্যাপদের কালবিচারে শহীদুল্লাহর মত ও সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলে যদি কোনও পাঠক মনে করেন, তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, অন্য পক্ষের যুক্তিসমূহ আদপেই উড়িয়ে দেবার মতো লঘু নয় বরং অনেক বেশি ইতিহাসনির্ভর।

লেখিকার মৌলিক চিন্তার ফসল — মধ্যযুগের বাংলা কাব্য ও বাঙালির খাদ্যরুচি এবং পরবর্তী বেশ কয়েকটি পরিচ্ছেদ। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতো একজন কৌতুক ও ব্যঙ্গ সাহিত্যের প্রতিভাধর শিল্পী আজকের প্রজন্মের কাছে প্রায় অজ্ঞাত। লেখিকা ত্রৈলোক্যনাথ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে একটি মহৎ কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। গবেষণা ও সমালোচনামূলক গ্রন্থ হিসাবে এই বই বাংলা সাহিত্যে একটি উৎকৃষ্ট সংযোজন।

**ইতিহাস ও সংস্কৃতি — শিপ্রা রক্ষিত দস্তিদার**/নয়া উদ্যোগ, কলকাতা - ৬/১০০.০০

# মুক্তমনা এক অগোছালো ব্যক্তিত্ব

## বেণু গুহঠাকুরতা

মুজতবা আলী বাংলা সাহিত্যে "এমন একটি মার্জিত বুদ্ধিদীপ্ত সাহিত্য ধারার প্রবর্তন করেন যা সম্পূর্ণভাবে মৌলিকতায় ভাস্বর। ভাষাতত্ত্বে যেমন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন - রচনার ভঙ্গি যেমন বৈদগ্ধ্যে পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র মেজাজে মাতিয়ে রাখে - তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ব ও তার তুলনামূলক বিচারে এই উপমহাদেশের স্বল্পসংখ্যক বিশেষজ্ঞের তিনি ছিলেন অন্যতম। ছিলেন রবীন্দ্র সংস্কৃতির নিষ্ঠাবান অনুরাগী "— সম্পাদকের এই মূল্যায়নের সঙ্গে দ্বিমত হবেন মুজতবার পাঠকদের মধ্যে এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া বোধ হয় মুশকিল।

তিনটি পর্বে ভাগ করা এই সংকলনটির প্রথম পর্বে মুজতবা আলীর রচনার বৈশিষ্ট্যের নানা দিক আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে স্মৃতিচারণ, তৃতীয় পর্বে তাঁর জীবনী ও গ্রন্থ তালিকা। মোট ৩২ জন জ্ঞানীগুণী বাঙালি ব্যক্তিত্ব মুজতবার জীবনের বহুমুখী প্রতিভার ও তার চরিত্রের নানান বিশেষত্বের দিকগুলি এই সংকলনে আলোচনা করেছেন।

মুজতবার 'দেশে বিদেশে' প্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন "লেখকের ব্যক্তিত্ব যা তাঁর বইয়ে ধরা যাচ্ছে তার মধ্যে দুটি জিনিষ লক্ষণীয়। তিনি একদিকে যেমন international বিশ্বের একজন বিশ্বমানবিকতায় ভরপুর উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি, তিনি ইউরোপীয়, ভারতীয় আর ইসলামীয় তিনটি সভ্যতার বাহ্য ইতিহাস আর রূপ আর তার ভিতরের কথা সব নখ-দর্পণে রাখেন—তিনি ইতিহাস, দর্শন আর সাহিত্যের অধ্যাপক, ইংরেজি, ফরাসী, জরমান, বাংলা (প্রাচীন আর আধুনিক) সংস্কৃত, ফারসী, আরবী আর তা ছাড়া অন্য কতগুলি সাহিত্যের হাওয়া আর তার মহাকাব্য আর বচন তার মনের ফুল বাগানে সৌরভের মত ভেসে বেড়াচ্ছে—তাঁর কাছে গোঁড়ামির লেশমাত্র নেই—আর অন্যদিকে তিনি হচ্ছেন তেমনি খাঁটি বাঙালী—কেবল খাঁটি বাঙালী নন—খাঁটি মুসলমান বাঙালী। তিনি নিজে মুসলমান সংস্কৃতি ও ধর্মের গৌরবে 'স্বে মহিম্নি'। নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁর আন্তর্জাতিকতা বাঙালী মুসলমান জাতীয়তার ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। সেইজন্যই তাঁর আন্তর্জাতিকতা এত পাকা কারণ এই কথাটি অতি সত্য কথা— He alone is truly international who is most intensely national. মাঝে মাঝে তিনি যখন দুই চারবার তার মনের গভীরতম প্রদেশের বাতয়ান পথ একটু-আধটু উন্মুক্ত করে দেখিয়েছেন, তখন মুসলমানী রঙে রাঙ্গানো অনুভূতির বা রসোপলব্ধির ঝলক চোখে লেগেছে। আমি বাঙালী হিন্দু ঘরের ছেলে। এতে খুসীই হয়েছি। কারণ আমি এককে তো চাইই, বহু আর বিচিত্র সেই একেরই প্রকাশ বলে পৃথক পৃথক ভাবে এই বহু ও বিচিত্রকেও আমি চাই।' (পৃ. ১৫/১৬)

ধর্মীয় অন্ধতা মুজতবাকে কোনও দিনই স্পর্শ করতে পারেনি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কিছুদিন পূর্বপাকিস্তানের বগুড়া কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। সেখানে এক সভায় বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ইকবালের চাইতে অনেক বড় কবি। আর যায় কোথায়, সে দেশের মৌলবাদী ছাত্ররা তাঁকে মারতে যায় আর কি।

মৌলবীদের অভাব এদেশেও ঘটেনি। "একবার শান্তিনিকেতনে সাতই পৌষের উপাসনায় জ্ঞতিমতলায় তিনি আচার্য হয়েছিলেন। পরে এসেছিলেন শেরওয়ানী চোস্ত ও ফেজ টুপি। এই জন্যে শান্তিনিকেতনের রক্ষণশীল লোকদের কাছে কম কটূক্তি শুনতে হয়নি তাঁকে .... কিন্তু আরও দুঃখের কথা ১৯৬৫ সালে ভারত-পাক যুদ্ধের সময় একদল স্বার্থান্বেষী শান্তিনিকেতনবাসী অকারণে তাঁকে 'পাকিস্থানের চর' বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। সেই দুঃখে শান্তিনিকেতন ছেড়ে তিনি সংলগ্ন বোলপুর শহরে বাড়ি ভাড়া করে চলে যান। আর শান্তিনিকেতন যান নি, দুর্ভাগ্য শান্তিনিকেতনের।' (অমিতাভ চৌধুরী-পৃ. ১৯৮)

এ দেশে ধর্মের নামে নানান বজ্জাতি দেখে একবার বিরক্ত হয়ে তিনি বলেছিলেন যে দেশে "শ্রীচৈতন্য প্রেমের উদ্‌গাতা- তাঁরও এই হাল হয়েছে! এই দেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতা দূর করার চেষ্টা ছোঃ।"

রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু স্বামী সারদানন্দ গভীরভাবে আরবি ভাষা আয়ত্ত করে মূল কোর-আন্‌ ও অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করে হজরতের একটি জীবনচরিত রচনা করেন। গজেন্দ্রকুমার মিত্র উৎসাহভরে সে কথা মুজতবাকে বলতে গেলে তিনি বলেছিলেন "তা বেশ করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টার জন্য সাধুবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু এ বই তিনি যেন ছাপাবার চেষ্টা না করেন।" কারণ হিসাবে তিনি বলেছিলেন "আরে ব্রাদার, শোনই আমার কথাটা। শ্রদ্ধার সঙ্গে লিখেছেন সত্য হতে পারে—কিন্তু সে কতটা শ্রদ্ধা! ফ্যানাটিকদের মতো শ্রদ্ধাপ্রকাশ করা, তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। উদার বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ না হলে হিন্দু সন্ন্যাসী এই কাজ করতে যাবেন কেন। আর এইখানেই তো বিপদ। তিনি হয়তো কোথায়ও বুদ্ধের



সঙ্গে তুলনা দিয়ে ভেবেছেন যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখানো হল—আমরা সেটাকে নবীর প্রতি অপমানকর বলে মনে করবো। না, না, এই বই তাকে আলমারিতে তুলে রাখতে বলো" (গজেন্দ্রকুমার মিত্র পৃ. ১৬৯)

এই মজলিসি রসিক মানুষটার অসংখ্য রসিকতা এই গ্রন্থের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্তকে বলেছিলেন 'আমার চিৎকার আর দৌড়ে যাওয়া দেখে ভাবছ, আমি পাগল? কিংবা ওই বোতল দুটিতে চোখ বুলিয়ে ধারণা করেছ আমি মাতাল হয়ে গেছি। আরে না না, মোটেও না। আমি সৈয়দের ব্যাটা, যতই খাইনা কেন মদ আমার গলা অবধি উঠলেও কখনওই মাথা অবধি পৌঁছায় না। প্রমাণ চাও?' বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে রবীন্দ্রনাথের একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা সঠিক যতিচিহ্ন সহ গড়গড় করে বলে থামলেন। বললেন 'বন্দিদের আমি বিভীষণ ভয় পাই (বিভীষণ আলী সাহেবের ব্যবহার)। কেন, শোনো বলছি। পাঁচটা সাপের বিষে একটি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হয়। দশটা বারেন্দ্র মরলে একটা বন্দ্যি হয়—তাই অমন ভয়। পরে বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে জল দিতে দিতে মনে হল আমিও সৈয়দের ব্যাটা। এতদিন তরল গরল নিয়মিত সেবনেও বিষ এখন গলা পর্যন্ত উঠেও বিসমিল্লার দোয়ায় একবারও মাথায় ওঠেনি, তখন একা এই বন্দ্যি ব্যাটার বিষে আমার কি হবে' বলেই অট্টহাসি হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন 'কি ব্রাদার কী রকম চম্পু দিলুম।' (পৃ. ২০৯, ২১০)

আলী সাহেবের সদা সহচরের নাম ছিল শেখ দিলজান। তিনি তা পান্টে করেছিলেন কাটু। কেন? 'প্রথমত সে আমার মুরগী কাটে। দ্বিতীয়ত সে আমার মাছ কাটে, তৃতীয়ত শেষ অবধি ও আমার পকেটও কাটে'। এক মুহূর্ত থেমেই আবার যোগ করলেন 'এ রকম সহচর কোটিতে গোটিক। আমি আদেশ করলে সে লোকের মাথাও কাটতে পারে। তাই কাটুই তার যোগ্য নাম' তেমনই তার ছিল এক আদরের অ্যালসেশিয়ান। আলী সাহেব তিন গেলাসের বেশি খেতে আরম্ভ করলেই প্রচণ্ড ঘেউ ঘেউ শুরু করে শাসন করত। তাই তিনি কুকুরটার নাম দিয়েছিলেন মাস্টার। সৈয়দদা বলতেন, 'গত জন্মে এ ব্যাটা নিশ্চয়ই আমার চাচা ছিল।' (সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত পৃ. ২১১)

মুজতবা ছিলেন রবীন্দ্রস্নেহধন্য। কৈশোরে রবীন্দ্রনাথের 'আকাঙ্ক্ষা' সম্বন্ধে এক বক্তৃতা শুনে (১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে) তিনি কবির কাছে এক চিঠিতে প্রশ্ন করেছিলেন—'আকাঙ্ক্ষা উচ্চ করতে হলে কি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার?' রবীন্দ্রনাথ উত্তরে জানিয়েছিলেন — 'আকাঙ্ক্ষা উচ্চ করিতে হইবে—এই কথাটির মোটামুটি অর্থ এই যে—স্বার্থই মানুষের কাম্য না হয়। দেশের মঙ্গলের জন্য ও জনসেবার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত যে উদগ্র কামনা তাহাই মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায়। তোমার পক্ষে কি করা উচিত, তা এতদূর থেকে বলে দেওয়া সম্ভব নহে। তবে তোমার অন্তরের শুভেচ্ছাই তোমাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে।' (বারিদবরণ ঘোষ পৃ. ৫২)

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিই তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল শান্তিনিকেতনে, যেখানে সংগীতও হয়েছিল তাঁর ভবিষ্যতের পাথেয়। ১৯৩৯ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথকে শেষ বারের মতো দেখেন। তখন আলী সাহেব বরোদা কলেজে অধ্যাপনা করেন। বরোদার মহারাজ সসম্মানে তাঁকে রেখেছেন শুনে তিনি বললেন—'তোদের যখন রাজা মহারাজারা ডেকে সম্মান দেখায় তখন আমার মনে কি গর্ব হয়। আমার কি আনন্দ হয়। আমার ছেলেরা দেশে বিদেশে কৃতী হয়েছে .... তা যাক্‌ বলতে পারিস সেই মহাপুরুষ কবে আসবেন কাঁচি হাতে করে?'

আমি অবাক। মহাপুরুষ তো আসেন ভগবানের বাণী নিয়ে, অথবা শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম নিয়ে, কাঁচি হাতে করে? 'হাঁ হাঁ কাঁচি নিয়ে। সেই কাঁচি নিয়ে সামনের দাঁড়ি ছেঁটে দেবেন, পেছনের টিকি কেটে দেবেন। সব চুরমার করে একাকার করে দেবেন। হিন্দু-মুসলমান আর কতদিন এরকম আলাদা হয়ে থাকবে।' (বারিদবরণ ঘোষ, পৃ ৫৬)। মুজতবা আলী বা রবীন্দ্রনাথের আশা আজও অপূর্ণই থেকে গিয়েছে। ফলে মুজতবাকে এপার বাংলা আর ওপার বাংলার মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে শেষ পর্যন্ত ঢাকাতে গিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছিল।

মুজতবা আলীর দীর্ঘ সাহিত্যজীবনের নানা দিক এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয় তাই আলী সাহেবকে যাঁরা জানতেন অথবা এই প্রজন্মের মানুষ যারা তাঁকে তেমন ভাবে জানেন না— তাদের সবারই এই সংকলনটি সংগ্রহ করা উচিত।

**মজলিসী মুজতবা**—সম্পাঃ তাপস ভৌমিক/**কোরক**, কলকাতা-৫৯/৫০.০০।

# সভ্যতার সংকটে এই সমাজ এই সময়

## সুস্নাত দাশ

"*মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুতেই আমি কৌতুহলী, আগ্রহী, কোন কিছুতেই আমার অরুচি নেই। জীবনের যাবতীয় দিকই আমাকে ভাবায়। ......*"

কথাগুলি বলেছেন অধ্যাপক জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাম্প্রতিকতম গ্রন্থ "এই সমাজ এই সময়"-এর মুখবন্ধে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু করে চলতি শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত নানা প্রসঙ্গের আলোচনা ও নানা প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে এই গ্রন্থে তিনি প্রয়াসী হয়েছেন।

আলোচ্য গ্রন্থটি লেখকের দ্বিতীয় প্রবন্ধ সংকলন। মোটামুটিভাবে বিগত এক দশকে রচিত লেখকের একুশটি সুনির্বাচিত মূল্যবান প্রবন্ধের এই সংকলনটি প্রকাশ করে প্রখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা দে'জ প্রশংসনীয় কাজ করেছেন সন্দেহ নেই। জ্যোতিপ্রকাশবাবুর লেখালেখির সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে মানুষের চিন্তা বুদ্ধি ও যুক্তির জগতকে যা শৃঙ্খলিত করে, দাসত্বের রজ্জু পরায়; যে বিবেকহীন অকল্যাণকর ভাবাদর্শ বিশ্ব ইতিহাস, সভ্যতা ও মানবতাকে প্রতিনিয়ত নিষ্পিষ্ট ও পদদলিত করে — নানারূপে চরিত্রে প্রকট সেই ফ্যাসিবাদী দর্শনের বিরুদ্ধে লেখকের কলম সর্বদাই সক্রিয়।

ভারতবর্ষে আজকে যে অন্ধকারের সাধনা নানাভাবে ও নানা রূপে চলছে মূলত এই প্রবন্ধ সংকলনের রচনাগুলি সেই অন্ধকারের বুক চিরে জ্বলে ওঠা যেন এক-একটি অনির্বাণ আলোর মশাল। চতুরঙ্গ পত্রিকার (বর্ষ-৬০, সংখ্যা-৩-৪; কার্তিক-চৈত্র, ১৪০৭) একটি সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিকীর্ণ আঁধারের দীক্ষা'-নামক প্রবন্ধটি থেকে শুরু করে 'অন্ধকারের দর্শন' পর্যন্ত নানা নিবন্ধে জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মৌলবাদী শক্তিরূপে সংঘ পরিবার ও হিন্দুত্ববাদীদের দ্বারা সংঘটিত শিক্ষা, সংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর নানাবিধ আক্রমণের নগ্ন ও ভয়ঙ্কর চেহারাগুলিকে পাঠকদের সামনে তথ্য ও যুক্তি সহকারে তুলে ধরেছেন।

বর্তমান ভারতে বহু জাতি, বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতি ও ধর্মের যে মিশ্র কিন্তু সংহত রূপটি কয়েক সহস্র বছরের ভারতীয় ঐতিহ্যের পরম্পরায় গড়ে উঠে 'ভারতীয় মহাজাতি' রূপে প্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হয়েছে সহিষ্ণুতা ও সেকুলারিজমের যুক্তিসংগত আদর্শকে আশ্রয় করে, আমাদের দেশের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী আজ তাকে ধবংস করতে উদ্যত। 'হিন্দুত্বে'র ও 'হিন্দুত্ববাদ'-এর (খাঁটি না মেকি সে বিচার কে করে!) তাত্ত্বিক ধবজা ধরেই স্বাধীনতালাভের পূর্বে অত্যন্ত গোপনে, ভারতীয় ফ্যাসিস্ট শক্তি সংঘ পরিবারের নেতারা এগিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত সীমিত আকারে হলেও কেন্দ্রীয় ক্ষমতার মালিকানা পেয়েছেন। ভারতীয় গণতন্ত্রে 'বহুত্ববাদে'র ন্যায়সংগত মূল স্তম্ভটি আজ এই অশুভ ও অকল্যাণকর শক্তির উন্মত্ততায় কম্পমান। ভারতবর্ষের মিশ্র সংস্কৃতির (composit culture) ঐতিহ্যকে এঁরা স্বীকার করে না। R. S. S.- এর হেডগেওয়ার, গোলওয়ালকার থেকে শুরু করে সুদর্শন, সিঙঘল, রাজেন্দ্র (রাজ্জু,) আদবানি পর্যন্ত সকল তাত্ত্বিক নেতারাই চেয়েছেন ভারতে 'হিন্দু রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠা করতে। তাঁরা চেয়েছেন ভারতীয় তরুণ সমাজও শৈশবকাল থেকেই এই স্বপ্ন দেখুক। ধর্মের ভিত্তিতে 'একশিলাভূত' (Monolithic) এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই তাঁদের গৃহীত ও প্রচারিত ধবনি ছিল "হিন্দু-হিন্দী-হিন্দুস্তান"। সংঘ পরিবার তথা বিজেপির গোপন অ্যাজেন্ডা হল-এই নীতিকেই কার্যকর করা। এই উদ্দেশ্যে ধর্মান্ধ জঙ্গি উন্মাদনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তরুণ সমাজের সামনে তারা সরাসরি 'হিন্দু জাতির শত্রু'রূপে হাজির করেছেন ভারতের অপরাপর ধর্মীয় সম্প্রদায় ও সংখ্যালঘুদের, বিশেষত মুসলিমসমাজকে। এ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রবক্তাদের বক্তব্যের সঙ্গে তাদের অমিল খুব একটা ছিল না।

হিন্দুত্ববাদীরাও কার্যত ঔপনিবেশিক ভারতে ইংরেজদের অপেক্ষা মুসলমানদেরই মূল শত্রু বিবেচনা করত। যার ফলে রাজনৈতিক সংস্থারূপে আর. এস. এস. বা হিন্দুমহাসভা জাতীয় আন্দোলনে কার্যত নিষ্ক্রিয়তাই অবলম্বন করে। আদর্শগত বিচারে ইতালীয় ফ্যাসিবাদ বা জার্মান নাৎসিবাদের সঙ্গে হিন্দুত্ববাদীদের মৌলিক প্রভেদ প্রায় ছিলই না। ফ্যাসিবাদ বা নাৎসিবাদের মূল বিষয় ছিল অত্যুগ্র জাত্যভিমান। নিজের জাতিকে গৌরবদান বা গৌরবান্বিত করে দেখার মাধ্যমে জন্ম নেয় "আমরাই শ্রেষ্ঠ" মানসিকতা এবং তার থেকে শুরু হয় ১, নিজেদের মহীয়ান করে দেখানোর জন্য কাল্পনিক গাথা বা মিথ সৃষ্টির এবং ২, অপরাপর সংখ্যালঘু জাতি বা ধর্মগোষ্ঠী ও বিরুদ্ধবাদী রাজনৈতিক মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে সহিংস ঘৃণা প্রদর্শন। হিটলার শাসিত জার্মানিতে যেমন ইহুদি বা মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে করা হয়েছিল।

ভারতেও ধর্মের নামে ও ধর্মান্ধকতাকে অবলম্বন করে সেই প্রচেষ্টা ঔপনিবেশিক আমল থেকেই শুরু হয়েছিল। ভারতের



জাতীয় আন্দোলনের প্রধানতম ব্যক্তিত্ব গান্ধীকে হত্যার মাধ্যমে তার অবসান ঘটেনি, বরঞ্চ নবরূপে ও নবশক্তিতে এই ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রমশ মাথা চাড়া দেওয়ার সুযোগ পায়। অধ্যাপক জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় সঠিকভাবেই বলেছেন, "*ধর্মকে কেন্দ্র করে অনায়াসে সৃষ্টি করা যায় এমন আবেগ যেখানে যুক্তি চলে না, বিচার ব্যর্থ হয়ে যায়। অথচ ধর্মের উৎস যেহেতু সুদূর অতীতে, সে আবেগে থাকে এক গভীরতা এবং ব্যাপকতাও। ধর্ম বলেই তার মধ্যে থাকে এক রহস্যময়তাও। থাকে একান্ত বিশ্বাস (faith) যা কেউ যুক্তি দিয়ে বদলাতে পারে না, ভাঙতে পারে না। জাতির আবেগের সঙ্গে ধর্মের আবেগ জুড়ে দিলে ...... ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে যুক্তি তর্ক-বুদ্ধি, সব।*" হিন্দুত্ববাদীদের গোপন কর্মসূচি বা অ্যাজেন্ডা একদা পরিকল্পিত হয়েছিল এরই ওপর ভিত্তি করে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ভারতকে একটি "হিন্দুরাষ্ট্রে" (পড়ুন - ধর্মীয় ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রে) পরিণত করার জন্য মনস্তাত্ত্বিক ও তাত্ত্বিক পরিমণ্ডল সংগঠিত করা। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ওপর এবং বৌদ্ধিক চিন্তাচেতনার জগতকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা বা গ্রাস করা ভিন্ন এ জাতীয় পরিকল্পনা সফল হতে পারে না। এটা করতে হলে মৌলবাদী মতাদর্শের প্রবক্তারা (মুসোলিনি, হিটলার প্রমুখ) যা করে থাকেন বিজেপি নেতৃত্বও সেই পন্থাই অবলম্বন করেছেন। এগুলি হল- ১) ইতিহাস, ইতিহাসচর্চা ও ইতিহাস পাঠক্রমের বিকৃতি সাধন: ২) রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুদানে পরিচালিত জ্ঞানচর্চার ও গবেষণা কেন্দ্রগুলির (বিশেষত সমাজবিদ্যার) উপর অপ্রতিহত ও নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্থাপন যাতে যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক ভাবধারার পরিবর্তে নিজেদের মতান্ধ ও মৌলবাদী চিন্তা দর্শন প্রচার করা যায় : ৩) শৈশবাস্থা থেকেই যাতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মস্তিস্ক দখল করা যায় তার জন্য প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চবিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত পাঠক্রমে ধর্মান্ধ, মৌলবাদী ও অনাধুনিক (আধুনিকতার সংজ্ঞা অবশ্যই প্রযুক্তির বিকাশে নয়, চিন্তার জগতের যুক্তিবাদী স্বাধীনতার মধ্যে নিহিত) শিক্ষাধারা (স্বাভাবিক কারণেই যা কুশিক্ষার নামান্তর) অনুপ্রবিষ্ট করার; ৪) ঐতিহ্য ও সংস্কারের মোড়কে উগ্রজাত্যভিমানী বা সাম্প্রদায়িক (পড়ুন তালিবানি) সংস্কৃতির ও পরম্পরাগত মূল্যবোধের নামে অবৈজ্ঞানিক ভাবধারার প্রচার ও প্রসার।

ধর্মীয় মৌলবাদের এই চেহারা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানে বহু পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। সেখানে যেমন "ইতিহাস চর্চা" নামটির স্থলে "পাকিস্তান চর্চা" শব্দটিকে গ্রহণ করা হয়েছে, তেমনই পাক বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ইসলাম ধর্মের গৌরবগাথার ভিত্তিতে পাঠ্যক্রম প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়েছে। এই সূত্র অনুসারে নতুন পাঠ্যপুস্তকে উপমহাদেশের প্রাচীন যুগ ইতিহাসের পাতা থেকে বাদ পড়ে যায়। বস্তুত আজ প্রতিবেশী ইসলামি স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রটির সঙ্গে ভারতের জ্ঞানচর্চার পার্থক্যটিকে মুছে দেওয়ার হীন পরিকল্পনাই আমাদের শাসকগোষ্ঠী করে চলেছে। অবশ্য অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় সঠিকভাবে দেখিয়েছেন যে পাকিস্তানের ঐতিহাসিকদের মধ্যে ভিন্ন এক ধারাও রয়েছে। কে. কে. আজিজ অথবা মুবারক আলির মতন ঐতিহাসিকরা আজও পাকিস্তানে যুক্তিবাদী, বৈজ্ঞানিক ও বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ভয়ঙ্কর বিপদের ঝুঁকি নিয়েও ইতিহাসের মৌলবাদী ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে লিখে যাচ্ছেন। অবশ্য সে দেশে এখনও তাঁদেরকে 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দেওয়া হয়নি—যে অভিধা আমাদের দেশের যুক্তিবাদী ঐতিহাসিকরা লাভ করেছেন ভারতের শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে। যোশী আর-এস-এসের যোগ্য মুরলীধরই বটে।

বর্তমান ভারতে হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্ট শক্তি কীভাবে মানুষের মুক্তচিন্তা ও যুক্তির জগৎকে প্রতিনিয়ত আঘাত করে চলেছে তার তথ্যবহুল প্রতিবাদী বিবরণ আলোচ্য গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে নানা প্রবন্ধে। এ ক্ষেত্রে লেখক জার্মান ফ্যাসিবাদ বা নাৎসিবাদের উদ্ভব, বিকাশ ও ভয়ঙ্কর পরিণতির খণ্ড খণ্ড চিত্র যেমন সবিস্তারে আলোচনা করেছেন তেমনই তুলে ধরেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের অন্যত্র ফ্যাসিবাদ এবং পুঁজিবাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতার প্রকৃত রূপ। 'নীটশের ছড়ি' নিবন্ধটি এ ক্ষেত্রে একটি অনন্যসাধারণ রচনা। জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সংকলন গ্রন্থের প্রথম নিবন্ধ 'যাঁরা ইতিহাস বিস্মৃত হয়'-তে মহাভারতের শান্তি পর্বের একটি শ্লোক ("ধর্মং যা বাধতে ধর্মো ন স ধর্মঃ কুর্বত্ম তৎ") তুলে ধরে ব্যাখ্যা করেছেন-"যে ধর্ম অন্য ধর্মকে বাধা ও পীড়া দেয় তা ধর্ম নয়, সে এক অন্যায় পথ।" সুতরাং শুধু হিন্দু মৌলবাদ নয় বা হিন্দুসমাজের মধ্যে বর্ণাশ্রম নামক ব্রাহ্মণ্যবাদী অত্যাচারে পিষ্ট গো-বলয় ও দক্ষিণ ভারতের দলিত জনগণের অবর্ণনীয় দুঃখময় জীবন বৃত্তান্তই নয় ("ওরা তো মানুষ নয়, দলিত সন্তান" এবং "তিন রকমের গেলাস্" প্রভৃতি নিবন্ধ উল্লেখ্য) আফগানিস্তানের তালিবান অত্যাচার বা ইসলামি মৌলবাদী চিন্তাধারার বিরুদ্ধেও লেখক সমান সোচ্চার হয়েছেন। তবে বর্তমান বিশ্বে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মধ্যপ্রাচ্য নীতি এবং তৈল সম্পদের উপর তার ক্রম আগ্রাসনের ষড়যন্ত্রের প্রতিক্রিয়াতে কীভাবে 'প্যান-ইসলামি' চিন্তাধারার প্রশ্রয় ঘটছে তা যেমন ভেবে দেখা প্রয়োজন, তেমনই বিশ্ব-কম্যুনিজমের পতনের পর কেন মার্কিন ধনবাদী শক্তি 'ইসলামি দুনিয়া'-কেই তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল বেছে নিল — তাও তলিয়ে দেখা দরকার। তা ছাড়া বর্তমান বিশ্বে 'মার্কিন মৌলবাদ' (প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছেন, যাঁরা আমেরিকাকে সাহায্য করবে না তাঁরা সকলেই

সম্রাসবাদী।) না 'মুসলিম মৌলবাদ' বিশ্বমানবতার প্রধান শত্রু কারা, তা স্থির করে নেওয়া বর্তমান সময়ে সহজ কাজ নয়।

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থে সংকলিত 'যদি দেশভাগ না হতো' নিবন্ধটি এই প্রবন্ধ সংকলনের সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত রচনা। লেখক ভারত বিভাগের বিষয়টিকে ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর প্রতিপাদ্য হল যদি বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশ দু'টি ভাগ না হত তা হলে বাঙালি মুসলমানসমাজ এবং অমুসলমান পাঞ্জাবি জাতি তাদের পূর্বেকার সামন্ততান্ত্রিক এবং অনাধুনিকতার বোঝা ঝেড়ে ফেলে এই ভাবে বিকশিত ও পল্লবিত হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত না। কথাটা ঠিক যে প্রাক-স্বাধীনতা কালে অবিভক্ত পাঞ্জাবে হিন্দু-শিখ-মুসলিম নির্বিশেষে পঞ্চনদ অধিবাসীরা শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আধুনিকতাবোধে তেমন উজ্জ্বল ছিল না। কিন্তু পশ্চাতের প্রকৃত আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক কারণ বিশ্লেষণ না করে যদি দেশ বিভাগ সংক্রান্ত বিষয়টিকে সমস্যার প্রতিবিধান স্বরূপ উপস্থিত করা হয় তবে তার ঔচিত্য সম্পর্কে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। জ্যোতিপ্রকাশবাবু যে কারণে পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমানের উন্নতি দেখে আনন্দ পেয়েছেন সেই ধরনের উন্নতি কি পশ্চিম পাঞ্জাবের মুসলমানদের মধ্যে ঘটেছে? তা ছাড়া বাংলাদেশের মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছাড়া বাকি ৭০-৭৫ ভাগ অধিবাসী বাঙালি কি এখনও সেই কূপমণ্ডুকতা, দারিদ্র ও ধর্মান্ধতায় জর্জরিত হচ্ছেন না? এই সমালোচকের বক্তব্য এ ক্ষেত্রে আলোচ্য গ্রন্থের লেখকের অবস্থানের সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ দেশভাগই স্বাধীনতালাভের পর বাহান্ন বছর ধরে তিনটি দেশেরই জনগণের বহুবিধ সমস্যার মূল কারণ। দেশ বিভাগ না ঘটলে আজ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ভাবে এত পিছিয়ে থাকত না, ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতির বিকাশ চরমসীমা ছুঁতে পারত। সর্বোপরি তিনটি দেশেই ধর্মান্ধ মৌলবাদী শক্তি ও ছদ্মধার্মিক রাজনীতির কারবারিরা গোটা উপমহাদেশ জুড়ে তাদের এমন ফলাও কারবার বোধহয় চালাতে পারত না। বস্তুত দেশভাগের মতন অস্বাভাবিক ঘটনা না ঘটলেই বরঞ্চ পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমান ভারতীয় উপমহাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল স্রোতধারায় নিজেদের যুক্ত করতে তাদের উন্নতি আরও ত্বরান্বিত করে পারত। বৈদ্যুতিন ও অন্যবিধ গণমাধ্যমের মনুষ্য-চেতনা ও স্বচ্ছ-বুদ্ধি গ্রাসকারী সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তিনি মানুষকে সচেতন করে তোলেন তেমনই অনলসভাবে ভারতে ফ্যাসিবাদের সম্ভাবনা ও বিপদ সম্পর্কেও তিনি কথা বলে যান। চেষ্টা করে যান সমাজ ও সময়কে সতর্ক করে তুলতে। সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থটিতে তাই তিনি লেখেন : *"ভারতবর্ষেও ইহুদি ঘৃণার মতো মুসলমান ঘৃণার এবং জার্মান গৌরবের মতো হিন্দু গৌরব (সব হিন্দু নয়, বর্ণ হিন্দুর গৌরব) সচেতনভাবে রটনার ফলে বিশেষ এক সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে, তাকে ফ্যাসিবাদী বলা যায় কিনা তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু সেই সংস্কৃতিরই ফলশ্রুতি আটচল্লিশে গান্ধীহত্যা। পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর-আশির দশক জুড়ে অসংখ্য দাঙ্গা, বিরানব্বই-এ ব্যবরি ধ্বংস ও শত শত মুসলমান হত্যা (বিরানব্বই-এর বোম্বাই-এর সেই রাত্রিগুলি যেন আটচল্লিশের বার্লিন ইহুদি নিধনের 'ক্রিস্টাল নাইট')। এবং ছিয়ানব্বইয়ে তেরোদিনের ক্ষমতাতেই সেই বোম্বাইয়ে, গান্ধী হত্যার সহায়ক ও যাবজ্জীবন জেল খাটা গোপাল গডসেকে (নাথুরাম গডসের ভাই) বিশেষ সংবর্ধনা দান.... ভারতের আর-এস-এস ধ্বংস জার্মান এস-এস না হলেও দুইয়েরই সাংস্কৃতিক ঘরাণাটি এক।"*

'নরকেরও ব্যঙ্গচিত্র, মৃত্যুরও বিকার' নিবন্ধটিতে (পি. সাইনাথের বিখ্যাত বইয়ের আলোচনামূলক রচনা) লেখক তথাকথিত উন্নয়নের নামে কীভাবে দরিদ্র-দলিত-জনজাতি মানুষদের মানবাধিকার প্রতি পলে পদদলিত হচ্ছে তার একটি মর্মস্পর্শী বিবরণ দিলেও মনে হয়েছে 'তথাকথিত বিশ্বায়ন' কীভাবে আজ ভারতের মতন গরিব দেশগুলির নব্যতম ঔপনিবেশিক শোষণের অবাধ মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত করেছে এবং মার্কিনি মাতববরি কীভাবে এই সকল রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতাকে পর্যন্ত বিনষ্ট করতে উদ্যত— জ্যোতিপ্রকাশবাবুর কুশলী লেখনী যদি এ বিষয়ে অন্তত একটি করুণ পাঠকদের উপহার দিতেন—তা খুব কাজের হত। বইটির চমৎকার প্রচ্ছদটি করেছেন দেবাশিষ রায়। শুধু যদি গ্রন্থটির মূল্য আরও কিছুটা কম হত তাহলে বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছানোর পক্ষে তা সহায়ক হত। জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় দু'হাতে আরও দীর্ঘদিন ধরে লিখে চলুন এই প্রত্যাশা।

**এই সমাজ এই সময়— জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়/** দে'জ, কলকাতা - ৭৩/১০০.০০



# গণতন্ত্রের অপব্যবহার ও তার পরিণাম

## হাবিব রহমান

আবদুর রউফ, যিনি তাঁর নামের বানান ঈষৎ পরিবর্তন করে বর্তমানে লিখছেন আবদুর রাউফ, সাংবাদিক-লেখক হিসেবে সুপরিচিত। আর দীর্ঘ পাঁচ যুগের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ 'চতুরঙ্গ' পত্রিকা সম্পাদনাসূত্রে পশ্চিম বাংলার প্রান্তিক সীমা অতিক্রম করে তাঁর নাম বাংলাভাষী অন্য দেশে ও অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্প্রসারণে বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় সংহতি পরিষদ **এবং সারগর্ভ ও প্রাঞ্জল গদ্যশৈলীর জন্য সমতট সংস্থা কর্তৃক** সংবর্ধিত হয়েছেন। বই লিখেছেন 'স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান' ও 'মুক্তমনের সংকট'। আলোচ্য 'গণতন্ত্র ও সংখ্যালঘু সমস্যা' তাঁর তৃতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ।

আবদুর রউফের পরিচিতি ও খ্যাতি মূলত সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় লেখক হিসাবে। 'গণতন্ত্র ও সংখ্যালঘু সমস্যা' বইটি উত্তর-সম্পাদকীয় লেখারই একটি সংকলন। লেখকের ভাষ্য অনুযায়ী ১৯৯৮ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে লেখা এই কলামগুলো বেরিয়েছিল আনন্দবাজার ও সংবাদ প্রতিদিন দৈনিকে। সেগুলোকে ছটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে প্রস্তুত করা হয়েছে এই বইটি। অধ্যায়গুলোর নাম যথাক্রমে গণতন্ত্রের অপব্যবহার, সংঘপরিবারের ভূমিকা, খ্রিস্টানদের উৎকণ্ঠা, বাংলাভাষী মুসলমানের দুর্দশা, মাদ্রাসা শিক্ষায় সংকট ও প্রাসঙ্গিক কিছু অন্য বিষয়। লেখকের মূল আলোচ্য হল ভারতে গণতন্ত্রের স্বরূপ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর নানাবিধ সংকট-সমস্যা। এর মধ্যে শেষ অধ্যায়টি প্রথম পাঁচটি অধ্যায়ের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়। হজরত মুহম্মদ, কাজী নজরুল ইসলাম, জাতীয় উৎসব ইত্যাদি বিষয়ে এই লেখাগুলো আপাত-বিচ্ছিন্ন হলেও লেখকের মতে এগুলো সংখ্যালঘুদের মানসিকতা অনুধাবনে সহায়ক হবে আর সব মিলিয়ে বর্তমান আলোচকের বিবেচনায় সম্পূর্ণ বইটি গণতন্ত্র ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা নিয়ে ভাবিত পাঠকের সচেতনতাকে বাড়িয়ে দিতে অনেকখানি সাহায্য করবে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত লেখার গুরুত্ব অনেক সময়ই তাৎক্ষণিকতায় সীমাবদ্ধ এবং সে লেখা যদি ধারাবাহিক হয় তা হলে তা সযত্নে সংরক্ষণ করবেন এমন পাঠকের সংখ্যা বিরল। তাই এই লেখাগুলোকে দুই মলাটের মধ্যে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার খুবই দরকার ছিল।

পৃথিবীর যে অল্পসংখ্যক দেশে গণতন্ত্রচর্চার ঐতিহ্য রয়েছে ভারত তার মধ্যে একটি। কিন্তু ভারতে গণতন্ত্রের যে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ তার স্বরূপ প্রকৃতি কেমন? মূলত এই জিজ্ঞাসা থেকেই আবদুর রউফ 'গণতন্ত্রের অপব্যবহার' অধ্যায়টি লিখেছেন বলে ধারণা করি। কেননা তিনি জানেন গণতন্ত্র একটি উন্নত মানবতাবাদী মূল্যবোধের দ্যোতক। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে তাতে সকলের রয়েছে সমান অধিকার। এ কেবল জনগণের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা নয়, মানবতার চর্চা ও প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাও। এ ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত কোনও দেশেই হয়ত দেখা যাবে না, কিন্তু ভারতে এটি হয়ে দাঁড়িয়েছে কেবল ভোটব্যবস্থা। আর ভোটব্যবস্থাই যদি গণতন্ত্রের একমাত্র অথবা মূল রূপ হয় তা হলে সে ক্ষেত্রে রাজনীতিতে, সুতরাং রাষ্ট্রব্যবস্থায়ও দুর্বৃত্তায়ন ঘটতে বাধ্য। ভারতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এর যা ফল-পরিণাম— বিভেদ-বিভাজনের বৃদ্ধি— ভারতের প্রায় সর্বত্র তা অতীতে যেমন ঘটেছে বর্তমানেও তেমনই ঘটছে। বর্তমানে এর মাত্রা বরং আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তা বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম মৌল কারণ 'হিন্দুত্ববাদী'দের কেন্দ্রীয় ও আরও কিছু রাজ্যের ক্ষমতায় সমাসীন হওয়া। প্রথম চারটি অধ্যায়ে লেখক প্রকৃত গণতান্ত্রিক ও সেকিউলার মনোভাবের— যা ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম স্তম্ভ— অভাবে দেশে গণতন্ত্রের অপব্যবহার কোথায় কোথায় কীভাবে ঘটছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখিয়েছেন।

পশ্চিম বাংলাসহ ভারতে গণতন্ত্রের যে অপব্যবহার ঘটছে লেখক তা দু'দিক থেকে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন। এক দিকে সম্প্রদায়-নিরপেক্ষভাবে বিষয়টি তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন। বইয়ের প্রথম দুটি অধ্যায়ে গণতন্ত্রের অপব্যবহারকে এ ভাবে দেখা হয়েছে। অন্য দিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকেও বিষয়টি তিনি নিরীক্ষণ করেছেন। কেননা সংঘ পরিবারের হাতে ক্ষমতা আসার পর খ্রিস্টান ও মুসলমান, বিশেষ করে বাংলাভাষী মুসলমান— এই দুটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নতুন রূপে সংকটাপন্ন হয়েছে। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর খ্রিস্টান সম্প্রদায় যে ভাবে অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হয়েছে অতীতে কখনও তেমন ঘটেছে কি না জানি না, যদিও মুসলমানরা বহুবার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের শিকার হয়েছে। খ্রিস্টানদের অপরাধ কী? মিশনারিরা ভারতের বহু জায়গায় দলিত ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুদিন থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে সেবামূলক কর্মতৎপরতা চালিয়ে আসছেন। তাতে অবহেলিতদের চোখ ফুটছে ও তাদের কেউ

কেউ খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করছে। ভারতে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বাপ্নিকরা এটি সহ্য করতে পারছে না। ফলে নানা ছুতোয় তাদের উপর আক্রমণ চালানো হয়েছে। সে আক্রমণ কখনও কখনও এমন অমানুষিকতায় পৌঁছেছে যে ওড়িশায় কুষ্ঠরোগীদের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ গ্রাহাম স্টেইনস ও তার দুই নাবালক পুত্রকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। লেখকের সঙ্গত প্রশ্ন 'হিন্দুত্বের' ধ্বজাধারীরা কেন মিশনারিদের মতো চিরকালের অসহায়-বিপন্ন দলিত ও উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকদের সেবায় এগিয়ে আসে না? হিন্দুত্ববাদীদের পক্ষ থেকে এর কোনও উত্তর কিন্তু নেই।

বিজেপি-শিবসেনা জোট সরকারের অপর টার্গেট মুসলমানরা। লেখক বলেছেন বাংলাদেশ, এমনকী পাকিস্তান থেকেও অনেক দরিদ্র মানুষ পেটের দায়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। দিল্লি-মুম্বাইয়ের মতো অর্থনৈতিক দিক থেকে বর্ধিষ্ণু শহরগুলোতে এই অনুপ্রবেশ ঘটেছে বেশি পরিমাণে। এটি অস্বাভাবিক নয়। জীবিকার প্রয়োজনে এক রাষ্ট্র থেকে আর এক রাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ দীর্ঘকাল ঘটে আসছে। কিন্তু তাই বলে রাষ্ট্র এই অনুপ্রবেশ সমর্থন করবে তা হতে পারে না। রাষ্ট্রের নাগরিকদের স্বার্থহানিকর হলেই অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের কর্মসূচি রাষ্ট্র নিতেই পারে। লেখক মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েও কোনও অযৌক্তিক ভাবাবেগের প্রশ্রয় এখানে দেননি। কিন্তু তাঁর আপত্তি এই বিতাড়ন কর্মসূচির সঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যুক্ত হওয়ায়। এই বিদ্বেষ কীভাবে যুক্ত হয়েছে এবং পরিণামে কী ঘটছে তা সবিস্তারে দেখানো হয়েছে 'বাংলাভাষী মুসলমানের দুর্দশা' শীর্ষক অধ্যায়ে। এ সব যে একটি সুচিন্তিত ও পরিকল্পনামাফিক ঘটছে এ বছরের গুজরাটকাণ্ড তার এক বড় প্রমাণ।

পশ্চিম বাংলায় সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামি ধর্মশিক্ষার যে-ব্যবস্থা চালু আছে সেই মাদ্রাসা শিক্ষার কিছু সংকট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে 'মাদ্রাসা শিক্ষায় সংকট' শীর্ষক অধ্যায়ে। মাদ্রাসা শিক্ষার পক্ষে-বিপক্ষে বিগত একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে মুসলিম লেখক-বুদ্ধিজীবীরা যে-তর্ক-বিতর্ক করেছেন এবং এখনও করছেন তা যদি দুই মলাটের মধ্যে আনা হয় তা হলে এক বিশাল আয়তন গ্রন্থ হয়ে যাবে। এই বিতর্কের শেষ কবে হবে কিংবা আদৌ হবে কি না জানি না। কেননা এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ধর্মীয় স্পর্শকাতরতা। এই লেখাটিতেও তার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে। লেখক মাদ্রাসা শিক্ষায় যে-সব সংকটের কথা বলেছেন সেগুলো যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে সমাধানের পদক্ষেপ না নেওয়ায় বামফ্রন্টের হিন্দু-সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষামন্ত্রীকে দোষারোপ করেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও উল্লেখ করেছেন যে শিক্ষামন্ত্রীর মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব প্রবল হয়েছে কিছু 'তথাকথিত প্রগতিশীল মুসলিম বুদ্ধিজীবীর' অনুরূপ মনোভাবের কারণে। এই মনোভাব কিন্তু আজকের নয় এবং তা দু'একজনেরও নয়। লেখক বলেছেন মুসলমানরা মাদ্রাসাগুলোকে তাদের আইডেন্টিটির প্রতীক হিসাবে গণ্য করে থাকে। তিনি নিজেও হয়ত তা-ই করেন। অথচ আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে মুসলিম সমাজের আর একজন সাংবাদিক-লেখক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪) 'শিক্ষার কথা' নামের একটি প্রবন্ধে (বুলবুল, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৪১) মন্তব্য করেছিলেন যে মাদ্রাসা শিক্ষায় মুসলমানের 'আত্মঘাতী অভিমানের খাদ্য' সঞ্চিত রয়েছে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় তিনি এবং আরও অনেকে দেখেছিলেন মাদ্রাসা শিক্ষায় মুসলমানের প্রকৃত কোনও উন্নতি হচ্ছে না। তাঁর মতে দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য যেটুকু ধর্মজ্ঞান দরকার তা একখানি বাংলা বই থেকেই পাওয়া যেতে পারে। তার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজন নেই। তবে ইসলাম ধর্মে যারা শাস্ত্রবিদ হতে চায় সারা বাংলায় তাদের জন্য গোটা চারেক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলেই চলে। এখানে যারা শিক্ষালাভ করতে চাইবে তাদের জন্য সাধারণ শিক্ষার উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক স্তরে বিকল্প বিশেষ পত্র পড়ার ব্যবস্থা থাকবে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় শিক্ষার জন্যও তিনি অনুরূপ পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশে বা পশ্চিম বাংলায় সেই পরামর্শ কেউ মানেননি। মানলে মঙ্গলই হত।

আলোচ্য অধ্যায়ে লেখকের সকল বক্তব্য ভাবাবেগমুক্ত নয়। মাদ্রাসা শিক্ষা মানেই যে প্রগতিবিরোধী শিক্ষা নয় তার প্রমাণ দিতে গিয়ে তিনি বাংলাদেশের প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা মুহম্মদ তোয়াহা-র আত্মকথার বরাত দিয়েছেন। তোয়াহা সাহেব লিখেছেন "বস্তুত, শৈশবে আরবি-ফারসি শিক্ষাই আমার পরিণত বয়সে সঠিক পথের সন্ধান লাভে সহায়ক হয়েছে।" সঠিক পথ মানে সমাজতন্ত্রের পথ। তোয়াহা সাহেবের শৈশবের আরবি-ফারসি শিক্ষার ধরন কী ছিল জানি না, কিন্তু তাঁর উপলব্ধি অন্যের জন্যও সত্য হলে মাদ্রাসা শিক্ষিত অনেকেই তো সমাজতন্ত্রী হয়ে যেতেন। কিন্তু বাস্তবে তা তো হতে দেখা যায় না। বরং মুসলিম সমাজে মুক্তবুদ্ধিচর্চার বিরোধিতা যারা করেন তাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এই মাদ্রাসা-পড়া মানুষ। এ সত্য লেখকের অজানা থাকার কথা নয়। মুসলমান সমাজে মুক্ত মনের সংকটের কথা তিনি নিজেই তো লিখেছেন তাঁর 'মুক্ত মনের সংকট' বইয়ে।

তবু বলব কলকাতা মাদ্রাসার মতো সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাতে অনাদরে-অবহেলায় নষ্ট হয়ে না যায় সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের যথাযথ যত্নবান হওয়া বাঞ্ছনীয়। সরকার ও মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা যদি মনে করেন প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা শিক্ষার্থীকে জীবনোন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়ার কোনও সুযোগ না দিয়ে বরং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে তা হলে সেই প্রতিবন্ধকতা দূর করে জীবনের জন্য কল্যাণকর পাঠক্রম ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা তাঁদের কর্তব্য।



আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৯৮ থেকে ২০০০ সাল এই তিন বছরের মধ্যে এ বইয়ের রচনাগুলো লেখা। তারপর সময় অনেক এগিয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবেই কিছু পরিস্থিতির পরিবর্তনও ঘটেছে। তবু লেখক যে-দাবি করেছেন, কিছু কিছু পরিবর্তন সত্ত্বেও সামগ্রিক পরিস্থিতিতে বিশেষ কোনও হেরফের ঘটেনি, সে-দাবি অস্বীকার করার উপায় নেই। গুজরাটকাণ্ড লেখকের এই দাবির সত্যতা পাঠককে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে। তাই বলব ভারতে গণতান্ত্রিক রাজনীতির অপব্যবহারের অবসান যতদিন না ঘটবে ততদিন আবদুর রউফের 'গণতন্ত্র ও সংখ্যালঘু সমস্যা' বইটির গুরুত্ব মানবতাবাদী পাঠকসমাজে সমাদর পাবে।

**গণতন্ত্র ও সংখ্যালঘু সমস্যা — আবদুর রউফ/** নয়া উদ্যোগ, কলকাতা-৬/ ৬০.০০।

# নির্মাণের স্বাতন্ত্র্যে মায়া পৃথিবীর স্বর

## গৌরী সেন

শুভ্রব্রত চক্রবর্তীর সম্পাদনায় 'মায়াপৃথিবীর স্বর' মৃণাল বসুচৌধুরীর কবিতা নিয়ে আলোচনার সংকলন। এই বইটিতে বিভিন্ন লেখক ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মৃণালের কবিতার বর্ণময় আঙ্গিক, ভাষা, ভাবচেতনার শরীরী ও অশরীরী সমগ্রতা পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। কবি মৃণাল বসুচৌধুরীর কবিতায় বাস্তব পরাবাস্তব শৈল্পিক-ভুবন-নির্মাণের চাবিকাঠির সন্ধান দিতে চেয়েছেন তাঁরা।

ষাটের দশকের কবি মৃণাল বসুচৌধুরী 'শ্রুতি' পত্রিকার কবিগোষ্ঠীর সঙ্গে ছিলেন এবং কবিতা লেখার জন্য এঁরা কয়েকটি শর্ত সামনে তুলে ধরেছিলেন। এই গ্রন্থের প্রত্যেক প্রাবন্ধিক আলোচনার সূচনাতেই এই সংবাদটি দিয়েছেন। 'শ্রুতি' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় কবি পুস্কর দাশগুপ্ত জানিয়েছিলেন— "জৈব আর্তনাদ, কিংবা সমাজচিন্তার স্থান যেখানেই হোক কবিতায় নয়।"

সুমিতা চক্রবর্তী পঞ্চাশের কবি-মানসের বিশেষ তফাত দেখতে পাননি ষাটের দশকের কবিকুলের সঙ্গে। পঞ্চাশের দশকের কবিরা স্বীয় উপলব্ধি জীবনের সর্বক্ষেত্রে উন্মুক্তভাবে বিস্তৃত হবার অবকাশ দিয়েছেন; আর ষাটের 'শ্রুতি-পত্রিকা' কেন্দ্রিক কবিরা প্রধানত "অন্তর্লীন মগ্নচেতনার মধ্যেই খুঁজেছেন কবিতাকে। প্রকাশরীতির ক্ষেত্রেও পঞ্চাশের কবিরা ছিলেন খোলামেলা। 'শ্রুতি' কবিগোষ্ঠীর কবিরা কবিতা উচ্চারণের সূক্ষ্মতায় পরিশীলিত করে প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। সত্তার শুদ্ধতার যে প্রতিবিম্ব পড়ে চেতনার দর্পনে, তাকেই ভাষায় প্রকাশ করতে ইচ্ছুক ও সচেষ্ট ছিলেন তাঁরা। এই কবিরা অত্যন্ত সচেতন সংহতির পরিসীমায় গাঢ়তর উপলব্ধিকে প্রকাশ করতে চান বলেই পৃষ্ঠার সাদা অংশকে ব্যবহার করতে চান।.... শব্দ সজ্জার সাহায্যে এমন দৃশ্যময় কবিতাও তারা রচনা করতে চান যা তাদের অনুভূতিকে প্রকাশ করবে।" এর চেয়ে ভাল বোধহয় কেউ চিনিয়ে দিতে পারবেন না শ্রুতি কবিতা গোষ্ঠীর কবিতার স্টাইল ও কবিতা ভুবনকে।

১৯৬৫ সালে প্রকাশিত কবিতার বই 'মগ্ন বেলাভূমি' মৃণালের 'শ্রুতি' পত্রিকার কোনও সুনির্দিষ্ট আদর্শ গড়ে ওঠার আগেই লেখা মনে করছেন সুমিতা চক্রবর্তী। পরবর্তী দুটি কবিতার বই 'শহর কলকাতা' (১৯৭০) ও 'যেখানে প্রবাদ' (১৯৭২)। এই বই দুটির কবিতা খুবই যত্ন ও সচেতনার সঙ্গে লিখেছেন কবি; সামনে ছিল 'শ্রুতি' কবিতা পত্রিকার শর্ত ও ছক। তৃতীয় বই 'যেখানে প্রবাদ' (১৯৭২)-এর "কবিতাতে চলে এসেছে উদ্ভট ধরনের চিত্রকল্প.... যেমন 'কাঁটাতারে দীর্ঘায়ু বেড়াল', 'শকুনের ডানায় জ্বলে ক্রোধ', 'নগ্ন যাজিকার দেহে উন্মুক্ত চাবুক'," — এই সব চিত্রকল্পকে অনেকেই পরাবাস্তব মনোতলের স্বয়ংক্রিয় উল্লাস বললেও, সুমিতা চক্রবর্তী কিন্তু কবির চারপাশের পৃথিবীর ও মানবসমাজের বিভ্রান্তি ও বিবর্তনের ছায়াছবিই দেখতে পেয়েছেন। 'গুহাচিত্র' (১৯৭৬), 'এই নাও মেঘ', (১৯৮১), 'শুধু প্রেম' (১৯৮২), কবিতা সংকলনগুলিতে কোনও নতুন শিল্পভাবনার সন্ধান পাননি সুমিতা তবুও "কবিতাগুলি সুগঠিত এবং নিপুণভাবেই ব্যক্ত করে কবির উপলব্ধি-জাত বাচ্য বিষয়কে।" দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে ২০০০ সালে পাওয়া গেল 'এবার ফেরো সন্ন্যাসে', আর ২০০১-এ 'শব্দ নির্মাণ'— এই দুটি কবিতার বই-এর কবিতায় বাচনিক সরলতা এল ও কবিতার শরীর গঠনের সচেতনতা সরে গেল বলে মনে হয়েছে প্রবন্ধ লেখিকার। গোড়ার কবিতাগুলির বিপরীত কণ্ঠস্বর শোনা গেল সহজ সরল প্রকাশে, মনের খুশির ঝলকে বাস্তব জীবন ও সময়ের ছবি যেন "ক্যামেরা বন্দী"— এখানেই মৃণালের "স্মরণীয় কবিতার জন্ম" হয় ও জীবনকে চিনে নেবার এক পাঠ খুঁজে পান সুমিতা চক্রবর্তী।

১৯৬৪ সালের এক ঐতিহাসিক ঘটনার আঁচের মধ্যে 'মগ্নবেলাভূমি'র কবিতা রচিত হলেও এই সময়ে 'শেকড় ছেঁড়ার ভয়ংকর টান'। তাই অর্ধেন্দু চক্রবর্তী যখন 'মৃণাল বসু চৌধুরীর কবিতা ও সত্তা' প্রবন্ধে বলেন, "এই গ্রন্থের কিছু কবিতা তাই

সময়ের সাক্ষী, সময় সেখানে নির্ভুল কাজ করেছে .... তবে আড়ালে, অস্থিতে মজ্জার মত" তখন মৃণাল যেন 'শ্রুতি' কবিতা পত্রিকার প্রতিশ্রুতির বাইরে। আরও বেশ কয়েকটি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে অর্দ্ধেন্দু চক্রবর্তী পাঠককে বোঝাতে চেয়েছেন যে মৃণাল বসুচৌধুরী সময়ের রাজনীতি একদম খোলামেলা তুলে নিয়েছেন তাঁর কবিতা গ্রন্থের কবিতায়— তবে এই সময়ের কবিতায় "পাঠকের মুখোমুখি যতটা তার চাইতে বেশী তার নিজের হৃদয় ভ্রমণ"; শ্রুতি-কবিতাগোষ্ঠীর কবিদের সঙ্গে তাই পৃথক এই "আশ্চর্যময়তা"। 'যেখানে প্রবাস' (১৯৭২) এর কবিতা সম্বন্ধেও প্রবন্ধ লেখকের একই অভিমত। 'গুহাচিত্র' (১৯৭৬), 'এই নাও মেঘ' (১৯৮১), 'শুধু প্রেম' (১৯৮২), 'ধারাবাহিক অবহেলা' (১৯৮৭) — বইগুলির কবিতায় আলোচক লক্ষ করেছেন, "রহস্যময়তার মোড়কে সংযমী শব্দের প্রয়োগে সংকেতময়তা ও সংযম।"

উত্তম দাশ 'মৃণাল বসুচৌধুরীর কবিতা' নিবন্ধটিতে 'শ্রুতি' পত্রিকার প্রতিশ্রুতিগুলি স্মরণ করে বলেছেন, কবিতার শরীর নির্মাণে শব্দসুজ্জার প্রতি মৃণাল পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কবিতার আঙ্গিকগত রূপান্তরে ভাবের বস্তুগত দৃশ্যময়তা থেকে অনুভূতির অগম্য স্তরে মৃণালের যাতায়াত; মৃণালের সব কটি কবিতার বই-এ এই অনায়াস ভ্রমণ লক্ষ করেছেন তিনি। প্রবন্ধ লেখক বলেন, "আঙ্গিকগত নানা রূপান্তরে বিশ্বাসী হয়েও মৃণালের কবিতা আবেগ ও বিষয় নির্ভর। প্রেমজাত যন্ত্রণা, সংকট এবং আত্মার প্রদাহ তার নিত্যসঙ্গী।" কিন্তু এই কবির কণ্ঠেই সামাজিক দায়বদ্ধতারও প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে কোনও কোনও কবিতায়।—

ব্যাকুল শুভেচ্ছা নিয়ে
উদ্বেগ প্রবণ মানুষের জন্য আজ
লিখে রেখো
শেষতম কবিতা আমার।

মঞ্জুষ দাশগুপ্তর নিবন্ধ "নির্জন বাস্তব থেকে পরাবাস্তবের দিকে" এই শিরোনামই বুঝিয়ে দেয় যে তিনি মৃণাল বসুচৌধুরীর কবিতার বাস্তব থেকে পরাবাস্তবে যাত্রার ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুনিয়েছেন। "তাঁর শুদ্ধতার অনুভব তাঁকে নির্জন বাস্তব থেকে পরাবাস্তবের দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেছে।" কবিতায় বার বার 'অশরীরী' শব্দটির আসা যাওয়া, কবিতার 'মায়াপুর ভ্রমণ', এই ভাবেই শব্দের ব্যবহারে পরাবাস্তবতার অনিবার্য প্রকাশশৈলী দেখতে পান প্রবন্ধ লেখক।

সুজিত সরকার মৃণাল বসুচৌধুরীর কবিতায় কবির আত্মমগ্নতা ও অন্তর্মুখিতা এবং 'অপরূপ ভাষা চিনে' কবিতার শরীর গঠনশৈলী লক্ষ করেছেন "মৃণাল বসুচৌধুরী যে বিশেষ ধরনের আঙ্গিক নির্মাণ করেছেন;সেই আঙ্গিকের সাহায্যে কবিতায় ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদাভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, কবিতা হয়ে ওঠে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ ও ব্যঞ্জনাময়।"

শুভব্রত চক্রবর্তী 'ভূমি ডানা স্পষ্ট হয় শব্দের দর্পণে' নিবন্ধটিতে আন্তরিকতার সঙ্গে মৃণালের কবিতা ও কবিসত্তার শিল্পীত নির্মাণের স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরেছেন পাঠকের কাছে। প্রথম তিনটি কবিতার বইয়ের কবিতায় একজন সচল গতিময় প্রকৃত কবির সন্ধান পেলেন শুভব্রত চক্রবর্তী। মেধা ও আঙ্গিকের সাহায্যে আবেগকে সঠিক নিয়ন্ত্রণ করে ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করলেন মৃণাল "আর সেই ব্যঞ্জনার খাতিরেই কবিতায় শব্দের প্রাসঙ্গিকতা ক্রমে বিন্যাস কৌশল রপ্ত করলেন মৃণাল।"

'সৃজন পাঠকের চোখে সাহিত্য ও মৃণাল বসুচৌধুরীর কবিতা' প্রবন্ধে দীপঙ্কর বাগচী যখন বলেন, "মৃণাল বসুচৌধুরী প্রথম থেকেই তাঁর কবিতা রচনার পদ্ধতি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছেন", তখন পাঠক বুঝতে পারেন যে প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই মৃণাল কবিতার শরীরী নির্মাণে সচেতন কুশলতা দেখিয়েছেন। "কবিতার ভাষা ও পরাভাষার দ্বিখাচনিক প্রক্রিয়ায় কবিতায় যে ভাববিশ্ব গড়ে ওঠে তা পাঠকের যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করে। একটি চরম বাস্তব আর একটি কাঙ্খিত বাস্তবের মধ্যে, 'উদ্দেশ্যপ্রবণতা ও উদ্দেশ্যহীনতার মধ্যে' মৃণালের কবিতায় ভ্রমণ।"

পবিত্র মুখোপাধ্যায় মৃণালের সাদিধ্যের শুরু থেকেই তাঁর কবিতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধ 'মায়াপৃথিবীর স্বর' নামটিই মৃণালের কবিতার এমন এক অজানা রহস্যময় পরিবেশ, অন্য এক পৃথিবীর দিকে টানে যাকে প্রাবন্ধিক বলছেন, "আমি এই কবিতার অনির্দেশ সহবাসকে বলেছি মায়াপৃথিবীর স্বর।" বাস্তবকে স্বীকার করেও, পরাবাস্তবের কাছে 'আয়সমর্পণের ছায়া কেঁপে ওঠে' মৃণালের কবিতার অন্তরের অন্ত:স্থলে। পবিত্র মুখোপাধ্যায় তাঁর নিবন্ধে মৃণালের কবিতা রচনার প্রতিটি ধাপকে অতিক্রম করে আমাদের কাছে পৌঁছে দেন কবির কবিতার দর্শন ও সত্তা। মৃণালের কাব্যগ্রন্থগুলির দীর্ঘ আলোচনায় লেখক বলেছেন কবির আপাত শান্ত কবি-চেতনার মধ্যে সমকালীন সংকট যে ঘূর্ণি তুলেছে, যা কবিকে সুস্থির থাকতে দেয়নি, মাঝে মাঝেই কবিকে অস্থির করে তুলেছে তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর প্রথম দিকের বইগুলির কবিতায়। নিজস্ব প্রেম, প্রকৃতি ও আন্তিক্য-বোধকে টলিয়ে দিয়েছে। সময়ের দাবি, ভুলিয়ে দিয়েছে 'শ্রুতি' পত্রিকার কিছু কিছু প্রতিশ্রুতি। প্রাবন্ধিক মৃণালের প্রায় সব কবিতা-বইয়ের কবিতায়, কবিতার বিষয়, মেজাজ ও দেহ-নির্মাণ একই ধারায় বহমান দেখেছেন। "কবি মৃণাল রোম্যান্টিক স্বভাবের, কবিতার শরীর দীর্ঘায়িত করেন না, চিত্রকল্পের উপর বেশি দৃষ্টি তাঁর, জীবনের প্রতি হ্যাঁ বাচক মূল্যবোধে অবস্থান করেন, প্রকৃতির



প্রতি, ভালোবাসার প্রতি তাঁর আকর্ষণ প্রথম থেকেই," লক্ষ করেছেন আলোচক। কবি বলেন, 'নতমুখে জীবন যাপনে তুমি নেই', 'মঞ্চ থেকে মানুষের মধ্যে নেমে আসা-' ধারাবাহিক অবহেলা' কবিতা বইয়ের কয়েকটি পঙক্তির মধ্যে মৃণালের কবিতায় বাঁক নেবার জায়গা। ৭০-৭১-৭২ এর ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক উত্তাল দিনগুলোর আঁচ পাওয়া যায়—"কবির দায়বোধ তো এভাবেই পালিত হয় পরোক্ষ ভাবে।" 'এবার ফেরো সন্ন্যাসে' বইয়ে সমকালীন জীবন সচেতনা আগের থেকে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে, শেষ ধাপের কবিতার বইয়ের কবিতাকে আলোচক 'মোহমুক্তির কবিতা' বলছেন।

পরিশিষ্টে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, কৃষ্ণা বসু, শংকর চক্রবর্তী, কল্যাণ সেন—মৃণাল বসুচৌধুরীর একটি বা দুটি কবিতার বই নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় মৃণালের কবিতার কোনও সাময়িক পরিচয় নেই।

সম্পাদক শুভব্রত চক্রবর্তী পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের শিরোনাম 'মায়া পৃথিবীর স্বর' বেছে নিয়েছেন। শিল্প প্রবাস কালে মৃণাল আমাদের খুবই কাছের মানুষ ছিলেন। তাঁর মৃদু উচ্চারণে কথা, নম্র সপ্রতিভ ব্যবহার যেন তাঁরই কবিতার মতো। বাস্তব পৃথিবীতে বসে মৃণাল বসুচৌধুরী পরাবাস্তবের স্বর শোনেন, মায়াপৃথিবীর স্বর শোনেন।

**মায়া পৃথিবীর স্বর,-সঃ শুভব্রত চক্রবর্তী/ইস্‌ক্রা, কলকাতা-৫৮/৫০.০০।**

# শুধু বাইরে গড়ার শব্দ নয়

## হেদায়েতুল্লাহ

বইটা পড়তে পড়তে তপোবিজয় ঘোষের 'কালচেতনার গল্প'গুলোর কথা মনে পড়ে যায়। শ্রদ্ধেয় তপোবিজয়বাবু শুধু গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু তার ভেতরে ভাঙনের শব্দ শুনতে পাননি। কিন্তু গৌতমবাবু ভাঙনের শব্দ শুনতে পেয়েছেন। এখানে তাঁর কৃতিত্ব অস্বীকার করা যাবে না। বাইরে গড়ার আয়োজন থাকলেও, ভেতরে ভেতরে তাতে ভাঙনের শব্দ শোনা যায়। গৌতমবাবু মার্কসবাদে আর্দশবাদী হলেও, সব কিছুকেই এক রঙে দেখেননি। যুগের পরিবর্তনের ফলে মানুষের জীবনবোধ, মূল্যবোধ, আদর্শবাদিতার ভরকেন্দ্রের পরিবর্তন ঘটেছে। আবার অনেক আচার, কুসংস্কার, বিশ্বাস প্রভৃতি মানুষের মধ্যে অচল পাথরের মতো বসে আছে। মার্কসবাদ, আধুনিকবাদ — কোনও বাদ তাকে খারিজ করতে পারেনি।

আলোচ্য গল্পগ্রন্থটিতে তাঁর পনেরোটি গল্প আছে। বেশির ভাগ গল্প আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে নব্বুই দশকের শেষ পর্যন্ত।

প্রথম গল্প 'জীবন বৃত্তান্ত' -এ জীবনলাল বাঁচার আগ্রহটুকু হারিয়ে ফেলে। একটা ছোট্ট মেয়ে চাঁপা তার বাঁচার ইচ্ছেটুকু চাগিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে একটা কৌতূহলও। চাঁপা তার হারিয়ে যাওয়া বোনের মেয়ে নয় তো ? 'তপোমৃত্যু' গল্পে স্বামী ও স্ত্রীর উচ্চাকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্বে স্বামীর আত্মহত্যা। আসলে দ্বন্দ্বে একজনকে তো হারতেই হবে। বিরানব্বুই সালের দাঙ্গা নিয়ে গল্প 'প্রজন্ম।' নিজের কেরিয়ার নিয়ে ব্যস্ত পরবর্তী প্রজন্ম ভয়ানক সংকীর্ণ ও সুপ্ত সাম্প্রদায়িক — এ কথাটাই তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। 'নোনে মিত্তিরের আশির দশক' আমাদের চোখ ফুটিয়ে দেয়। কমিউনিস্ট হলেই যে কেউ সব কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের ঊর্ধ্বে উঠে যাবে তা ঠিক নয়। বরং প্রতিক্রিয়াশীল হলেও নোনে মিত্তির সংস্কারকে ত্যাগ করতে পেরেছিল। 'ঘরের কোণ ও অমলতাস' গল্পে বর্তমান শিশু ও কিশোরদের কথা বলা হয়েছে। তারা এখন প্রকৃতির খোলামেলা পরিবেশে খেলাধুলো করতে পারছে না। ঘরের কোণে কৃত্রিমভাবে তাদের বিনোদনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 'ইন্টারভিউ' গল্পে তিনি সেই সব লোকদের কথা বলেছেন যাঁরা প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও প্রচারের আলো পাননি। আঁধারেই তাঁরা রয়ে গেছেন। 'কল্পনার কুড়িয়া' গল্পে তিনি শিল্পীসত্তা ও রাজনীতিবোধ — এই দুই দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন।

'টার্নিং পয়েন্ট' গল্পে আছে এক তরুণী সাংবাদিকের কথা যে সততার সঙ্গে সাংবাদিকতার জগতে নাম কিনতে চায়। কিন্তু সংবাদপত্রে হলুদ খবরের ছড়াছড়ি। তাই সত্য খবরের সেখানে এক কানাকড়ি মূল্য নেই।

'কবি' গল্পে লেখক খবার প্রসঙ্গ এনেছেন। শহরে বসে আমরা যতই ঢাক পেটাই, এখনও আমরা জলের সমস্যা মেটাতে পারিনি।

'রুদ্র মরে নি', গল্পটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প। কবি রুদ্রের ভেতরে আত্মগর্বী বিধবংসী কবিতা। অশান্ত রুদ্র রাজনীতিতে জড়িয়ে গেল। আবার রাজনীতি ছেড়ে মধুশ্রীকে বিয়ে করে গৃহী হয়ে গেল।

কিন্তু না। রুদ্রের ভেতরে যে কবিতার আগুন তা কিন্তু মরে গেল না। 'চিলে কোঠা' গল্পে লেখকের অবচেতন মনের রাজপ্রাসাদ যেন চিলেকোঠা। সেখান থেকে তিনি অনেক রঙিন কল্পনার জগৎ তৈরি করতে পারবেন। মনিরাম মেথরের পূর্ণবয়ব মূর্তি বসাতে গিয়ে শিশিরবাবু টের পেলেন সত্যিকারের আবর্জনা দূর করতে গেলে চেয়ারম্যানের পদে বসে থাকলে হবে না।

'ভাঙনের শব্দ' গল্পে লেখক কাঞ্চন ও বকুলের প্রেমের মধ্যে দিয়ে আমাদের ভেঙে যাওয়া মূল্যবোধ, আত্মমর্যাদা প্রভৃতি আঙুল তুলে দেখিয়েছেন। গৌতমবাবু পার্টি দরদী হয়েও আত্মসমালোচনা করতে ছাড়েননি। ঝরঝরে ও সাবলীল ভাষায় তাঁর গল্পগুলো লিখেছেন। বইটার প্রচ্ছদও বেশ সুন্দর হয়েছে।

**ভাঙনের শব্দ** — গৌতম দে/পত্রলেখা, কলকাতা-৯/৪০.০০।

# কলকাতার ছবি

## বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি একটি অভিনব গ্রন্থ হাতে এসেছে। গ্রন্থটির নাম — 'Index to Pictures on Calcutta.' সঙ্কলন করেছেন National Library Employees' Association. কলকাতা ও তার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যত ছবি জাতীয় গ্রন্থাগারের (কলকাতা) গ্রন্থগুলিতে পাওয়া গেছে তার সূচি প্রকাশ করেছেন কোনও বাণিজ্যিক প্রকাশক বা শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান নয়, জাতীয় গ্রন্থাগারেরই (কলকাতা) কর্মী সমিতি। দীর্ঘ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফসল এই গ্রন্থটি কলকাতা সম্পর্কে নানা তথ্যের সন্ধানী গবেষকদের অনেক দিনের অভাব পূরণ করবে। কলকাতা নিয়ে নানা বইয়ের তালিকা ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে, আরও প্রকাশের কাজ চলছে কিন্তু কলকাতা ও তার বিখ্যাত মনীষীদের ছবি নিয়ে প্রকাশিত এটিই প্রথম তালিকা-সূচি। এর আগে এই ধরনের বিস্তারিত কোনও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা নেই। আংশিকভাবে প্রকাশিত হলেও তা সাধারণের জন্য প্রচারিত হয়নি। সম্প্রতি প্রকাশিত (জুলাই-২০০১) Index to Pictures on Calcutta যেমন বিশদ তেমনই তথ্যমূলক।

১৬৯০ সালে জব চার্নকের প্রাচীন কলকাতা আর বর্তমানের কলকাতার চিত্র এক নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হয়েছে পারিপার্শ্বিকতারও। এক সময়ের বিভিন্ন সৌধ যা এক কালে দৃষ্টি-নন্দন ইমারত ছিল তারই ধ্বংসাবশেষের উপর গড়ে উঠেছে নতুন নতুন বহুতল গগনচুম্বী অট্টালিকা। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর অফিস কাছারির প্রাবল্যে এক কালের নানা ধরনের 'বাংলো' বাড়ির পরিবর্তন হয়েছে অনেক দিন আগে থেকেই। সুউচ্চ ছাদ আর নানা কারুকার্যের পরিবর্তে এখন স্থান সঙ্কুলানই প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই কারণেই আজকাল কলকাতার গলিতে গলিতে গগনচুম্বী ইমারতের ছড়াছড়ি। স্থাপত্য সৌন্দর্যের চেয়ে এখন স্বল্প পরিসরে অধিক স্থান সঙ্কুলানের সমস্যা সমাধানে স্থাপত্যবিদেরা ব্যস্ত।

প্রাচীন কলকাতার ইতিহাস খুঁজলে জানা যায় যে ১৬৯০ সালের ২৪ শে আগস্ট ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জব চার্নক প্রথমে সুতানুটি গ্রামে বসবাস করতে থাকেন। তারপর ১৬৯৮ সালের ১০ই নভেম্বর বাংলা নবাবের এক 'ফরমান'-এর ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সার্বর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে গোবিন্দপুর, সুতানুটি ও কলকাতা গ্রাম তিনটি ক্রয় করে শহরের পত্তন ঘটায়। ১৬৯৯ তে কোম্পানি গোবিন্দপুর, সুতানুটি ও কলকাতা এই তিনটি গ্রাম নিয়ে গঠন করে 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি'— যার মধ্যে কলকাতাই প্রাধান্য পায়। বর্তমানের প্রধান ডাকঘরের কাছে একটি দুর্গ তৈরি করে কোম্পানির লোকজন ও সেনারা থাকতে আরম্ভ করে, তাদের তখনকার ঠিকানা ছিল, Bengal Presidency. Fortwilliam, Calcutta. প্রকৃতপক্ষে ১৬৯৮ সালের ১০ই নভেম্বর লর্ড ওয়েলেস্‌লি ফোর্ট উইলিয়ামে প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকেই কলকাতার শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

প্রাচীন কলকাতার ইতিহাসের খণ্ডচিত্র পাওয়া গেল কিন্তু কেউ যদি তা ছবিতে দেখতে চান? কোথায় খুঁজবেন? এই কোথায় খোঁজার হদিশই দিয়েছে Index to Pictures on Calcutta. অবশ্য পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আছে এমন কথা বলা যাবে না কারণ বইটিতে কেবল জাতীয় গ্রন্থাগারে যে সমস্ত বই রয়েছে সেগুলিরই কলকাতা সংক্রান্ত ছবির সূচিকরণ করা হয়েছে। আর কলকাতা নিয়ে যত বই প্রকাশিত হয়েছে সবগুলি কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে আছে এমন দাবি করা যাবে না। কারণ অনেক প্রকাশকই তাঁদের প্রকাশিত বই জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা দেন না, যদিও Delivery of Books Act অনুযায়ী ভারতের তিনটি গ্রন্থাগারে প্রত্যেক প্রকাশকের প্রকাশিত একখানি বই দেওয়া বাধ্যতামূলক। বর্তমান সুবৃহৎ গ্রন্থটির ৯১২ পৃষ্ঠার সঙ্গে রয়েছে ১৬টি প্রারম্ভিক পৃষ্ঠা।





বইটির কয়েকটি ভাগ এই রকম : ব্যবহারের পদ্ধতি, সংক্ষিপ্ত শব্দের পূর্ণাঙ্গ রূপ, কলকাতার বিভিন্ন ছবির তালিকা, কলকাতা সম্পর্কিত ছবির তালিকা, কলকাতার বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ছবির তালিকা, শিল্পী ও চিত্রসংগ্রাহকের তালিকা, যে সমস্ত বই ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলির ক্রমিক ও বর্ণানুক্রমিক (লেখক-গ্রন্থের শিরোনাম সহ) তালিকা। বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন শ্রীসুধীর মৈত্র—প্রচ্ছদে প্রাচীন কলকাতার চিত্র। প্রিন্টিং সেন্টারে ছাপা হয়েছে বইটি। বইটির অন্যতম মূল্যবান দিক হল এর ভূমিকা। লিখেছেন বিখ্যাত কলকাতাবিদ ড. পি. থাঙ্কাল্লান নায়ার — যিনি পি. টি. নায়ার নামেই অধিক পরিচিত। জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সম্পাদক শ্রীআশিস নিয়োগীর প্রস্তাবনায় শক্ত মলাটে সুন্দর একখানি আকর গ্রন্থ। মূল্য এক হাজার টাকা। বইটি কেবল জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির কাছেই পাওয়া যাবে বলে মনে হয়, কারণ বইটির প্রাপ্তিস্থানের কোনও ঠিকানা উল্লেখ নেই।

গ্রন্থটি সংকলনে সংকলকবৃন্দ কয়েকটি স্থানে নতুনত্বের আস্বাদে একটু স্বাধীনতা নিয়েছেন। বিশেষত বানানের ক্ষেত্রে। অবশ্য এ কথা ঠিক, ইংরেজরা ভারতের ব্যক্তি ও স্থানের নাম নিজস্ব উচ্চারণের ভঙ্গিতে লিখেছেন। আর ইংরেজিতে লেখার সময় এমনকী বাংলা ভাষায় লিখতে গিয়েও আমরা ইংরেজদের লেখা বানানই অনুসরণ করি এবং দীর্ঘকাল প্রচলনের ফলে এই বানানেই আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। সেই কারণে অন্য ধরনের বানান দেখলে একটু অপরিচিতই লাগে, যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ইংরেজিতে স্বাক্ষর করতেন তখনও লিখেছেন— Rabindranath Tagore, অথচ বইটিতে রয়েছে Rabindranath Thakur (পৃ: ৫৩৫), পণ্ডিত রবিশঙ্করও তাঁর নামের বানান লেখেন Ravishankar, বইটিতে ব্যবহৃত Rabisankar নয়। অনুরূপ বানানের স্বাধীনতা স্থাননামের ক্ষেত্রেও নেওয়া হয়েছে, যেমন, Baliganj, (পৃ: ২৭৭), Taliganj (পৃ: ২৭০), Kasipur (পৃ: ২৭১) এই বানানগুলি আজও যথাক্রমে Ballygunge, Tollygunge এবং Cossipur বানানে লেখা হয়। অথচ মহীশূরের ক্ষেত্রে Mysore-ই (পৃ: ২৭০) রাখা হয়েছে, সেখানে নতুন বানান ব্যবহৃত হয়নি।

অনেকগুলি ছবির উল্লেখ আছে যাতে ঘটনার কোনও তারিখ উল্লেখ নেই, যেমন সংলেখ নং 0079 – Amartya Sen – Reception – Dum Dum Airport, ও 0080 – Amartya Sen – Reception – Indian Chamber of Commerce, কিন্তু কত তারিখে তার উল্লেখ নেই; ঘটনা তো বেশি দিনের নয় তাহলে ছবিতে তারিখ না থাকার কথা নয়। তারিখ নেই অনেকগুলিতেই, যেমন —

0679 : Buddhadeb Bhattacharya – Calcutta Technical School Inauguration Ceremony.

0727 : Calcutta Book Fair

0662 : Brigade Parade Ground – Jyoti Basu – meeting.

0663 : Brigade Parade Ground – NCC Day – Jyoti Basu.

0667 : Brigade Parade Ground – Political gathering

ইত্যাদি অনেকগুলি সংলেখই তারিখবিহীন। তারিখ না দেওয়ার ফলে বিশেষ কোনও তারিখের ছবি দেখার প্রয়োজন পড়লে সংলেখ দেখে বোঝা যাবে না কোন তারিখের ছবির উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, জ্যোতি বসু ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বিভিন্ন সময়েই সভা করেছেন, কোন তারিখের সভার ছবি আছে তা এই সূচিকরণ থেকে বোঝা যাবে না। আবার অন্যত্র ঘটনার তারিখ উল্লেখ থাকলেও স্থানের নাম উল্লেখ নেই, যেমন 0677 সংলেখে Buddha Jayanti Celebration – May, 1956, রয়েছে কিন্তু কোনও স্থানের উল্লেখ নেই। এর ফলেও সংলেখ দেখে বোঝা যায় না বুদ্ধ জয়ন্তী অনুষ্ঠানটি কোথায় হয়েছিল।

বিষয়-বিন্যাসও স্পষ্ট নয়। যেমন 0711 – Buses এর তলায় 0712 – Calcutta Tramways Co Ltd, তার নীচে 0713 – Double Decker Bus. সব চেয়ে অস্পষ্ট 0715 – Trolly Bus এর তলায় Bustee See Slum. বর্ণানুক্রমিক শব্দের বিন্যাস হলেও না হয় কথা ছিল—কিন্তু হঠাৎ Trolly Bus এর নীচে Bustee খুঁজতে যাব কেন?

সাময়িকপত্রের ছবি আলোচ্য গ্রন্থে নেওয়া হয়নি তা গ্রন্থের ভূমিকায় লেখা হয়েছে যদিও ব্যতিক্রমও আছে যেমন গ্রন্থে 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকা এবং 'ভ্রমণ' পত্রিকার পুজা সংখ্যার ছবি নেওয়া হয়েছে— কিন্তু কলকাতা সংক্রান্ত ছবির সূচিকরণে কলকাতা পুরসভা প্রকাশিত 'পুরশ্রী' পত্রিকায় প্রকাশিত ছবি সূচিকরণে নেওয়া প্রয়োজন ছিল কারণ তাতে প্রাচীন থেকে বর্তমান বহুস্তর কলকাতার অসংখ্য ছবি পাওয়া যায়, যেগুলির মূল্য গবেষকদের কাছে অসীম।

পরিশেষ একটা কথা বলতে হয়— কলকাতার চিত্রসমূহের সূচিকরণের গ্রন্থে কিন্তু কোনও চিত্র সন্নিবেশিত হয়নি। চিত্র দিলে গ্রন্থের ব্যয় বাড়ত সন্দেহ নেই, তবে প্রাচীন কলকাতার কয়েকটি ছবি থাকলে ভাল হত।

এতৎ সত্ত্বেও এ কথা বলতেই হবে এমন একটি দুরূহ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ কর্মী সমিতির উদ্যোগে প্রকাশিত হওয়ায় নিঃসন্দেহে কর্মীবৃন্দের সাধুবাদ প্রাপ্য।

**Index to Pictures on Calcutta – edit. Ashish Neogy** / National Library Employees' Association, Calcutta / 1000.00

# প্রসঙ্গ : শ্রীরামকৃষ্ণ — কালের প্রেক্ষিতে শাশ্বত সত্য

## অরূপরঞ্জন প্রধান

শ্রীরামকৃষ্ণের ক্রান্তদর্শী জীবনের অসংখ্য সংকলনের মধ্যে বিদগ্ধ ড. এইচ.এন সরকার লিখিত "Sri Ram krishna A New Philosophy" একটি অভিনব ও অনবদ্য সংযোজন। লেখকের জ্ঞানের গভীরতা এবং বিশ্লেষণের মৌলিকত্ব বিশেষভাবে অভিনন্দনযোগ্য। একদিকে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ হেগেল, মার্কস, ক্রাস্‌ব, ইয়ুং, রাসেল, টয়েনবি, ম্যাক্সমুলার , রোমা রোঁলা, ইসার উড থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাচ্য মনীষী শঙ্করাচার্য, রামানুজ, রামমোহন, বিবেকানন্দ, গান্ধীজি, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, নেতাজি সুভাষচন্দ্র, রামমোহন, জওহরলাল নেহরু প্রমুখ বিভিন্ন চিন্তাবিদদের উদ্ধৃতি বিশ্লেষণ করে লেখক তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনায় একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করেছেন। সর্বোপরি বেদ বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, ব্রহ্মসূত্রের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক বেত্তাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত যে সব প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে তাতে লেখকের জ্ঞানের ব্যাপ্তি সম্পর্কে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। স্বল্পপরিসরে এমন একটি পুস্তক সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করা নিঃসন্দেহে একটি দুরূহ কাজ।

পুস্তকটির প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকা স্বরূপ লেখক পাশ্চাত্য দর্শনের (Metaphysics) ঈশ্বর তত্ত্বের বিভিন্ন বক্তব্যের পাশাপাশি যেভাবে অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ এবং অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের বিশ্লেষণ করেছেন তা সঠিক মানদণ্ডের শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছে। বেদান্তকেশরী শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যার পাশাপাশি হিন্দুদর্শনের অন্যান্য শাখা হিসাবে সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা, উত্তর মীমাংসা ইত্যাদি আলোচনায় লেখক যে ভাবে রামমোহন দয়ানন্দের পথ ধরে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ অনুধ্যানে পৌঁছেছেন তা গভীরভাবে অনুধাবনযোগ্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে অনুষ্ঠিত ছোট্ট ছোট্ট অমিয় ঘটনার ও ভাগবতউক্তির যে ভাবে মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ করেছেন তাতে বইটি এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলতে ইচ্ছা করে। সমষ্টি বিপর্যয়ের গলিত শবের পাশে নতুন সৃষ্টির বোধন লগ্ন রচনার ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবনার প্রাসঙ্গিকতাকে তিনি যে ভাবে দক্ষতার সঙ্গে প্রমাণ করেছেন তা এক কথায় বিন্দুতে সিন্ধু পরিবেশন। তবে আলোচ্য পুস্তকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান অধ্যায় হল তৃতীয় অধ্যায় যেখানে ঈশ্বর, জগৎ, অহং, অবতারতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, ধর্মীয় সমন্বয়, নৈতিকতা ও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনের মৌলিকতাকে বলিষ্ঠভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে। সবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ — ভাবনার প্রসারে চতুর্থ অধ্যায়ে যে পরিশিষ্ট, গ্রন্থপরিচিত ও নির্ঘণ্ট দেওয়া হয়েছে তাও আলোচ্য পুস্তকের অমূল্য সম্পদ এবং ভবিষ্যতের শ্রীরামকৃষ্ণ গবেষকের কাছে একটি মূল্যবান দলিল। কাব্যিক ছন্দে প্রকাশিত দুটি রচনা শ্রীরামকৃষ্ণের রাতুল চরণে আত্মনিবেদনের একটি অন্তরঙ্গ ভাববিচ্ছুরণ এবং ভক্তিপ্রেমের এক দিব্য মণিমঞ্জুষা।

এই প্রসঙ্গে লেখকের দু'একটি সাহসী এবং নির্ভীক মন্তব্যের অবতারণা করা প্রয়োজন। লেখকের মতে শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গি শংকরাচার্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং শুধু শংকর কেন লেখক মনে করেন অতীতের সমস্ত ধর্মাচার্য এবং বেদান্তবেত্তাদের তুলনায় শ্রীরামকৃষ্ণের স্থান সর্বশীর্ষে। এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন শিষ্য গবেষক, বিবেকানন্দ এবং ম্যাক্সমুলরের বক্তব্যকেও অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে খণ্ডন করেছেন। তাঁর মতে— "The Sankar Philosophy is always uppermost in their minds and is deeply ingrained in their brains and therefore they are hardput to it to understand Ramkrishna's Philosophy" (Page 29) এমনকী লেখক তাঁর পুস্তকের ৪১ পৃষ্ঠায় বিবেকানন্দের বিশ্লেষণকেও সমর্থন না করে বলেছেন– 'So I say in all humility that we cannot accept Swami Vivekananda when he says, "it was no new truth that Ramkrishna Param Hansha came to preach, though his advent brought the old truth to light." (Page 41) এ কথা ঠিক যে যুগের প্রয়োজনে সাম্প্রতিকতম অধ্যাত্মবেত্তা হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বাপেক্ষা বেশি বিবর্তিত (evolved) হবেন — এটাই তো স্বাভাবিক — কিন্তু সেই তত্ত্বদর্শন শংকরকে ছাপিয়ে গেছে কি না তা জানিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ থাকতেই পারে। অনেকের মতে শংকর জগৎকে যে অর্থে মায়া বলেছেন তাকে নবযুগের প্রেক্ষিতে ঠিকমতো ব্যাখ্যা করা দরকার। শংকর জগৎকে মিথ্যা বলেননি বরং মায়া তথা পরিমাপিত (Limited বা খণ্ড) বলেছেন। তা ছাড়া অদ্বৈতবাদের প্রচারক হলেও গুরুসান্নিধ্যে তিনি অদ্বৈতবাদের উপর জোর দেননি। সর্বোপরি তিনি অদ্বৈত নির্গুণব্রহ্মের পাশাপাশি মণ্ডন ব্রহ্মশক্তিকেও স্বীকার করেছেন তাঁর নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার নিরিখে। তা ছাড়া আচার্য শংকরের সঙ্গে পুরুষোত্তম শ্রীরামকৃষ্ণের কোনও অবস্থাতেই তুলনা সমীচীন মনে করেননি



বিবেকানন্দ। সে জন্য শংকরের অদ্বৈততত্ত্বের প্রচারক হয়েও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বরিষ্ঠ বলে বন্দনা করেছেন। তা ছাড়া অবতার পরিক্রমায় দেখা যায় যে যুগসমস্যা সমাধানে একেরই অবতরণ হচ্ছে নানা ভাবে—নানা ব্যঞ্জনায়— সেই তাৎপর্য বেদবেদান্তের তুলনায় ছোট কি বড় তার বিচারের চেয়ে তাদের অন্তর্নিহিত একত্বভূমির উপরই জোর দিয়েছেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। বর্তমান পুরুষোত্তমে অটুট আনতি নিয়ে এই মহামিলনের সড়ক নির্মাণই ছিল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের স্বপ্ন ও সাধনা। একেরই নানাভাবে উপলব্ধিকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত সেই পরম একেরই যুগোপযোগী বিশ্লেষণ এবং সমন্বয় হয়ে চলেছে। তা ছাড়া যুগবিবর্তনের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণই শেষ অবতরণ নয়। তিনি নিজেই বলেছেন, "পার্ষদদের সব জ্ঞান দিলাম না—আমাকে আবার আসতে হবে।" লেখক নিজেও এ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন আলোচ্য পুস্তকের ৪৯ পৃষ্ঠায় — "Those who are in the inner circle of my devotees are not granted ultimate liberation from life, for I shall assume a body again in the North Westen corner." (পৃ: 49)

এটাই তো বিধিসম্মত ধারাবাহিকতা। তা হলে 'সর্বশ্রেষ্ঠ' বলে তাঁকে সীমায়িত করার উপায় কোথায়? — তিনি অনন্ত তাঁর বিবর্তনের ধারাও অনন্ত ও অশেষ। বহুলাংশে প্রশংসিত এবং অভিনন্দিত এমনতর একটি পুস্তকের কাছে উল্লিখিত প্রসঙ্গগুলির অবতারণার প্রত্যাশাই হল আলোচ্য মূল্যায়নের সবিনয় নিবেদন।

**Sri Ramkrishna and His New Philosophy – H. N. Sarkar**/Sri Ramkrishna Kendra, Jagacha, Howrah – 60.00

চলচ্চিত্র সমালোচনা

# মৃণাল সেনের নতুন ভুবন

## অধৃষ্য কুমার

আশি ছুঁই ছুঁই মৃণাল সেন নিজের নির্বাসন নিজেই ভেঙে বেরিয়ে পড়েছেন নতুন ভুবনের খোঁজে। 'অন্তরীণ'-এর পর বছর সাতেকের দীর্ঘ নীরবতা। মৃণাল সেন নিজেই ইতিমধ্যে বহুবার জানিয়েছেন কারগিল যুদ্ধের সময় 'স্টার নিউজের' রাজদীপ সারদেশাইয়ের যুদ্ধ সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তরে পাকিস্তানের জনৈক সবজি বিক্রেতার সহজ সরল এক শব্দের উত্তর 'লোকসান' — যুদ্ধ মানে? 'লোকসান'— এক শব্দের এই ভয়ঙ্কর উচ্চারণে কেঁপে উঠেছিল তাঁর বুকের ভেতরটা। শুনতে পেয়েছিলেন সীমানার এপারে আমাদের দেশেও কোটি কোটি সাধারণ মানুষের একটাই উচ্চারণ 'লোকসান।'

প্রতিবাদের দশকের পরিচালক টানা প্রায় দু'-দশক ব্যস্ত ছিলেন 'এনিমি উইথ্ইন' খুঁজতে। ভুবন সোমের সেই অবিস্মরণীয় দোলনায় দোল খেতে খেতে অথবা শেখর চ্যাটার্জির অননুকরণীয় আঃ হুঃ হুঃ ডাক আর সৌরাষ্ট্রের সেই দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের মধ্যে ষাট দশকের শেষ নাগাদ আমাদের চোখের সামনে ঘটল ভারতীয় সিনেমার সাবালকত্ব প্রাপ্তি। 'ভুবন সোম'-এর হাত ধরে প্রচলিত সমস্ত ব্যকরণ ভেঙে চুরমার করে ভারতীয় সিনেমার আধুনিক হওয়ার চোখ ধাঁধানো অবাক কাণ্ডের রেশ কাটতে, না কাটতেই পরপর 'ইন্টারভিউ', 'কলকাতা একাত্তর' আর 'পদাতিক' মৃণাল সেনকে প্রায় সারা পৃথিবীতেই পরিচিত করল প্রতিবাদের দশকের চলচ্চিত্র-নির্মাতা হিসাবে। সত্তর দশকের বোমা-বন্দুক-জেল-বন্দিমুক্তি-শহিদ স্মরণ পেরিয়েই আবার নতুন মৃণাল সেন—সম্ভবত বাইরের শত্রু খুঁজে খুঁজে শ্রান্ত প্রাজ্ঞ মন প্রায় ঘোষণা করেই বলে ফেললেন এবার 'এনিমি উইথইন' খুঁজবে তাঁর শিল্পসৃষ্টি। বাইরের নয় আমাদের ভেতরে, পরিবারের ভেতরে, নিজের ভেতরে শত্রু খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল মৃণাল সেনের অর্ন্তমুখী ক্যামেরা। 'একদিন-প্রতিদিন' দিয়ে শুরু করে একের পর এক তৈরি হল অবিস্মরণীয় সব ছবি—'আকালের সন্ধানে', 'খাণ্ডাহার' 'খারিজ' অথবা 'একদিন অচানক'। দীর্ঘ বছর পনরো ভেতরের শত্রু খোঁজার চোরাবালিতে পথ হাতড়ে শেষমেশ 'অন্তরীণ'-এ এসে নিজেকেই অন্তরীণ করে রাখলেন দীর্ঘ সময়।

নতুন শতাব্দীতে পাকিস্তানের সবজি বিক্রেতার এক মর্মভেদী উচ্চারণ অবলম্বন করে মৃণাল সেন বেরিয়েছেন এক নতুন ভুবনের খোঁজে। এই খোঁজ, সত্যিকার অর্থেই তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাণের চালচিত্রে এনেছে নতুন মাত্রা। সম্ভবত এই প্রথম মুসলিম কৃষক পরিবার এবং তাদের গ্রাম-সমাজ নিয়ে বাংলায় তৈরি হল সম্পূর্ণ একটা ভাল ছবি। মৃণাল সেনের ছবিতে গ্রামের মানুষ এবং গ্রাম বাংলা এর আগেও যে আসেনি তা নয়, তবে কখনওই তা গ্রামের শুধুমাত্র কৃষক পরিবার বা গ্রাম সমাজ কেন্দ্রিক ছবি নয়। 'বাইশে শ্রাবণে'র গ্রাম আমরা দেখেছি যেখানে মূল চরিত্র কৃষিজীবী নয়, ট্রেনে হকারি করেই তার জীবন চলে। গ্রামীণ কৃষকের ভয়ঙ্কর দারিদ্র এবং গ্রাম-সমাজের ক্ষতবিক্ষত ছবি আমরা পেয়েছি 'ওকাউরি' কথা এবং 'মাটির মনিষ' ছবিতেও। বাংলার গ্রাম নয়—অন্ধ্র অথবা ওড়িশার গ্রামীণ বাস্তবতার নিষ্ঠুর ছবি সে দুটি। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে শহুরে মধ্যবিত্ত সমাজের দৈনন্দিন ছোটখাটো ঘটনার টানাপোড়েন নিয়ে বেশ কয়েকটি দুর্দান্ত ছবি করার পর বছর সাতেকের নীরবতা ভেঙে গ্রাম বাংলায় নতুন সত্যের খোঁজে বেরিয়ে পড়া শুধু অভিনব নয় রীতিমত দুঃসাহসিক। আশির দোরগোড়ায় এই দুঃসাহস রীতিমত তাজ্জব বানিয়েছে আমাদের। সম্ভবত কিছুটা দুঃসাহসের নেশায় বুঁদ হয়েই মৃণাল সেন বেরিয়ে পড়েছেন গ্রাম বাংলার মানুষের দৈনন্দিন 'বেঁচে থাকার ম্যাজিক' খুঁজতে।

ছবির শুরু সুভাষ নন্দীর এক স্টিল ফোটো দিয়ে। পর্দার মাঝখানে সাদা কালোয় খালি গায়ে ইজের পরা বছর সাত-আটের এক কিশোরীর ছবি কোলে তার বছর দুয়েকের আর একটি বাচ্চা, অনাহার ক্লীষ্ট শরীর, ক্ষুধায় ক্লান্ত মুখ-মণ্ডল, নির্বাক-বিহ্বল চোখ। আবহে পরপর বিস্ফোরণের শব্দ, কাট করে পর্দায় ভেসে ওঠে কালোর ওপর জ্বলজ্বলে সাদা অক্ষর—পৃথিবী ভাঙছে, পুড়ছে, ছিন্নভিন্ন হচ্ছে তবুও মানুষ বেঁচেবর্তে থাকে মমত্বে, ভালবাসায় সহমর্মিতায়।

সাদা-কালোয় কিশোরীর ছবি আর পর্দায় পরিচালকের কয়েক লাইনের ঘোষণায় আমরা জেনে যাই ম্যাজিকের খোঁজে বেরিয়ে পড়া পরিচালকের পা স্থির রয়েছে চারপাশের অস্থির-ভয়ঙ্কর সময়ের মাটিতে। পরের দৃশ্যেই ভয়ানক সময়ের মধ্যেও বহমান জীবনের দিগন্ত বিস্তৃত ছবি। পর্দা জুড়ে গ্রামবাংলার গন্ধ। মাঠ-মাঠ আর মাঠ—আলপথ ধরে এগিয়ে আসছে মোটর





সাইকেলের কর্কশ আওয়াজ। আমাদের চোখের সামনে সাঁ করে বেরিয়ে যায় মোটর-সাইকেল তার আরোহীকে নিয়ে। ক্যামেরা চলে আসে কাছেই মাঠে জল ছাঁচার কাজে ব্যস্ত পিতা-পুত্রের একেবারে সামনে। ছেলের বিস্ময়ের উত্তরে বাবা জানায় মোটর সাইকেল আরোহী তারই খালাতো ভাই নূর, নতুন কিনেছে বাহনটি। অঞ্জন দত্তর নেপথ্য ভাষণে পরিচালক আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন চরিত্রদের সঙ্গে - কাহিনির মধ্যে কখন দর্শক ঢুকে পড়েছেন জানতেও পারি না আমরা। শুরু থেকে শেষ সোজাসুজি গল্প বলার লোক কখনওই নন মৃণাল সেন। কোনও ছবিতেই প্রায় তা করেননি সম্ভবত। একমাত্র খাণ্ডাহার ছাড়া। এই বোধ হয় প্রথম মৃণাল সেনের ছবির শেষে আমাদের মনে গেঁথে যায় এক পরিবারের সম্পর্কের টানা পোড়েনের গল্প। আকাশ ছোঁয়া মাঠের প্রথম দৃশ্যের পর একে একে ছোট ছোট দৃশ্য ও অসাধারণ গার্হস্থ্য অথচ মার্জিত সংলাপে বোনা হতে থাকে দুটি খালাতো ভাইয়ের সংসারের গল্প। মোটর সাইকেল আরোহী নূর ছিল গ্রামের এক দরিদ্র কাঠমিস্ত্রী। বিয়ে হয়েছিল দাদার উদ্যোগে সখিনার সঙ্গে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সেই দাদার প্ররোচনাতেই নূর তালাক দেয় সখিনাকে। নূরেরই খালাতো ভাই মেহের ভালবেসে বিয়ে করে সখিনাকে। নূরকে তার দাদাই আবার বিয়ে দেয় কামেলার সঙ্গে। সখিনা-মেহের এর প্রথম সন্তান জন্মানোর কয়েক বছর পরই নূর চলে যায় আরব দেশে ভাগ্যের সন্ধানে টাকা রোজগারে। বেশ কয়েক বছর বাদে নূর ফিরে এসেছে দেশে। সঙ্গে এনেছে নিজের উপার্জন করা অনেক নগদ টাকা—কিনেছে মোটর সাইকেল। বাড়ি ঘরে ছাপ পড়েছে স্বচ্ছলতার। মেহের দিন মজুরি করে, কখনও ইঁটভাটায় কখনও অন্যের জমিতে। সখিনাকে মেহের বিয়ে করলেও, সখিনার ওপর নূরের সম্ভ্রম মেশানো দুর্বলতা তার অজানা নয়। নূরের বউ সখিনা অনুর্বরা থাকলেও মেহেরের স্ত্রী হয়ে সে ইতিমধ্যেই তিন সন্তানের জননী, বড় মেয়ে সায়রা, ছেলে সাজু, কোলেরটি ছেলে এ সব নিয়ে নূর এবং মেহেরের সম্পর্কে কোনও তিক্ততার গন্ধও আমরা পাই না। সখিনার শেষ সম্বল এক সোনার নথ মাঝেমাঝে সেটা বার করে পড়ার সময় তার চোখ উদাস হয়ে যায়। নথটা নূরের কাছ থেকে পাওয়া। তালাকের সময় স্বামীর দেওয়া সমস্ত গয়না বরকে ফেরত দিতে হয় এটাই নিয়ম। কিন্তু এক অনুচ্চারিত ভালবাসার কারণে নূর পঞ্চায়েতের সম্পত্তি ফেরতের সভায় নথটার কথা উল্লেখ করে না। নূরের স্মৃতি, সোনার নথ রয়ে যায় সখিনারই কাছ থেকে। চারদিকে ধার দেনা আর রহমত চাচার কাছে বাঁধা পড়া জমি উদ্ধার করার জন্য সখিনা একদিন মেহেরকে দেয় সেই সযত্নে রক্ষিত সোনার নথ। বলে, 'বন্ধক রাখবে কিন্তু বেচবে না।' মেহের সম্ভবত না জেনেই সেই নথ নিয়ে হাজির হয় তার নূর ভাইয়ের কাছে। যা আশা করেছিল তার থেকেও বেশি টাকা পায় খালাতো ভাইয়ের কাছ থেকে। নথটা ফেরত দিতে গিয়ে নূর বলে, 'ঠিক আছে এটা থাকুক আপাতত আমার কাছে'। নতুন রঙ করা সাজানো গোছানো বাড়িতে নূর পাড়া প্রতিবেশীদের দাওয়াতে আমন্ত্রণ জানায়। বাড়ি এসে নেমতন্ন করে যায় খালাতো ভাই মেহেরকে - সন্তর্পণে নথটাও ফেরত দিয়ে যায়। সঙ্গে মেহের-সখিনার ছেলে সাজুকে নিজের বাড়ি নিয়ে যায় বলে 'কাল তোরা আসছিস্ই—ও আজকেই চলুক আমার সঙ্গে'। ছবি শেষ হয় নূর—এর বাড়ির উঠোনে পড়ন্ত বেলায় আধো আলোয়, সন্তর্পণে নতুন কেনা হাওয়াই চপ্পল ঠিক করতে করতে ঢোকে সখিনা, সঙ্গে ফর্সা পায়জামা পাঞ্জাবি পরা মেহের আর মেয়ে সাজু। হঠাৎ কোলের এক বছরের বাচ্চাটা কেঁদে ওঠে, নিস্তব্ধ উঠোনে। সখিনা সামলাতে পারে না। ওদিকে নূরের বাড়ির ভেতরের উঠোনে তখনও নিমন্ত্রিত অতিথিদের হাসির রেশ ভেসে আসে হঠাৎ হঠাৎ। মা-বাবার খোঁজে অস্থির হয়ে পড়া সাজু হঠাৎ বাবা-মা-বোন কে দেখে হাত বাড়ায়। সাজুর অন্য হাত ছুঁয়ে থাকে কামেলা আর নূরকে। দৃশ্য—ফ্রিজ। আবহে ফিরে আসে "মম চিত্তে .... তা-তা থৈ থৈ"—ধীর লয়ে। আগের কয়েকটি দৃশ্যের ছোট ছোট টুকরো ভেসে আসে গানের মাঝে মাঝে। ছবি শেষ হয়।

একেবারে প্রথমেই বলা যেতে পারে সময়ের নিরিখে এই ছবির মতো প্রাসঙ্গিক বিষয় আর অন্য কিছুই হতে পারে না। ভাবতে সত্যি অবাক লাগে—অন্তরীণ থেকে একেবারে লাফিয়ে গ্রামবাংলার মাঠে-মাঠে, আলে-আলে ক্যামেরা ঘোরানোর দম কোথা থেকে পেলেন মৃণাল সেন। আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে গত পনেরো বছরে আমাদের দেশে যারা বড় হয়ে উঠেছে, খবরের কাগজে আর টেলিভিশনের পর্দায় তাদের চোখের সামনে বাবরি মসজিদ ভাঙা আর রামমন্দির গড়া ছাড়া আর কোনও অ্যাজেন্ডাই নেই। দারিদ্র-বেকারত্ব, পানীয় জলের অভাব, অস্বাস্থ্য, কুসংস্কার, সতীদাহ, বউ পোড়ানো সমস্ত কিছু ছাপিয়ে সামনে এসেছে বারেবারে সেই একই বিষয় মন্দির-মসজিদ অথবা মসজিদ-মন্দির। মসজিদ ধ্বংস আর মন্দির গড়ার রণহুঙ্কারের হাত ধরে এসেছে পোখরান, এসেছে কারগিল—সঙ্গে বিরাট কালো অক্ষরের 'লোকসান'। এই ধর্মোম্মাদ-যুদ্ধ জিগিরে দেশকে সামিল করতে প্রথমেই দরকার দেশের মধ্যেই সুস্পষ্ট ভেদ রেখা। সুকৌশলে এই দীর্ঘ সময় জুড়ে তৈরি করা হয়েছে অলঙ্ঘনীয় পাঁচিল। সমাজের মধ্যে, গ্রামেগঞ্জে, রাস্তাঘাটে, বাজারে হাটে, ট্রেনে বাসে খবরের কাগজে-টেলিভিশনে। পাঁচিলের এপারে 'আমরা' ওপারে 'ওরা'। ওরা কারা? ওরা সন্ত্রাসবাদী, ওরা খুনি, ওরা দেশদ্রোহী, ওরা পাকিস্তানের দালাল ওরা মুসলমান—আমরা হিন্দু। আমরা কবিতা লিখি, ভাল সিনেমা দেখি, গ্রুপ

থিয়েটার করি, মিছিল করি তবুও আমাদের চামড়ায় চিমটি কাটলেই জানা যায় আমরা হিন্দু। ওরা রাজাবাজার খালের ধারে, বেলেঘাটায় আস্তাকুড়ে, অথবা মেটেবুরুজের দর্জিপাড়ায় যেখানেই থাকুক-খুঁটে খুঁটে বেঁচে থাকলেও ওরা-ওরাই। ওদের তাড়াতে হবে, সীমানা পার করে। যুদ্ধ করতে হবে—হাজার হাজার কোটি টাকার অস্ত্র কিনতে হবে, বেচার জন্য ওৎ পেতে বসে আছে সাহেব মহাজনরা। এই 'ওরা' আর 'আমরা'র পাঁচিল তৈরির এক কোমর রক্ত-কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে 'আমার ভুবন' যেন এক উজ্জ্বল উদ্ধার। ওদের নাম মেহের, নূর, সখিনা সাজু-সায়রা-কামেলা হলেও ওদের বউ বোরখা পাড়ে না তো! ওরাও আমাদেরই গ্রামের একই পাড়ার অথবা পাশের পাড়ার—সেই তো একই ডুরে ডুরে লাল পাড় শাড়ি, নিকোনো উঠান, সেই একই অস্বচ্ছ হারিকেনের কাঁচে উজ্জ্বল হয়ে উঠে সখিনার চোখ। সখিনার নথ, মেহের সখিনার খুনসুটি, চাঁদের আলোয় সখিনাকে কোলে তুলে নেওয়া—সব মিলিয়ে তৈরি হয় ওদের "বেঁচে থাকার ম্যাজিক" যে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে মেহেরের মাঝে মাঝে অভিমান ক্ষোভ হলেও—খাটতে কুঁড়েমি নেই। কখনও মাঠে, কখনও ইঁটভাঁটায় কখনও রেডিও, টিভির দোকানে মেহেরকে আমরা কখন যে ভালবেসে ফেলেছি বুঝতেও পারি না। মেহেরকে ভালবাসলে যে নূরকে বাঁকা চোখে দেখতেই হবে এই অনিবার্য সিদ্ধান্ত, পরিচালক দর্শকের চেতনায় কোন ম্যাজিকে কখন যে পাল্টে দিলেন—আমরা তা বুঝতেই পারলাম না। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে মোটর সাইকেল চালানোর ভঙ্গিতে সাজুর বোঁ বোঁ আওয়াজ অথবা হাওয়াই চপ্পল কিনে দেওয়ার আবদার জানিয়ে সখিনার অর্নিবচনীয় দৃষ্টি নিক্ষেপ। ছোট ছোট অজস্র ঘটনা আর আটপৌরে অথচ প্রণলভ নয় এমন সংলাপে মৃণাল সেন গড়ে তোলেন নতুন ভুবন যেখানে ওরা আর আমাদের মধ্যেকার সযত্নে গড়ে তোলা পাঁচিল কোন যাদু-মন্ত্রে যেন হাওয়া-এ ভুবন সখিনার ভুবন এ ভুবন মৃণাল সেনের নতুন ভুবন। ২০০২ সালের শেষ প্রান্তে এসে নিঃসন্দেহে বলা যায় নরেন্দ্র মোদি-আদবানি-বাজপেয়ীদের ভয়ঙ্কর, নরখাদক সময়ের দিকে পিঠ ফিরিয়ে গ্রাম বাংলার শ্রমজীবী মানুষের দৈনন্দিন বেঁচে থাকার এই ম্যাজিকের চলচ্চিত্রায়ণ নিশ্চিত ভাবেই এক প্রাসঙ্গিক এবং স্থির নিশ্চিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। ফ্যাসিস্ত-নরখাদক 'ওরা-আমরা' দর্শনের মুখোমুখী বর্ষীয়ান পরিচালকের এক কাব্যিক প্রতিবাদ।

গ্রাম বাংলার শ্রমজীবী মানুষের প্রতি এত পরিমার্জিত সম্ভ্রম এর আগে কোনও ছবিতে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। মেহেরের শ্রম বিক্রির বিচিত্র রূপ—কখনও ইঁটভাঁটায় কখনও পরের জমিতে, কখনও মাছের জাল হাতে ধরা পড়ে স্বচ্ছন্দ চিত্রনাট্যের প্রবহমানতায়। গত আড়াই দশকে গ্রাম-বাংলার সমাজ অর্থনীতির পরিবর্তিত ছবি অনায়াসে উঠে আসে ছোট ছোট দৃশ্যে আর গার্হস্থ্য সংলাপে। মাটি কাটতে কাটতে ইঁটভাঁটার শ্রমিকদের কথোপকথনে ধরা পড়ে মেসিনে জল তোলা আর মেসিনে লাঙল দেওয়ার সঙ্গেও প্রয়োজন গতর। গতর—মানুষের, মেহেরের, দু'হাতের কঠোর শ্রম ফলাতে পারে সোনা যদি মেসিন সঙ্গে থাকে। মেহেরের আফশোস, 'বাবা দাদারাও যদি এ সব মেসিন পত্র দেখে যেতে পারত' আমাদের দীর্ঘশ্বাসেও মিশে যায়। সাজু স্কুলে যায়, সায়রাও যেত, আপাতত ছোট ভাইকে সামলায়—মা সখিনা চায় রেডিও, হাওয়াই চপ্পল, একটা ভাল শাড়ি। নিপাট সাদামাঠা গ্রাম বাংলার চলচ্চিত্র যেখানে ওরা-আমরা ভেদের চিহ্ন মাত্র নেই। মৃণাল সেন ভুবন সোম-এ সুহাসিনী মুলে'র সেই অবিস্মরণীয় দোলনা-দৃশ্যত্র অনেক দিন পর আবার তৈরি করেছেন অতল-গভীর কাব্যময় এক দৃশ্য। নথ্ বন্ধক রাখা টাকা দিয়ে রেডিও কিনে কাঁধে-গামছা নিয়ে মেহের ঢোকে ঘরের উঠোনে—নাচের ভঙ্গিতে এক হাতে ধরা ট্রান্সজিস্টার রেডিও। রেডিওতে শ্রীকান্ত আচার্য গলায় "মম-চিত্তে—তা-তা থৈ থৈ" এর তালে তালে মেহেরের ঝোলা থেকে একে একে সায়রার ফ্রক, সাজুর জামা আর সখিনার শাড়ি বেরিয়ে হাওয়ায় উড়ে যায়—মনে হয় যেন আমাদের শহুরে বিচার বোধ 'খেত মজুরের ঘরে রবীন্দ্রসঙ্গীত আবার' ধরনের নাক সিঁটকানোকে উদ্বেল আনন্দে মহাকাশের নীলে মিলিয়ে দিচ্ছে মেহের শাড়ি-জামা-ফ্রকের সঙ্গে সঙ্গে। আমাদের গলা ধরে আসে চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে।

কতকগুলি বিশেষ দৃশ্য এত কাব্যময় অথচ কঠোর কঠিন বাস্তব, ভাবতে অবাক লাগে পরিচালক কীভাবে নির্মাণ করলেন এই অনবদ্য অথচ অনায়াস চলচ্চিত্র ভাষা। যেখানে ভাঙা বাড়িতে সখিনার ইঁটের ঝুড়ি মাথায় তুলে দিতে হাত বাড়িয়ে দেয় নূর সেখানে নূর এবং সখিনার কয়েক মুহূর্তের দৃষ্টি বিনিময়ে কোনও প্রগলভতা নেই অথচ কী আন্তরিক সম্ভ্রম আর ভালবাসা। রেডিও-টিভির দোকানের দৃশ্যে—মেহের-রহমতের লুকোচুরি খেলা সঙ্গে টিভির পর্দায় চ্যাপলিন-পুলিশের বহু আলোচিত লুকোচুরির দৃশ্য। মেহেরের মধ্যে আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করি চ্যাপলিনকে। অথবা অন্য এক দৃশ্যে দিনের বেলা কাজ-কর্ম ছেড়ে হঠাৎ এসে ঘরের দাওয়ায় শুয়ে পড়ে মেহেরের সংলাপ, 'যাব-যাব হ্যাঁ আরব দেশে যাব, টাকা করব, টাকা'—শ্রমজীবী মেহেরের অনোন্যপায় সারল্য আমাদের মথিত করে রাখে। সর্বোপরি সখিনার জ্বলন্ত স্পর্ধা-অথচ ঘৃণাহীন চোখে ঘোষণা, 'আমার মান নেই? তোমার মান নেই? আমাদের মান ইজ্জত নেই?' যখন তার স্বামী মেহের টাকা ফেরত না দিয়েও ফিরিয়ে আনে বন্ধক রাখা নথ, তার আগের স্বামী নূরের কাছ থেকে।

সব ক'জন অভিনেতা অভিনেত্রী বিশেষত তিনটি মূল চরিত্র, মেহের, সখিনা, আর নূর-এর ভূমিকায় কৌশিক সেন, নন্দিতা



দাস এবং শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় প্রায় নিখুঁত। কৌশিক নিশ্চিত ভাবেই 'আমার ভুবন'এর মেহের হয়ে আমাদের মনে গেঁথে থাকবেন বহু দিন। নন্দিতার ভুবনভোলানো হাসি আর আত্মসম্মানে দৃঢ় অথচ বেদনার্ত দৃষ্টি আমরা বাংলা ছবিতে কি এর আগে পেয়েছি কখনও? শাশ্বত নিশ্চিত ভাবেই তাঁর টেলিফিল্ম-ইমেজ ভেঙে ফেলে নিজেকে একজন বড় মাপের অভিনেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন এ ছবিতে। অভিজ্ঞ বিভাস চক্রবর্তী এবং অরুণ মুখোপাধ্যায় ছাড়াও কামেলার ভূমিকায় শ্রীজাতা সকলকেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক-জীবন্ত রক্তমাংসের চরিত্র মনে হয়।

টাকি হাসনাবাদের ইচ্ছামতীর পারের তালপুকুর গ্রামকে প্রায় জলজ্যান্ত তুলে এনে টালিগঞ্জের স্টুডিওতে বসিয়েছেন গৌতম বসু। গৌতম যদিও শিল্পনির্দেশক হিসাবে এর আগেও মৃণাল সেনের সঙ্গে কাজ করেছেন তবু এ ছবিতে ইনডোর সেট এবং আউটডোরের দৃশ্যের মাঝে কোথাওই প্রায় আমাদের হোঁচট খেতে হয় না তার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে গৌতমের। দেবজ্যোতি মিশ্রর আবহ সঙ্গীত এবং রবীন্দ্রনাথের গানকে নতুন প্রেক্ষিতে নতুন ঝঙ্কারে গাওয়ার পরিকল্পনাও মৃণাল সেনের নতুন ভুবন নির্মাণের অন্যতম বিশেষ উপকরণ। অভীক মুখোপাধ্যায়ের ক্যামেরার কাজ অসামান্য। অভীক, সন্তবত এই প্রথম মৃণাল সেনের সঙ্গে কাজ করলেন। মৃন্ময় নন্দী মৃণাল সেনের সঙ্গে বেশ কিছু দিন সম্পাদনার কাজ করছেন। রেডিও-টিভির দোকানের দৃশ্য, অথবা মেহের-সখিনার খুনসুটির দৃশ্য থেকে শুরু করে জলের প্লাস পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ দৃশ্যে মম-চিত্তে নিতি নৃত্যের তালে তালে একে একে ফিরে আসে মেহের নূর সখিনা সকলেই—পুরো দৃশ্যে মৃন্ময় নন্দীর মুনশিয়ানার ছাপ স্পষ্ট। অভীক মুখোপাধ্যায়-এর ক্যামেরা প্রথম থেকে শেষ অবধি পরিচালকের চাওয়াকে পূরণ করেছেন। বিস্তীর্ণ মাঠের দৃশ্য, ইঁটভাটার দৃশ্য অথবা সখিনার নথ পড়া এবং খুলে ফেলার দৃশ্য থেকে শুরু করে এঁটো বাসন পত্র হাতে সায়রার পেছন পেছন কুকুরের যাওয়া সর্বত্রই অভীকের ক্যামেরা মৃণাল সেনের নতুন ভুবনের অভিসারী। আফসার আহমেদের 'ধানজ্যোৎস্না' যদিও 'আমার ভুবনের' 'কাহিনিসূত্র' মাত্র তবু এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় গ্রামবাংলার মুসলিম কৃষক সমাজকে তাদের রক্তমাংসের অস্তিত্ব নিয়ে আফসারের থেকে ভাল করে আর কোনও বাঙালি কথা সাহিত্যিক জানেন কি-না সন্দেহ। সখিনার চরিত্র এবং সখিনা মেহের ও নূরের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতা, তার টানাপোড়েন 'ধানজ্যোৎস্নার' অন্যতম প্রধান সম্পদ। আমার ভুবনেও তাই জ্যোৎস্না মাখানো ধানের মিষ্টি গন্ধ সর্বব্যাপ্ত।

পাকিস্তানের সবজি বিক্রেতার এক শব্দের নিকষকালো উচ্চারণের বিনির্মাণ কীভাবে সখিনা-মেহেরের জীবনের "বেচে থাকার উজ্জ্বল ম্যাজিকে" পুনর্নির্মিত হয়, সে গবেষণা আপাতত চলচ্চিত্রের সমাজতত্ত্ব গবেষকদের জন্য তোলা থাকুক। আমাদের মতো মেঠো-দর্শকের কাছে "আমার ভুবন" যেন মৃণাল সেনের হাত ধরে নতুন বিশ্বাসের খোঁজ করার দম যোগায়। চারপাশের এই সর্বগ্রাসী বিশ্বাসহীনতা আর আদর্শবাদের শ্মশানযাত্রার কালে গ্রাম বাংলার আটপৌরে বাস্তবতার দিকে ক্যামেরা ঘুরিয়ে ধরলেই শুধু হয় না, সখিনা-মেহের-নূর-সাজু-সায়রাদের দৈনন্দিন শ্রমঘন জীবনযাপনের মাঝে মানবিকতার মূল সুরটা খুঁজে পেতে হয়। তার জন্য চাই শ্রমজীবী মানুষের প্রতি নিষ্কলঙ্ক ভালবাসা আর সম্মানবোধ। যে ভালবাসা নিম্নবর্গকে শুধুমাত্র ইতিহাসের উপাদান হিসাবে অথবা ক্ষমতায় পৌঁছনোর পাটাতন হিসাবে দেখে না। সম্ভবত এখানেই মৃণাল সেন অনন্য। মুসলমান বাঙালি গরিব কৃষকের সমাজকে ২০০২ সালে তার রক্ত-মাংস, গতিপ্রকৃতি, পঞ্চায়েত-বিডিও, মেশিন-লাঙল-ইটভাটা — এই বিস্তৃত পরিসরে চলচ্চিত্রায়িত করা একেবারেই অসম্ভব ছিল, যদি না মৃণাল সেনের সেই ইতিহাসবোধ থাকত, যা দিয়ে চাক্ষুষ করা যায় "হাসি-কান্না-হাঁরা পান্না দোলে ভালে" "দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ"। এক পৃথিবী-ঘৃণার দিকে পিঠ ফিরিয়ে মেহের-সখিনা-নূর বেঁচে আছে মমত্বে-ভালবাসায়-সহমর্মিতায়। ওদের বেঁচে থাকার ম্যাজিকে আমরাও যেন জীবনের নতুন মানে খুঁজে পেলাম।

এই নিবন্ধ লেখার শেষে এসে এখনই জানা গেল 'কায়রো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র' উৎসবে 'আমার ভুবন'-এর জন্য মৃণাল সেন শ্রেষ্ঠ পরিচালক এবং নন্দিতা দাস শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। আশা করা যায় 'এনিমি উইথ্‌ইন' এর চক্রবন্ধ আর্বত থেকে বেরিয়ে তাঁর নতুন ভুবনে অনতি বিলম্বে আমরা পাব আরও একটা তাজা ছবি আরও এক ঝলক বুক ভরা ঠাণ্ডা বাতাস।

নাট্যসমালোচনা

# একালের "আখেটিক পালা"

## তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্ভবত বছর তিরিশ আগে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমবাংলার উত্তাল সময়তেই লিখেছিলেন এমন ক'টা লাইন : "ফুরায় না ফুল্লরার বারমাস্যা/ আর শূন্য হাতে কালকেতুর ফিরে আসা/ফুরায় না দু'টি অসহায় মানুষের/ক্ষুধায় জ্বলতে থাকা।/ ... সারারাত তবু তারা স্বপ্ন দেখে/মাঠভর্তি ধানের আর বুকভর্তি ভালবাসার/আর স্বপ্ন দেখতে দেখতে কালকেতু রাজা হয়।/ফুল্লরার মুখে আবির লাগে।" আর তখন থেকেই বোধহয় সমাজকে ইতিহাসের নিচুতলা থেকে দেখার একটা প্রবণতা শুরু হয়েছিল সাহিত্যের শাখাপ্রশাখায়। বাংলা নাট্যচর্চাও সেই আওতার বাইরে থাকেনি। মধ্যযুগ নতুন প্রতীকী আখরে উঠে আসছিল নাটকের মধ্যে। পুরনো লোকনাটকের ভাষা ধরা দিচ্ছিল নাট্যকলার প্রয়োগে। নতুন শতাব্দীর এই দু'তিনবছরে সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ভাবনায় উত্তর-আধুনিকতার বাতাবরণে যখন নিম্নবর্গীয় চেতনার ব্যবহার তর্কে-বিতর্কে, মাজাঘষায় আরও শাণিত তখন "বহুরূপী" নাট্য সংস্থা তাঁদের সাম্প্রতিক প্রযোজনা "ফুল্লকেতুর পালা"তে একটি মধ্যযুগীয় প্রচলিত উপাখ্যানকে ইতিহাসের সেই নিম্নভূমি থেকেই নতুন করে দেখাতে চেয়েছেন।

নাট্যকলার যেহেতু দুটো অংশ প্রধান — এক, নাটক আর দুই, অভিনয়রীতি; তাই প্রথমেই আসা যাক নাটকের আলোচনায়। "ফুল্লকেতুর পালা"-র রচয়িতা রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী এবং নির্দেশক কুমার রায়। নাটকের বিক্রীত লিফলেটে বলা হয়েছে পালার মূল অবলম্বন মধ্যযুগের বাংলা লোকপুরাণের একটি গল্প। তবে খোলসা করে বলতে গেলে, এ নাটকের অনেক সংলাপ পর্যন্ত ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলের 'আখেটিক খণ্ড' থেকে প্রায় হুবহু বসানো। তবে অমিলের পাল্লাটাও বেশ ভারি। আসলে এ যুগের নাট্যকার একেবারে শিকড় ধরে টান দিয়েছেন তাই এ পালায় ব্যাধ কালকেতু-ফুল্লরা স্বর্গের নীলাম্বর-ছায়া নয়। এরা 'খাঁটি' মানবসন্তান। পালা অন্তে স্বর্গে ফেরার দায় এদের নেই। এরা ধরাধামে 'সাম্যের স্বর্গ' গড়ার স্বপ্ন দেখায়।

নাটকের নান্দীমুখ হয় শিবপার্বতীর ঝগড়া দিয়ে। তাঁরাই প্রকারান্তরে নাটকের সূত্রধার। গরিবের সংসারে শিবকর্তার নোলাটি সরেস কিন্তু গৃহিণী সখেদে জানান- "প্রথমে যে দিব পাতে তাই ঘরে নাই।" কবি মুকুন্দ অবশ্য এ সময়ে শিবকে ত্রিশূলটি বন্ধক দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের নতুন পালাকার শিবকে ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে চাষ করে অন্ন যোগানোর নিদান দেন। দেবতা যখন ভুমিতে নামেন তখন মানুষের অন্যথা কি হয়? তাই গোধাসনা পর্ণশবরী দেবী অভয়া আরণ্যকুলকে রক্ষা করার জন্য আখেটিক (ব্যাধ) কালুবীরকে উড়িষ্যার কোল ঘেঁষে মেদিনীপুরের সীমান্তবর্তী কাঁসাই তীরে বন কেটে বসত 'গুজার' রাজ্যের রাজা করে দিলেন। (মধ্যযুগের কাব্যে অবশ্য এত নিখুঁত ভৌগোলিক অভিনিবেশ ধরা পড়েনি।) আর দেবী বলে দিলেন, হত্যার জীবিকা ছেড়ে কৃষিকাজ করে প্রজাপালন করতে। ব্যাস, দেবীর কাজ শেষ। দেবী গেলেন ঘুমোতে। কিন্তু রাজা-রানি হয়ে কালকেতু আর ফুল্লরা পড়ল দুই ভিন্ন ধরনের আতান্তরে।

কলিঙ্গ থেকে উৎখাত হওয়া চাষি বুলান মন্ডলের সাহায্যে কালকেতু ব্যাধগোষ্ঠীকে কৃষিজীবী করে তুলল। পুরনো সঙ্গী ন্যাড়া, শিবে, আতর আলি এরাই হল নতুন রাজার সেনাপতি, মন্ত্রী, সভাগায়ক। যদিও তারা মাঝেমধ্যেই ভুল করে পুরনো অভ্যাসে রাজাকে 'তুই-তোকারি' করে ফেলে। রাজা কালকেতুও আর নাচের আসরে বান্ধবী সুখদার কণ্ঠলগ্ন হতে পারে না। তার রাজ্যে গোলাভরা ধান আছে কিন্তু অস্ত্রাগার বা কারাগার কোনওটাই নেই। সেনাপতির তরোয়ালটাও আধখানা। স্বভাবতই সামন্তপ্রভু কলিঙ্গরাজ ব্যাধনন্দনের 'রাজা' হওয়াটা ভাল চোখে দেখে না। ইন্ধন জোগায় মধ্যসত্ত্বভোগী ভাঁড়ু দত্ত। আসলে দেবীর বরে কি সত্যিই 'রাজা' হওয়া যায়? রাজা হতে হয় লোকমান্যতায়। পিপীলিকার ডানা ছাঁটার তরে কলিঙ্গরাজ গুজার আক্রমণ করে। নিরস্ত্র রাজা বন্দি হয়। পুরুষেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এগিয়ে আসে নারীবাহিনী — যার নেতা রাজারানির পুরনো সহচরী সুখদা। আবার দেবীর কাছে মানুষ কৃপাপ্রার্থী হয়। কিন্তু ঘুমকাতুরে দেবী কেবলই হাই তোলেন। তখন সুখদা দেবতার থেকে মুখ ফিরিয়ে শুরু করে লোকলক্ষ্মীকে জাগানোর সাধনা। লোক-সাধারণের সেই প্রাকৃত সংগ্রামে ব্যাধ কালকেতুর কপালে আঁকা হয় লোকমান্যতার রাজতিলক।

"ফুল্লকেতুর পালা" কি তবে রাজার রাজত্বে সবাই রাজা হয়ে ওঠার গল্প? আসলে নাট্যকার বোধহয় এ পালায় চুপিচুপি হরেকরকম তত্ত্বকথার মিশেল দেবারই চেষ্টা করেছেন। যেমন, যে দেশে আণবিক নিরীক্ষায় বুদ্ধ হাসেন সেখানে অস্ত্রাগারের থেকে গোলাভরা ধানই বেশি দরকার। দ্বিতীয়ত, সেই গোলা



ভরে ওঠে যাদের শ্রমে, তারাই রাজা নির্বাচনের আসল হকদার। তৃতীয়ত, নতুন সমাজের নিয়ন্তা শিব নন, অন্নপূর্ণা। পুরুষের সঙ্গে শুধু কাঁধ মিলিয়ে নয়, কখনও কখনও তাকে ছাপিয়ে নেতৃত্ব দেয় সুখদারা। তদুপরি রয়েছে 'দাও ফিরে সে অরণ্য'-এর মতো বক্তব্য। তবে কোথাও তত্ত্বকথাই খুব উচ্চকিত হয়নি বলে রক্ষা পেয়েছে নাটকটা। রক্ষা যে পেয়েছে তাতে বোধহয় সন্দেহ নেই। একবার নাট্যকলা সংক্রান্ত আলোচনায় শম্ভু মিত্র বলেছিলেন, 'যাঁরা ছাপমারা বিদ্বান নন, তাঁরা অনেক ভালো নাটক বোঝেন। কেননা নাটকটা বুঝতে হবে নিজের বুদ্ধি দিয়ে। আর যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা, তাঁদের পক্ষে নাটক বোঝা ভয়ানক শক্ত। এইসব লোকেরা হাতড়ায় নাটকটা সম্পর্কে কে কী বলেছে' ('কাকে বলে নাট্যকলা'- বই থেকে)। বর্তমান আলোচকের এ নাটকটি দু'বার দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে। দর্শকরা যে নাটকটার আদ্যন্ত উপভোগ করেছিলেন তা প্রতি পদেই উপলব্ধি করা গিয়েছিল। তত্ত্বের বাড়াবাড়ি থাকলে এটা সম্ভব হত না।

তবে প্রশ্ন উঠতে পারে এ তো ব্যাধ কালকেতুর রাজা হওয়ার নাটক। তবে কেন "ফুল্লকেতুর পালা" নাম? এ নাটকের কোথায় ফুল্লরা? আসলে ফুল্লরাই এ নাটকের বীজ। নাটকের মধ্যে থাকে যে মানুষ — সে বহুস্তরিক। সমাজের সঙ্গে, নিজের সঙ্গে তার সম্বন্ধ নিয়ে পুরো নাটকটা অনেকগুলো চরিত্রের গল্পের সমন্বয় হয়ে ওঠে। তাই কালকেতুর গল্প শেষ হয় না ফুল্লরা ছাড়া। ব্যাধ আর কৃষক, ব্যাধ আর রাজা, ফুল্লরার প্রেমিক কালুবীর আর রাজা কালকেতু — কালকেতুর এত রকমের দ্বন্দ্বকে উস্কানি দেয় যে ফুল্লরাই। সেই সঙ্গে রয়েছে তার নিজের সংকট। রাজা হওয়ার পর ফুল্লরার সেই সরল কালুবীর, যে অঢেল ধন পেয়ে ফুল্লরাকে গোলাহাট থেকে তাবৎ দ্রব্য মায় বিটাবিটিও কিনে দেবার অঙ্গীকার করেছিল, সে ক্রমশ ফুল্লরার কাছে দূরের মানুষ হয়ে যায়। যে কালু পরম আহ্লাদে ফুল্লরার কাছে নানা ব্যঞ্জন খেতে চাইত, আজ পুরনো অভ্যাসে "কি রেঁধেছিস" জিজ্ঞাসা করলেও রানি ফুল্লরার পক্ষে তার খোঁজ রাখার উপায় নেই। কালুকে সুখদার নাচের সঙ্গী দেখতে ফুল্লরা অভ্যস্ত ছিল। আজ রাজা কালকেতুকে নর্তকীর প্রতি অযাচিত সদয় হতে দেখে হিংসায় সে মত্ত প্রলাপ বকে। যে-সুখদা ছিল ফুল্লরার প্রাণের সখী, সেই সুখদার আনা নারকেল নাড়ু, সুগন্ধী তাম্বুল এ সব রানি ফুল্লরার পক্ষে সবার সামনে খাওয়া হয়ে ওঠে না। কালুবীরের ফুল্লরা 'ঘ্যাচাংফ্যাচাং'-এর অর্থ বোঝে না, বোঝে না খল ভাঁড়ুর শঠতা। ফুল্লরা অনেক কিছুই পারে না, সুখদার সঙ্গী হয়ে লোকলক্ষ্মীকে জাগাতেও পারে না। শেষ কালে সবার অগোচরে সুখদার কাছে নিজের অক্ষমতাকে উন্মোচিত করে। আসলে ফুল্লরার সংকট কেবল সামাজিক নয়, হয়ত অনেক বেশি ব্যক্তিক। তা আধুনিক নিঃসঙ্গ দ্বীপবাসী মানুষের। তাই নাটকের শেষদৃশ্যে রাজা কালকেতুকে নিয়ে যখন সমস্ত গুজার মেতে ওঠে — রাজা স্বয়ং প্রজাকে মাথার ওপর তুলে ধরেন, তখন সেই জনতার সঙ্গী হয়েও মুখে হাসি চোখে জল নিয়ে ফুল্লরা একটু পিছিয়ে পড়া — একটু যেন একা। আসলে আজকের অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে তো নিজের বহুমাত্রিক সত্তার নিরন্তর দ্বন্দ্বও যোগ হয়ে গেছে। সেই অভিযোজন প্রক্রিয়ায় আমরা কেউ কেউ এ ভাবেই পিছিয়ে পড়ি — আর রাজার সঙ্গী হবার অপেক্ষাতেও থাকি।

এবার বলা যাক অভিনয়কলা ও অন্যান্য প্রসঙ্গের কথা। আধুনিক মানুষের সমাজসত্তা আর ব্যক্তিসত্তার দ্বন্দ্বকে কালকেতু ফুল্লরার অ্যালিগরিতে গড়তে গিয়ে স্বাভাবিক কারণেই নির্দেশক বেছে নিয়েছেন মধ্যযুগীয় লোকনাট্যের নির্মিতি। শিবপার্বতীর পটের মুখোস পরে নাটকের শুরুতে 'আখড়াইবন্দী' পরিবেশন নতুনত্বের উপভোগ্যতা এনে দেয়। এ নাটকের সংলাপ ছন্দে ও গানে বাঁধা। গানের প্রয়োগ লোকসুরভিত্তিক উনিশ শতকীয় যাত্রার 'জুড়ির গান'-এর মতো। তবে নাচের কোরিওগ্রাফে সকলে সমান স্বচ্ছন্দ নন। সমস্ত মঞ্চকে সাবলীল মুনশিয়ানায় তিনটি স্তরে সাজানো হয়েছে। যার শেষভাগে রয়েছে জুড়ি-গায়নের দল। দ্বিতীয় স্তরটি প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহারোপযোগী কয়েকটা থাম দিয়ে সাজানো। আর মঞ্চের সম্মুখভাগেই রয়েছে পথ থেকে রাজপ্রসাদ।

চরিত্রচিত্রণে বহুরূপীর মান অনুযায়ী সকলেই যথাযথ। তবে অমিয় হালদার ও সুধীন মুখোপাধ্যায়ের সংযত অভিনয় যথাক্রমে ভাঁড়ু দত্ত ও মুরারী শীলকে নিতান্ত ভাঁড় হয়ে যেতে দেয়নি। গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের অস্ত্রহীন সেনাপতির অসহায়তাটুকু ভারি ভাল। দেবীর ভূমিকায় কণিকা দে-র আহ্লাদিভঙ্গি দারুণ অভিনব হয়েছে। সুমিতা বসুর সুখদা দার্ঢ্যে ও লাস্যে নাটকের অনেকখানি জুড়ে আছে।

যদিও এ পালায় কালকেতু ফুল্লরা সমান অংশী কিন্তু অভিনয়ে মঞ্চজুড়ে থেকেছেন একজন — কালকেতু দেবেশ রায়চৌধুরী। দেবেশের সমস্ত চেহারা ও আচরণের থেকে যে আদিম অনার্য সরল মানুষটি বেরিয়ে এসেছে — তার সজীবতা প্রতিরোধহীন। কালকেতুর বীরত্ব, তার অবরুদ্ধ আবেগের যন্ত্রণা প্রকট হয়েছে অভিনেতার ছৌনাচের মতো সাবলীল দাপুটে অঙ্গসঞ্চালনায়। কালকেতু-ফুল্লরার যুগল উপস্থাপনায় মাঝে মাঝেই যে কমিক আস্তরণ রয়েছে তা সহজেই মন ছুঁয়ে যায়। দেবেশের অভিনয়ের দাপট ফুল্লরার ভূমিকায় বয়ঃকনিষ্ঠ সুকৃতি লহরীর মধ্যে দেখা না গেলেও তার ঠোঁট ফোলানো অভিমান, অকারণ ঈর্ষায় কুঁকড়ে যাওয়া, নিজের সঙ্গে লড়াইয়ের কষ্ট, আনমনা একাকী ভঙ্গি কালকেতুর জ্বলে ওঠার পাশে একটা নরম ধূপছায়া তৈরি করেছে। যেটার প্রয়োজন ছিল। ধ্রুপদী চর্চার নিত্যনতুন interpretation -এর নামে নিরন্তর চলেছে যে সাংস্কৃতিক দুর্বৃত্তায়ন, তার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়ভাবনা ও অভিনয়কলার সোনায় সোহাগায় এ ভাবেই জমে উঠেছে একালের "আখেটিক পালা"।

# চারদুয়ার : এক 'অসামাজিক' মা ও মেয়ের নাটক

## মেঘ মুখোপাধ্যায়

বাঙালি সমাজে সচরাচর এমনটা দেখা যায় না। মধ্যবিত্ত মহলে তো নয়ই, উচ্চবিত্তদের মধ্যেও সম্ভবত নয়। শুধু বাঙালি সমাজই বা বলি কেন, ভারতীয় সমাজেও কি এমন এক মায়ের তথা নারী চরিত্রের দেখা পাওয়া সহজ? এক প্রৌঢ়া তিন কন্যার জননী, শিক্ষিকা অবিবাহিতা ভদ্রমহিলা আজকের এই 'মা' একদিন এক বিবাহিত সংসারি পুরুষকে ভালবেসেছিলেন। এক বিবাহিত পুরুষ ও এক অবিবাহিত নারী কিংবা তার বিপরীত অথবা উভয় পুরুষ বা নারীই বিবাহিত এবং সংসারধর্মে নিরত হয়েও অপর কোনও বিবাহিত পুরুষ বা বিবাহিত নারীর প্রতি অনুরক্ত—ভাল করে বললে বিবাহিত বা সংসারি কি না এই শর্ত উপেক্ষা করে পরস্পরের প্রতি একরকম মানসিক টান অনুভব করেন আর সংযোগ বা সখ্যতা বজায় রেখে চলেন—নারী পুরুষের এ জাতীয় সম্পর্ক সমাজ-সংসার ভাল চোখে না দেখলেও, অনুমোদন না করলেও—এমনতর প্রেমের সম্পর্কে যে কিছু একটা সৃষ্টিছাড়া নয় বরং সমাজের মধ্যেই বহমান রয়েছে—প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি তার দৃষ্টান্ত কম নয়। রাধা কৃষ্ণের সম্পর্ক এ জাতের 'অসামাজিক' ছন্নছাড়া ভালবাসার পরমতম উদাহরণ।

কিন্তু শুধু ভালবেসেই ক্ষান্ত হননি, দুর্জয় সাহসের অধিকারিণী এক নারী সেই পুরুষটির সন্তান ধারন করেছেন তিন তিনবার। তাঁর প্রেমিকপ্রবর সমাজের কোনও স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ না করে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে গার্হস্থ্যধর্ম পালন করে চলেছেন। অন্যদিকে এই দুঃসাহসিনী নারী সমাজ বা আইনসম্মতভাবে কারুর স্ত্রী না হয়েও অন্যত্র একাকী তিনটি কন্যাকে পালন পোষণের একক দায়িত্ব নিয়ে বড় করে তুলেছেন। দু'মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। ছোটটি বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠেছে।

এমন এক 'অসামাজিক', 'অবিবাহিতা' মা আর তাঁর তিন কন্যার জীবনের জটিলতা নিয়ে গড়ে উঠেছে গান্ধারের নতুন নাট্য 'চারদুয়ার'। প্রশান্ত দলভির মারাঠি নাটকের রূপান্তর। নির্দেশক মেঘনাদ ভট্টাচার্য। জীবনের জটিলতা তো বটেই — জটিলতা বাদ দিয়ে সমৃদ্ধ জীবন হয় না, জটিলতা এড়িয়ে মানুষের জীবন গভীরতা লাভ করে না—কিন্তু এই চারজনের জীবনকে ছেয়ে আছে অস্বাভাবিকতা। মা আর তাঁর তিন মেয়ের জীবন অস্বাভাবিক ঘটনা দ্বারা আক্রান্ত হয়, বিপর্যস্ত হয়। এ নাটকের চারটি নারীর জীবনস্রোত ক্রমশ সংকটপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। মা তো বহুকাল আগেই স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলেন অপ্রচলিত জীবনধারা। বিবাহিতা বড় মেয়ের জীবনেও সংকট ঘনিয়ে তুলেছে তার লম্পট স্বামী। অন্য নারীতে স্বামীর আসক্তি আর তা প্রদর্শনের নির্লজ্জতায় অতিষ্ঠ হয়ে বড় মেয়ে বিদ্যা তার শিশুকন্যাকে বাড়িতে ফেলে রেখে পালিয়ে এসেছে মায়ের কাছে। সে সমাজবিজ্ঞানের কৃতী ছাত্রী এবং অধ্যাপিকা— সে তার সাংবাদিক স্বামীকে বিদ্যাবুদ্ধি অনুভবশক্তিতে হীন বলে মনে করে। তার ওপর যুক্ত হয়েছে অবিশ্বস্ততা, অন্য মেয়েকে নিয়ে ফুর্তি মারার নীচতা—তার জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে যা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। মাও মেয়েকে সমর্থন করেন। আর সমাধানের রাস্তা না বেরন পর্যন্ত তাঁর কাছেই মেয়েকে রেখে দেন। বিদ্যার জীবনের সংকট এ-নাটকের একটা প্রধান অংশ। এবং এতে নাট্যে বেগ সঞ্চার হয় আর তীব্রতা বাড়ে। মা-মেয়ে এই সংকট কীভাবে মোকাবিলা করে দেখার জন্য দর্শকের কৌতূহল বেড়ে যায়। কৌতূহল বাড়ে, কারণ মেয়ে জামাইয়ের চরিত্র নিয়ে কটু মন্তব্য করলে জামাইবাবাজিও শাশুড়ির জীবনের ইতিহাস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বহু বছর বাদে মাকে এই সূত্রে তাঁর অবিবাহিত জীবন এবং বিবাহিত-সংসারি পুরুষের সন্তানধারণের প্রশ্নের মুখে দাঁড়াতে হয়।

তারপর নাটকে প্রবেশ করে মেজ মেয়ে বৈজয়ন্তী। মায়ের কাছে একটি মেয়ের প্রবেশ মানে যেন একটি সমস্যার প্রবেশ। আপাত হাসিখুশির আড়ালে সে যে এক অসুখী জীবনযাপন করে চলেছে ধীরে ধীরে তা উন্মোচিত হয়। মেজ মেয়েও তার স্বামীকে নিয়ে সুখী নয়। তার স্বামীটি অবশ্য বড় মেয়ের স্বামীর মতো তেমন বিপজ্জনক কিছু নয়—তেমন বিপত্তির কোনও কারণ নয় কিন্তু এক প্রাণবন্ত উচ্চাভিলাষী তরুণী স্ত্রীর জীবনে অন্ধকারের ছায়া নামিয়ে আনার পক্ষে যথেষ্ট। আসলে তার স্বামী শ্রীকান্ত একটি মাকাল ফল মাত্র। দেখতে সুন্দর, ফিটফাট থাকায় সদা ব্যস্ত, স্মার্ট দেখাবার আর কথা বলার চেষ্টা করে পেরে ওঠে না, ফেসে যায়, বোকামি করে ফেলে, স্থায়ী চাকরি বজায় রাখতে পারে না, আজকালকার কঠিন দিনে নির্দিষ্ট সম্মানজনক আয়ের





সুবন্দোবস্ত করতে অপারগ, চাকরি জুটিয়ে দিলে সামান্য অজুহাতে ছেড়ে পালিয়ে আসে। যুবকটির এমন কতশত দোষ। এক কথায় আজকের সমাজে অচল, জটিল জীবনধারায় একদম বেমানান। তার ওপর আবার কিছুদিন খুব ঝোলাঝুলি করছে যে সে বাবা হতে চায়। বৈজয়ন্তীকে মা হবার জন্য সাধাসাধি করে। কিন্তু বৈজয়ন্তী সাহস পায় না। স্বামীর অভিলাষ আর রেস্তের জোর নিয়ে তার মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধে। এই সরলমনা, সংসারের অনুপযুক্ত স্বামীকে নিয়ে সে কী করবে—কী করে বাকি জীবন কাটাবে? এই আপশোস থেকে সে এক সময় পরিত্রাণ পায় যখন জানতে পারে তার বড়দির স্বামীর কীর্তি— স্বামীর ভ্রষ্টাচারের জন্য বিদ্যার জীবন ছারখার হতে বসেছে—সে উপলব্ধি করে যে শ্রীকান্ত আর যাই হোক— কোনও তরুণীর স্বপ্নে দেখা আদর্শ স্বামী হতে না পারুক, সে কিন্তু তার স্ত্রীকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে। সবচেয়ে বড় কথা সে তার তরুণী বউয়ের প্রতি অনুগত, অনুরক্ত, সে তার জীবনে বউকে গুরুত্ব দেয়, তাকে খুশি করার চেষ্টা করে নিজের মতো করে, তার বউয়ের কাছে শীঘ্রমধ্যে সন্তান চায়, সন্তান আনার পিছনে আর্থিক পরিকল্পনার কথাকে সে আমল দিতে চায় না কিংবা তার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে এত জটিল পরিকল্পনা সাজানোর কথা ঠাঁই পায় না— সে বাবা হবে, বিজু মা হবে, তারা সন্তান মানুষ করবে এমনটাই তার কাছে বড় কথা।

শ্রীকান্তকে নিয়ে নাটকের মধ্যে এক সময় সংকট ঘনিয়ে উঠেছিল। সে যেন কখনও শুধরোবে না, একজন উপযুক্ত চৌকস স্বামী হয়ে উঠবে না। মায়ের সঙ্গে তার সংঘর্ষ ঘটে যায়। কিন্তু বৈজয়ন্তীর উপলব্ধির পর তাদের দাম্পত্য সম্বন্ধ এবং এই নাটকও নতুন মাত্রা পায়।

ছোট মেয়ে বিনিকে নিয়েও মায়ের এবং দিদিদের সমস্যা কম নয়। তার দুই সহপাঠী বন্ধু প্রকাশ আর বীরেন্দ্রর মধ্যে কাকে ও ভালবাসে, কাকে ও বিয়ে করবে, কার সঙ্গে সংসারজীবন কাটাতে চায় তা ঠিক করতে পারে না কিছুতেই। মা আর দু'দিদি ওকে চেপে ধরে—দু'জনের মধ্যে আর বিলম্ব না করে একজনকে বেছে নিতে বলে—বিয়ের জন্য আর দেরি করা চলে না। এদিকে দু'জনেই উপযুক্ত যুবা, দু'জনেই সুপাত্র, দু'জনেই ওকে গভীরভাবে ভালবাসে; দু'জনেই ওকে বলে তাদের মধ্যে একজনকে নির্বাচন করার জন্য মনস্থির করতে; বিনির সিদ্ধান্তই ওরা মেনে নেবে কিন্তু একজনকে এ বার বেছে নিতেই হবে—তাদেরও এই চূড়ান্তকথা। আসলে, দু'জনের মধ্যে থেকে কিংবা দশজনের মধ্যে থেকে একজনকে জীবনের জন্য বেছে নেওয়া বা বিয়ে করা—এটা হল একজন যুবকযুবতীর কাছে সমাজের দাবি।

শৈশব-কৈশোর থেকে সমাজ তার সদস্যের মনটিকে এ ভাবেই গড়ে তোলে। ছাঁচে ঢালে। সমাজ এবং আইন-নির্দিষ্ট বিবাহের নিয়মটাই এ রকম। ভালবাসার নিয়ম, বিবাহের নিয়ম তথা সমাজের প্রচলিত অনুশাসন এ রকমই দাবি করে—একজন আর একজনকে বেছে নেবে কিংবা অভিভাবকরা বেছে দেবে এবং তারপর তারা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ অর্থাৎ জীবনভর সুখে কালাতিপাত করবে। একজন একই সঙ্গে, একই সময়ে দুজনকে বেছে নিতে পারবে না কিংবা দু'জন একজনকে বেছে নিতে পারবে না। তা হলেই বিপত্তি। বিনিকে একসময় দেখেছি টোমাস মানের কাহিনি অবলম্বনে গিরিশ কারনাডের বিখ্যাত নাটক 'হয়বদন' নিয়ে প্রকাশের সঙ্গে আলোচনা করতে, তর্ক করতে। সেখানে এক নারী চেয়েছিল এমন এক পুরুষকে যার মধ্যে উন্নত মস্তিষ্ক এবং সুঠাম-আকর্ষণীয় শরীরের সমন্বয় ঘটবে। একই সঙ্গে দু'টো প্রত্যাশার মিলন। নাটকের অন্তিমে জানা যায় বিনি কিন্তু একই পুরুষের মধ্যে উন্নত মস্তিষ্ক মেধা বা হৃদয়বৃত্তি এবং শারীরিক সৌন্দর্যের সমন্বয় চায় না। সে কোনও জোড়া দেওয়া 'হয়বদন' চায় না। তার একই জীবনে সে দু'টি ভিন্ন স্বভাবের-প্রকৃতির পুরুষকে চায় একই সঙ্গে একই কালে। দু'টি সম্পূর্ণ পুরুষকে নিয়েই সে জীবনযাপন করবে বলে স্পষ্টভাষায় সবাইকে জানিয়ে দেয়। বিনি একই সঙ্গে প্রকাশ ও বীরেন্দ্রকে বিয়ে করতে চায়। সে জীবনে কারুকেই ছেড়ে থাকতে চায় না, কাউকে বাদ দিয়েই সে সুখী হতে পারবে না। তার এ সিদ্ধান্তের অকৃত্রিম প্রকাশভঙ্গিতে, অন্তর্নিহিত সারল্যে এ-জগৎ হকচকিয়ে যেতে পারে, সমাজ ঝনঝন করে উঠতে পারে, কিংবা অসার কল্পনায় মুচকি হাসতে পারে—কিন্তু বিনির কিছু আসে যায় না। সে বেশ ভেবেচিন্তেই, নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করেই তার অনড় অভিমত প্রকাশ করে দিয়েছে। এবং তার যথার্থ মনোভাব প্রকাশ করে দিয়ে সে ভারমুক্ত।

সমাজহিতৈষী পরিণতবুদ্ধি বয়স্ক মানুষরা বলবেন বিনি তার এই অল্প বয়সে এ সিদ্ধান্তের বাস্তবপরিণাম সম্বন্ধে তো কিছুই জানে না। এ তো অল্পবুদ্ধি খেয়ালি তরুণীর অলীক কল্পনা বই কিছু নয়। সে আর জীবনের কী জানে। কতটুকু দেখেছে! তার উচ্চারণের আন্তরিকতা আর দৃঢ়তা থেকে কিন্তু দর্শকের মনে না হয়ে পারে না যে বিনি এত হালকা করে কথাটা বলেনি। সে অন্যরকম ভাবে জীবনটাকে তথা 'বিবাহ'-ব্যাপারটাকে দেখতে চায়—পুরুষের সঙ্গে নারীর সম্পর্ককে-সংযোগকে নতুন করে ভাবতে পেরেছে সে। একজন পুরুষের সঙ্গে একজন নারীর বন্ধনের গণ্ডিটাকে সে আরও প্রসারিত করে দেখতে চায়। বলতে ইচ্ছে করে এমন মায়ের মেয়েই তো এমন করে ভাবতে পারে, বলতে পারে, চাইতে পারে।

সম্ভব কি না? বাঞ্ছনীয় কি না?

বিনি তার উত্তর জানে না। তার প্রথাভাঙা দুঃসাহসিনী মাও জানেন না। নাট্যকারও জানেন না। এমন একটা অদ্ভুত প্রশ্ন বা প্রসঙ্গ তুলে তিনি নাটকের শেষে দুয়ার খুলে দিয়েছেন।

মায়ের জীবনের ইতিহাস এবং ছোটমেয়ের জীবনের চাওয়া ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজের প্রেক্ষিতে কতদূর বাস্তবসম্মত না কি কেবলই নাট্যকারের কল্পনা—তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে। কেউ হয়ত বলতে পারেন এমন নাটক অভিনয় করার যৌক্তিকতা বা সার্থকতা কি? এ নাটক সমাজের কোন কাজে লাগবে? কিন্তু 'চারদুয়ার' নাটকে তিনি নারী পুরুষের প্রেম এবং বিবাহসংক্রান্ত কয়েকটি জটিল প্রশ্নের উত্থাপন করেছেন। সমাজের সরাসরি কাজে না লাগলেও প্রশ্নগুলো মানুষের কাজে লাগবে। আর, সমাজের প্রত্যক্ষ কাজে লাগতে হবে, শিল্পরচনার এমন কোনও শর্ত আছে কি? জীবনের কোনও দিক নিয়ে ভাবানোর দায়িত্ব পালনে এ নাট্যপ্রযোজনা সক্ষম হয়েছে বলেই তো মনে হয়। যদিও আরও বহুবিধ জ্বলন্ত সমস্যায় কন্টকিত সম্প্রতিকালের ভারতীয় সমাজের একটি সামান্য অংশই এ ভাবনার অংশীদার হতে সক্ষম। মেঘনাদ ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় এবং বিজয়লক্ষ্মী বর্মন (মা), মানসি সিনহা (বড় মেয়ে), মেঘনা লাহিড়ি (মেজ মেয়ে), মন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায় (ছোট মেয়ে), সৌমেন মুখোপাধ্যায় (শ্রীকান্ত), পার্থ মুখোপাধ্যায় (প্রকাশ) এবং অর্পণ শর্মা (বীরেন্দ্র) -এর অভিনয়ে 'চারদুয়ার' একটি মনোযোগ দিয়ে দেখার মতো নাট্যকর্ম হয়ে উঠেছে। বিজয়লক্ষ্মী মায়ের চরিত্রে মনে রাখার মতো অভিনয় করেছেন। স্বাধীন চিন্তা-বুদ্ধির অধিকারিণী এক ব্যক্তিত্বময়ী নারীর ভূমিকা তাঁর হাঁটাচলা, তাকানো, দাঁড়ানো, কথাবলার ভঙ্গিমায় মঞ্চে জীবন্ত হয়েছে। তিনি যে জীবনে অনেক জটিলতা পেরিয়ে এসেছেন, বহু কিছু সহ্য করেও আজ সসম্মানে সমাজে বাস করছেন, তিনি যে 'অবিবাহিত' এ-কথা মনে রেখেও সমাজে নিজের স্থানটিকে হীন মনে করেন না—মায়ের চরিত্রের এ রকম অসাধারণত্ব তাঁর অভিনয়ে ফুটে উঠেছে। 'ফুটে উঠেছে' কথাটি বহুব্যবহৃত হলেও সেটিই প্রয়োগ করলাম।

পর্দা সরতেই মঞ্চ জুড়ে মায়ের বাড়ির বিশাল সেট দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরিকল্পনা করেছেন দেবাশিস মজুমদার। বাবা আর জ্যেষ্ঠ জামাতাকে মঞ্চে প্রবেশ করতে দেখা যায় না। বাকিদের সংলাপে তাঁদের সম্বন্ধে জানা যায় কিন্তু দু'বার তাঁদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হওয়ার সময় তীব্র নাট্যমুহূর্তের সৃষ্টি হয় এবং অদৃশ্য পুরুষ দু'টির চরিত্র বেরিয়ে আসে। আমাদের সমাজগঠনে পুরুষতান্ত্রিকতার ধরনটি স্পষ্ট হয় এইভাবে। কিন্তু বোঝা মুশকিল হয়ে ওঠে এ রকম একজন ভিরু পুরুষের সঙ্গে 'মা' কেন বা কী উদ্দেশ্যে সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন। ছোট মেয়ের জন্মদিনে কথা দিয়েও যিনি আসতে পারেন না, সবাই যখন তাঁর অপেক্ষায় বসে আছে তখন ফোনে জানিয়ে দেন তাঁর অপারগতা এইরকম একটি ভদ্র গৃহস্থ সামাজিক পুরুষের সঙ্গে এই পরিবারের সম্পর্কের ধরনটি এ নাটকে আরও কিছুটা উঠে এলে মায়ের চরিত্রটি আরও ব্যাপকতা পেত বলে মনে হয়।

স্মরণে

# অন্নদাশংকর রায় (১৯০৪-২০০২)

## ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

গোদাবরীর তীরে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের সাধ্য-নির্ধারক প্রশ্নোত্তর বৈষ্ণব সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। "এহো বাহ্য", "এহো বাহ্য" বলে এক এক করে রামানন্দকে শ্রীচৈতন্য সাধনার এক এক স্তর পার করে এগিয়ে দিচ্ছেন, প্রেমভক্তি থেকে দাস্য প্রেমে এসে শ্রীচৈতন্য তবু বললেন, "এহোত্তম আগে কহ আর"। তখন, "রায় কহে কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার।"

আজ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে যখন অন্নদাশংকর শান্তিনিকেতনে থাকতেন গৌরকিশোর ঘোষের সঙ্গে আমরা কয়েকজন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। নানা রকম আলাপের মধ্যে গৌরকিশোর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু কী বলে আপনি মনে করেন?" অন্নদাশংকর এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে বললেন, "প্রেম। তার চেয়ে বড় আর কিছু নেই।"

আজ ওঁদের দুজনের কেউই নেই, কিন্তু আজও যদি অন্নদাশংকরকে গৌরকিশোর একই প্রশ্ন করতেন, অন্নদাশংকর একই উত্তর দিতেন বলে আমার ধারণা। এবং সে-প্রেম কেমন? সে-বিষয়েও তিনি কোনও সন্দেহের অবকাশ রাখেননি। কবেকার সেই "আগুন নিয়ে খেলা" থেকে শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর এই বিশ্বাস কোনওদিন এতটুকু টলেছিল বলে আমার জানা নেই, যে সে-প্রেম একান্তভাবে মানবিক, যদিও বৃহত্তম, মহত্তম অর্থে।" প্রেম ও বন্ধুতা" গ্রন্থে তিনি লিখেছেন "(গান্ধীজির) অহিংসা ও সত্য মেনে নিলেও, ব্রহ্মচর্য মেনে নিতে পারিনে।" মানুষকে প্রকৃতি যেমন ক্ষুধাগ্নি দিয়েছে তেমনি দিয়েছে অপর এক অগ্নি। কামাগ্নি। তাকে দমন করতে গেলে সে নানা ভাবে প্রতিশোধ নেয়। কায়িক ও মানসিক বিকার ও ব্যাধি ডেকে আনে। তার সাবলিমেশন সকলের সাধ্যায়ত্ত নয় .... আমি তাকে প্রেমের সঙ্গে সমন্বিত করার পক্ষপাতী।"

আবার এ বিষয়েও ভুল করবার যো নেই, তাঁর শিক্ষাদীক্ষা, তাঁর রুচি, তাঁর মার্জিত পরিশীলিত আজন্ম লালিত নাগরিকোচিত স্বভাব, urbaneness তাঁকে অসংযমের হাত থেকে রক্ষা করে গেছে। তা ছাড়া শিল্পবোধ তো ছিলই, শিল্পী মানে রূপশিল্পী এবং এই প্রসঙ্গে বড় সুন্দর বলেছেন নলিনীকান্ত গুপ্ত তাঁর "অশ্লীল ও অসুন্দর" প্রবন্ধে : রস বাঁধন-হারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাহাতে অসুন্দর না হইয়া পড়ে সেই জন্যে পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে রূপ। আপনা-আপনি রস হইতেছে অরাজক, রূপ হইতেছে বিধি, ধর্ম।"

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লেখা অন্নদাশংকরের একটি চিঠির এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। লন্ডন থেকে তিনি লিখছেন ("কল্লোলযুগ' বইয়ে চিঠিখানি আছে) : আপনার "বেদে" পড়ে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন সে কথা মোটের ওপর আমারও কথা। কিন্তু আমার মনে হয় মিথুনাশক্তি নিয়ে আরেকটু ব্যাপকভাবে ভাববার সময় এসেছে। হঠাৎ একই যুগে এতগুলো ছোট-বড়-মাঝারি লেখক মিথুনাশক্তিকে অত্যধিক প্রাধান্য দিতে গেল কেন? দেখে শুনে মনে হয় বিংশশতাব্দীর লেখকমাত্রই যেন Keats এর মত বলতে চায় "I felt like some watcher of the skies when a new planet swims into his ken." আলিবাবার সামনে যেন পাতালপুরীর দ্বার খুলে গেছে। "শোনো শোনো অমৃতের পুত্রগণ, আমি জেনেছি সেই দুর্বার প্রবৃত্তিকে, যে প্রবৃত্তি সকল কিছুকে জন্ম দেয় ... অসার এই সংসারে কেবল সেই প্রবৃত্তিই সার, অনিত্য এই জগতে কেবল সেই প্রবৃত্তিই নিত্য।"

অন্নদাশংকর আসলে ছিলেন লেখক, গল্প-উপন্যাসকার, শিল্পী। নিজের লেখকসত্তা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, তাঁর ওপরে সর্বাধিক প্রভাব রবীন্দ্রনাথ ও টলস্টয়ের। "রবীন্দ্রনাথের কাছে পাই বিচিত্রের প্রতি আকর্ষণ। সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ। টলস্টয়ের কাছে পাই এপিকের প্রতি আকর্ষণ। সত্যের প্রতি অনুরাগ"। তাঁর লেখক জীবনের কোন পর্বে কোন আকর্ষণ বেশি প্রবল ছিল কতটা প্রবল ছিল খুব নির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন, তবে মনে হয় প্রথম দিকে, যদিও একটু আবছা ভাবে তাঁর লেখার পিছনে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে কিংবা গল্পে চরিত্রনির্মাণ, অর্থাৎ লেখকের নিজের ভিতরের বস্তুকে objectify করা, সে একটা আর্ট। সে আর্ট অন্নদাশংকর পরে অনেকটা আয়ত্ত করেছিলেন, যদিও সব সময় যে নিজের ব্যক্তিত্বকে যথেষ্ট দূরে সরিয়ে রেখে তা করতে পেরেছিলেন কি না সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

হয়ত তাঁর ভাবুকতা, (যদিও তাঁর নিজস্ব গদ্যরীতি জটিল, মিশ্র ভাবনার পক্ষে খুব সহায়ক ছিল না) তাঁর শিল্পকে, বিশেষ করে শেষ দিকে খর্ব করে থাকবে বলে মনে হয়। তবু সেই গদ্যরীতিই তাঁকে বাংলা সাহিত্যে অমর করে রাখবে।

কে জানে, মানুষের চিন্তার ধরন, যেমন তার গদ্যকে বিশেষ এক রূপ দান করে, তেমনই আবার সেই বিশেষ ধরনের গদ্য হয়ত তার চিন্তাকে কিছু একটা চরিত্র দান করে। অন্নদাশংকরের ভাষা অতিশয় স্বচ্ছ, ভাবনাও অতি স্বচ্ছ। অথচ তিনি স্পষ্ট বলেছেন, তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী, গান্ধীভক্ত, সেই সঙ্গে পশ্চিমের অনুরাগী, সেই সঙ্গে ইংরেজের সহযোগী। আরও কত কী।

হয়ত এখানে কোথাও কোথাও অস্বচ্ছতার একটা সম্ভাবনা ছিল, তিনি সে-সম্ভাবনা কাটিয়ে উঠেছেন। তাঁর গদ্যের গুণে? হতেও পারে।

[আগামী সংখ্যায় অন্নদাশংকরকে নিয়ে একাধিক বিশদ নিবন্ধ প্রকাশিত হবে - সম্পাদক]